ভলিউম ১৭

কুয়াশা

কাজী আনোয়ার হোসেন

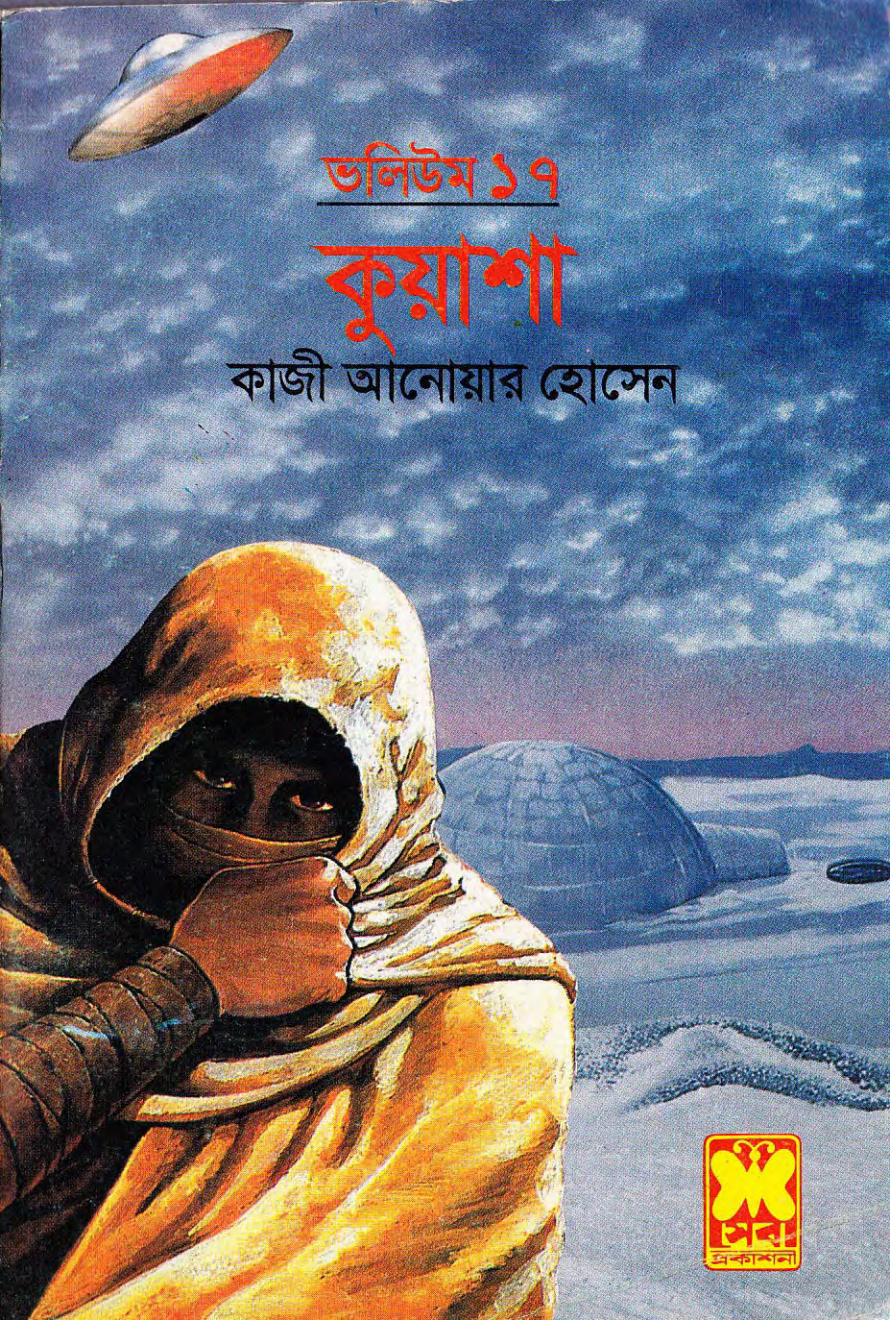

সেবা প্রকাশনী

ভলিউম ১৭

কুয়াশা

৪৯, ৫০, ৫১

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-1107-4

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ১৯৯৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শরাফত খান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Volume- 17
KUASHA SERIES: 49, 50, 51
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

ছাব্বিশ টাকা

কুয়াশা ৪৯	৫—৩৯
কুয়াশা ৫০	৪০—৮৫
কুয়াশা ৫১	৮৬—১৩৬

কুয়াশা ৪৯

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ১৯৭৬

এক

দরজা বন্ধ করে হাওদার ভিতরে বসে পরবর্তী কর্তব্যের কথা ভাবছে কুয়াশা। নির্মম হয়ে উঠেছে সে। প্রফেসর ওয়াইয়ের অমানবিক অত্যাচার ছাড়িয়ে গেছে তার সহ্যের সীমা।

জর্মন শেখকে দেখেই চিনে ফেলেছিল কুয়াশা। লোকটা জাত খুনী। প্রফেসর ওয়াইয়ের প্রভাবে সে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

জ্ঞান ফেরে কুয়াশার হাওদার ভিতর।

চোখ মেলে সে দেখে এখনও তার শরীরে জড়িয়ে রয়েছে জাল। শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসে কুয়াশা। ভারি আশ্চর্য লাগে তার, হাত-পা বাঁধা নেই কেন তার? প্রফেসর ওয়াই কি জংলীদেরকে তার হাত-পা বাঁধার হুকুম দিতে ভুলে গিয়েছিল?

ভুলে যায়নি। ইচ্ছা করেই সে নির্দেশ দেয়নি প্রফেসর। যে গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে সে জ্ঞান হারায় সেটা ছিল খুবই মারাত্মক। প্রফেসর ভেবেছিল জ্ঞান ফিরতে কমপক্ষে কয়েক ঘন্টা সময় লাগবে।

কিন্তু প্রফেসর মারাত্মক ভুল করেছে। সাধারণ মানুষের চেয়ে কুয়াশার স্বাস্থ্য অনেক ভাল। জ্ঞান হারালেও গ্যাসের প্রভাব থেকে মুক্তি পায় সে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই।

জাল ছিঁড়ে নিজেকে মুক্ত করতে কোন অসুবিধেই হয়নি কুয়াশার। জাল ছিঁড়ে নিজেকে মুক্ত করার পরই কুয়াশা টের পায় হাতি দুটো দাঁড়িয়ে পড়েছে।

দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকায় সে। রাজার দেহরক্ষী হিসেবে পরিচয়দানকারী জর্মন শেখকে চিনতে ভুল হয়নি কুয়াশার। জর্মন শেখের ষড়যন্ত্র টের পেয়ে কুয়াশা দ্রুত চিন্তা করে একটা বুদ্ধি বের করে।

গায়ে জাল চাপিয়ে নিয়ে হাওদার ভিতর আবার শুয়ে পড়ে সে। নিঃসাড় পড়ে থাকে, যেন এখনও তার জ্ঞান ফেরেনি। খানিকপরই জর্মন শেখ হাওদার ভিতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

কুয়াশার ডান হাতটা ছিল দেহের আড়ালে লুকানো। সেই হাতে ধরা ছিল একটা পিস্তল।

জর্মন শেখ দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াতেই হাতটা বের করে পিস্তলের ট্রিগারে চাপ দেয় কুয়াশা।

বিষ মাখানো সরু সূঁচ বুলেটের বেগে বিদ্ধ হয় জর্মন শেখের শরীরে।

সাথে সাথে জ্ঞান হারায় সে। তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায় কুয়াশা।

অচেতন পতনোন্মুখ দেহটা ধরে ফেলে সে। তারপর ধীরে ধীরে নিঃশব্দে শুইয়ে দেয় কাঠের মেঝেতে।

দ্রুত জর্মন শেখের পোশাক খুলে নেয় কুয়াশা। জর্মন শেখ অসভ্য জংলীর ছদ্মবেশে ছিল। এবার কুয়াশা সেই ছদ্মবেশ ধারণ করে।

নিজের কাপড়চোপড় জর্মন শেখকে পরিয়ে দেয় কুয়াশা। আলখেল্লা দিয়ে ঢেকে দেয় তার মুখ আর মাথা। তারপর বেরিয়ে আসে হাওদা থেকে।

জংলীরা তার ছদ্মবেশ ধরতে পারেনি। কিন্তু প্রফেসর ওয়াই? তার চোখ কি ফাঁকি দেয়া সম্ভব হবে?

গ্রামের দিকে চলেছে ওরা। প্রফেসর ওয়াইকে এখানে পাওয়া যাবে, কুয়াশা জানে। ওর অনুমান, জংলীদের রাজাকে বন্দী করে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলেছে প্রফেসর ওয়াই। কিংবা রাজাকে হয়তো সে হত্যাই করেছে, রাজার ছদ্মবেশ নিয়ে জংলীদের রাজা বনে গেছে সে।

হাওদার ভিতর বসে অনেক কথা চিন্তা করছিল কুয়াশা। প্রফেসরের চোখে ধুলো দিতে পারবে তো সে?

মনে পড়ছিল বারবার শহীদের কথা। ওরা এখন কোথায়? স্পেসক্রাফটে চড়ে দাবাগ্নি থেকে আত্মরক্ষা করতে না পারার তো কথা নয়। কিন্তু যদি প্রফেসর ওয়াই কোনভাবে নষ্ট করে দিয়ে থাকে সেটা?

গ্রামে গিয়ে কি দেখতে পাবে সেটাও চিন্তার বিষয়। যাকে উদ্ধার করার জন্য স্পেসক্রাফট ছেড়ে চলে এসেছে সে, তার পরিচয় এখনও জানা হয়নি। অবশ্য পরিচিতদের মধ্যেই কেউ হবে।

এরপর রহস্যপুরীর চিন্তা। প্রফেসর ওয়াই সবাইকে হত্যা করে রহস্যপুরীর কোটি কোটি টাকার ধন-সম্পদ লুঠ করতে চায়।

কিন্তু তা হতে দেবে না সে। কুয়াশা বেঁচে থাকতে প্রফেসর ওয়াই হস্তগত করতে পারবে না রহস্যপুরীর সাত রাজার ঐশ্বর্য। মনে মনে রহস্যপুরীতে অভিযান পরিচালনার জন্যে পরিকল্পনা করতে লাগল কুয়াশা।

এদিকটা জঙ্গল তেমন গভীর নয়। হাতি দুটোর গতি বেড়ে গেছে। গলায় বাঁধা ঘণ্টা দুটো ঘন ঘন বাজছে, টুং-টাং, টুং-টাং। হাতিদ্বয়ের পিঠের হাওদা থেকে বেরিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় কুয়াশা।

চেনবার কোন উপায় নেই কুয়াশাকে। ছদ্মবেশটা নিখুঁত হয়েছে। জংলী রাজা অমেনটোটের প্রধান দেহরক্ষী সে।

গ্রামটা দেখা গেল খানিক পরই।

হাতি দুটোর পিছু পিছু নৃত্যগীতরত উলঙ্গ প্রায় অসভ্য জংলীরা উল্লাসে ফেটে পড়ল। অভিযান সফল হয়েছে তাদের। দেবতার শত্রুকে রাজা বন্দী করে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কাজটা নিখুঁত ভাবে সেরেছে তারা। দেবতার শত্রুকে জ্যান্ত কবর দিয়ে ফিরে যাচ্ছে গ্রামে।

হাওদার দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে কুয়াশা। প্রফেসর ওয়াই খবর শুনে নিশ্চিন্ত হবে। একমাত্র তাকেই সে পরম এবং প্রবল পরাক্রমশালী শত্রু বলে

মনে করে।

হাসছিল কুয়াশা সেই কথা ভেবেই। তার মৃত্যু সংবাদ সে নিজেই শোনাবে প্রফেসরকে। প্রফেসর আনন্দে আহ্লাদে আটখানা হবে, অট্টহাসিতে কাঁপিয়ে তুলবে চারদিক।

কিন্তু, যদি সে কুয়াশার ছদ্মবেশ ধরে ফেলে? যদি সে সন্দেহ করে এ লোক জর্মন শেখ নয়?

গ্রামটা প্রকাণ্ড। নারকেল আর সুপারি গাছ দিয়ে ঘেরা বিরাট এলাকাটা। গ্রামের মাঝখানে পাঁচ মানুষ সমান উঁচু দোতলা। ওটাই রাজার বাসভবন। বাঁশ আর কাঠ দিয়ে তৈরি। রাজপ্রাসাদের সম্মুখভাগটা খোলামেলা। রেলিং দিয়ে ঘেরা উঁচু খোলামেলা ওই জায়গাটাতেই বসে রাজা শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

গ্রামের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে আছে জংলী যোদ্ধারা। বর্শার মুখ আকাশের দিকে তুলে রাজার হাতি দুটোকে অভ্যর্থনা জানায় তারা। সরে দাঁড়ায় সসম্মানে একপাশে।

হাতিদ্বয় প্রবেশ করল গ্রামের ভিতর।

গ্রামের চারদিকে উলঙ্গ জংলীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজার হাতি দুটোকে দেখে সবাই ছুটে এল। নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কিশোর-কিশোরী, ছেলে-মেয়ে সবাই উলঙ্গ প্রায়! প্রকৃতির সাথে প্রতিমুহূর্তে কঠোর সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয় এদেরকে। সভ্যতার আলো এবং সুযোগ সুবিধে থেকে এরা সর্বতোভাবে বঞ্চিত। অরণ্যের নানারকম পশুর মাংস পুড়িয়ে খেয়ে জীবন ধারণ করে এরা। এদের মধ্যে নেই কোন ভদ্রতা জ্ঞান, নেই শিক্ষা। দলে দলে কোন্দল, উপজাতিতে উপজাতিতে ঝগড়া-লড়াই লেগেই আছে। প্রাণের কোনই মূল্য নেই এদের কাছে। সবল দুর্বলকে সুযোগ পেলেই, কারণে বা অকারণে, হত্যা করে।

সভ্য জগতের মানুষ এদের উপর অত্যাচার কম করেনি। এরাও কম যায় না। সভ্য দুনিয়ার মানুষ দেখলেই এদের জিভে জল এসে যায়। আফ্রিকার অনেক অসভ্য জংলী এই বিংশ শতাব্দীতেও মানুষের মাংস খায়।

গ্রামের চারদিকে ছোট ছোট বাঁশের ঘর। জংলীদের এই উপজাতিটা অন্যান্যদের তুলনায় বেশ একটু এগিয়ে গেছে। মাংস পোড়া এরা এখনও খায়, সভ্য দুনিয়ার মানুষ পেলে এদের জিভে আজও পানি আসে, কিন্তু এরা মোটামুটি একটা সমাজ তৈরি করে নিয়েছে, যে সমাজে রাজা আছে, সর্দার আছে, আছে যোদ্ধা, শিকারী। এরা ঘর তৈরি করে বাস করে। গ্রামটাও এদের নিজেদের তৈরি।

গ্রামের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা মাঠ। মাঠের এক প্রান্তে রাজার বাসভবন! মাঠের চারদিকে পদ্মাসনে বসে আছে হাজার কয়েক জংলী। সবাই উত্তেজিত এবং চঞ্চল। কিন্তু রাজার নির্দেশে কেউ নড়ছে না, কারও মুখে কোন কথা নেই।

রাজা নেমে এসেছেন মাঠের মাঝখানে। সেখানে কয়েকটা মোটা খুঁটির সাথে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে কয়েকজন লোককে। তাদের মধ্যে দু'জন নারীকেও দেখা যাচ্ছে।

মাঠের ভিতর প্রবেশ করল হাতিদ্বয়। রাজা অমেনটোট অট্টহাসিতে ফেটে

পড়লেন।

জংলীরা অবাক বিস্ময়ে দেখছে রাজাকে। রাজা অমেনটোট চিরকাল গম্ভীর এবং মিতবাক স্বভাবের। কিন্তু গত ক'দিন থেকে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তাঁর মধ্যে। যখন তখন হাসছেন তিনি। দেবতারা নাকি তাঁর কাছে এসেছিল। তারা জানিয়ে গেছে রহস্যপুরীর পবিত্রতা নষ্ট করার জন্য সভ্য দুনিয়ার কিছু লোক আসছে এই জঙ্গলের পথ ধরে। তাদেরকে বন্দী করে হত্যা করতে হবে।

এসব কথা তারা শুনেছে খোদ রাজার মুখে। রাজা ভবিষ্যৎবাণী করে বলেছেন, অমুক স্থানে শত্রু আছে, দেবতারা আমাকে জানিয়ে গেছে। তোমরা যাও, শত্রুদেরকে ধরে নিয়ে এসো। শত্রুদেরকে বন্দী করার জন্য একের পর এক দল পাঠিয়েছেন রাজা। দলগুলোর সাথে দিয়েছেন দেবতার প্রদত্ত অলৌকিক নানা রকম অস্ত্র। জংলীরা দলবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট স্থানে গেছে। ওৎ পেতে, ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করেছে তারা। অবশেষে, রাজার ভবিষ্যৎবাণীই সত্য হয়েছে। শত্রুদেরকে দেখা গেছে এগিয়ে আসতে। জংলীরা তাদেরকে বন্দী করে ধরে নিয়ে এসেছে গ্রামে।

হাতির পিঠ থেকে লাফ দিয়ে নামল কুয়াশা। তার মুখে বিজয়ের হাসি।

অট্টহাসি থামল রাজা অমেনটোটের। মাঠের চারদিকে বসে আছে জংলীরা। তাদের সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রাজা বললেন, 'জংলীরা অনেক দূরে, ওরা আমাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না। নিজেদের ভাষাতেই কথা বলি আমরা, কি বলো জর্মন শেখ!'

স্বস্তিতে ভরে উঠল কুয়াশার বুক। প্রফেসর ওয়াই-ই রাজা অমেনটোটের ছদ্মবেশ নিয়ে আছে। যাক, প্রফেসর ওয়াইয়ের ছদ্মবেশ সে ধরতে পারলেও তার ছদ্মবেশ প্রফেসর ওয়াই এখনও ধরতে পারেনি।

'ইয়েস, স্যার!'

প্রফেসরের কথায় সায় দিয়ে মোটা খুঁটির সাথে শক্ত করে বাঁধা বন্দীদের দিকে তাকাল কুয়াশা। শহীদ, কামাল, ডি. কস্টা, মহুয়া, ওমেনা এবং মি. সিম্পসন—সবাইকে বন্দী করে এনেছে দেখা যাচ্ছে!

কিন্তু আর একজন কোথায়? যার জন্যে এত বিপদের মধ্যে দিয়ে এখান পর্যন্ত এসেছে সে তার ছায়াও তো দেখা যাচ্ছে না কোথাও!

'জর্মন শেখ! তোমার অ্যাসাইনমেন্ট সফল তো?'

কুয়াশা নকল রাজার দিকে তাকাল, 'ইয়েস, স্যার।'

'মি. কুয়াশা খতম?'

'খতম, স্যার। কূপের ভেতর তার অচেতন দেহটা নামিয়ে আমরা মাটি ফেলে কূপটা চাপা দিয়ে দিয়েছি। সে কেন, তার আত্মাও ওখান থেকে বেরুতে পারবে না আর।'

বিদ্যুতবেগে বন্দীদের দিকে তাকাল প্রফেসর ওয়াই, 'মি. টিকটিকি, শুনলে তো? তোমাদের রক্ষাকর্তাকে জ্যান্ত কবর দেয়া হয়েছে! এবার? বিশ্বাস হয়?'

শহীদ দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল, 'বোকার স্বর্গে বাস করছেন আপনি.

প্রফেসর। কুয়াশা এত সহজে মরতে পারে না। কারও কথা শুনে আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই…।'

কুয়াশা হঠাৎ চোখ টিপে ইঙ্গিত করল শহীদের উদ্দেশ্যে। কথা শেষ না করে থেমে গেল সে।

কুয়াশা বলে উঠল, 'কেউ যদি বিশ্বাস না করে তাহলে আমাদের করার কিছুই নেই, স্যার। তাছাড়া বন্দীদেরকে বিশ্বাস করাবার চেষ্টাই বা আমরা করছি কেন? ওদের সময়ও তো ঘনিয়ে এসেছে?'

'থ্যাঙ্ক ইয়ু, জর্মন। কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছ আমাকে। ইয়েস, ওদেরকে মরতে হবে। কোন রকম ঝুঁকি আমি আর নিতে চাই না। মন একটু নরম করে এর আগে দেখেছি আমি। এদেরকে কয়েক হাজার বার ক্ষমা করেছি আমি। তা দেখে ওরা ধরে নিয়েছে আমি দুর্বল। আর নয়। এবার আমি আমার ল্যাবরেটরিতে ফিরে যেতে চাই। কাজ করতে চাই এই পৃথিবীটাকে যান্ত্রিক মানুষের পৃথিবী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। এই কাজের জন্য চাই কোটি কোটি, শত সহস্র কোটি টাকা। টাকার ব্যবস্থা হবে। আমার হিসেব অনুযায়ী রহস্যপুরী থেকেই পাওয়া যাবে এক হাজার কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ। মুক্তো এবং ডায়মণ্ডের মূল্যও পাঁচশো কোটি টাকার কম হবে না। রহস্যপুরীর ধন উদ্ধার করার পর আমি লুঠ করব আমেরিকার ফোর্ট নক্স সহ সবগুলো বড় বড় ব্যাঙ্ক। বছর দু'য়েক এক মনে কাজ করার জন্য যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাবে সব মিলিয়ে। টাকাগুলো সংগ্রহ করা শেষ হলেই আমি ল্যাবরেটরিতে ঢুকব। কিন্তু এরা বেঁচে থাকলে আমাকে নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে দেবে না, এক একটা খুদে হারকিউলিস এরা। পালের গোদা বড় হারকিউলিসকে জ্যান্ত কবর দিয়েছি। এদেরকেও হত্যা করব। কিন্তু তার আগে হাতের কাজগুলো গুছিয়ে নিতে চাই। জর্মন শেখ!'

'ইয়েস, স্যার।'

'টিকটিকি শহীদ কি বলছে জানো? বলছে, আমি যাকে মি. সিম্পসনের ছদ্মবেশে গ্রীনল্যাণ্ডে পাঠিয়েছিলাম—আমি ডেভিলের কথা বলছি, তোমার বন্ধু। ওকে গ্রীনল্যাণ্ডে পাঠিয়েছিলাম মি. সিম্পসনের ছদ্মবেশে, বলেছিলাম তোমাকে কথাটা?'

'ইয়েস, স্যার।'

'মি. টিকটিকি বলছে ডেভিল নাকি ধরা পড়ে যায় এই জঙ্গলে স্পেসক্রাফট নামবার পর। স্পেসক্রাফটটা নষ্ট করে দেবার নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলাম ডেভিলকে। নষ্ট সে ঠিকই করে। কিন্তু শহীদ তাকে সন্দেহ করে এবং পরে তার ছদ্মবেশ ধরে ফেলে।'

'মাই গড! তারপর, স্যার!'

প্রফেসর দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'মি. টিকটিকি নাকি ডেভিলকে হত্যা করেছে!'

'হোয়াট!'

দ্রুত চিন্তা করছিল কুয়াশা। গ্রীনল্যাণ্ড থেকে সে যাকে উদ্ধার করে তিনি

তাহলে মি. সিম্পসন নন! একটু চিন্তা করতেই রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রফেসর ওয়াই মি. সিম্পসনকে গ্রীনল্যাণ্ড থেকে বন্দী করে নিয়ে আসে এই জঙ্গলে, তার বদলে গ্রীনল্যাণ্ডে রেখে আসে নকল মি. সিম্পসনকে অর্থাৎ ডেভিলকে।

মি. সিম্পসন এই জঙ্গলে বন্দী ছিলেন বলেই তার ইণ্ডিকেটর যন্ত্রে ধরা পড়েছিল ব্যাপারটা।

প্রফেসর ওয়াই বলে উঠলেন, 'জর্মন, বন্ধুর জন্য দুঃখ কোরো না। তার হত্যাকারীকে দেখতে পাচ্ছ তুমি তোমার সামনেই। এদেরকেই হত্যা করে প্রতিশোধ নেবে তুমি। তাহলেই বন্ধুর প্রতি কর্তব্য পালন করা হবে।'

চমকে উঠল কুয়াশা। প্রফেসর ওয়াই কি তার ছদ্মবেশ ধরে ফেলেছে? শহীদ, মহুয়া, মি. সিম্পসন, ডি. কস্টা, ওমেনা—এদেরকে খুন করতে হবে নিজের হাতে? প্রফেসর কি পরীক্ষা করতে চাইছে তাকে?

'ইয়েস, স্যার।' গম্ভীর হয়ে সায় দিল কুয়াশা।

'তবে এখনই নয়। হাতের কাজগুলো শেষ করা দরকার আগে। হেলা পর্বতের পশ্চিমের গুহায় আমার ম্যাটার ট্র্যান্সমিট করার মেশিন আছে, মনে আছে তো? ওখানে বন্দী করে রেখেছি আবিদকে। তাকে দরকার হবে আমাদের। রহস্যপুরীর পথ চেনে সে। তাকে তুমি গিয়ে নিয়ে এসো। সন্ধ্যার আগেই ফেরা চাই। রাতে উৎসব হবে জংলীদের। তুমি আর জংলীরা এই হারকিউলিসদেরকে বর্শার আঘাতে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করবে।'

কুয়াশা হাঁফ ছাড়ল। প্রফেসর ওয়াই তাকে পরীক্ষা করছে না। এখনও সন্দেহ করেনি সে কিছু।

'দেরি করা উচিত হবে না, জর্মন শেখ। তুমি যাত্রা করো। সাবধান, আবিদ যেন পালাতে না পারে।'

কুয়াশা হাসল। বলল, 'আমার হাত ফসকে কুয়াশাই পালাতে পারেনি, আর এ তো কুয়াশার তুলনায় একটা মাছির চেয়েও ছোট। আপনি ভাববেন না, স্যার। সন্ধ্যার আগেই আবিদকে নিয়ে ফিরে আসব।'

'আসার সময় খুব সাবধানে আসবে। আবিদ এই এলাকায় অনেকদিন ছিল। গরিলারা ওকে চেনে। গরিলারা যেন ওকে দেখতে না পায়।'

'ইয়েস, স্যার।'

'যাও তুমি। সন্ধ্যার আগেই ফিরো। সন্ধ্যার পরই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করা হবে।'

শহীদের দিকে আবার চোখ টিপে ইঙ্গিত করল কুয়াশা। তারপর ঘুরে দাঁড়াল।

দীর্ঘ পদক্ষেপে বেরিয়ে এল কুয়াশা জংলীদের গ্রাম থেকে।

গ্রামের ভেতর বিকট উল্লাসে ফেটে পড়ছে হাজার হাজার অসভ্য জংলী। রাজা অমেনটোট ঘোষণা করেছেন, বন্দীদেরকে আজ রাতে বর্শার খোঁচা মেরে মেরে হত্যা করা হবে।

উৎসব চলবে আজ সারাটা দিন এবং সারাটা রাত। বন্দীদের মাংস আজ

আগুনে ঝলসে আহার করা হবে।

জংলীরা আনন্দে আত্মহারা। তাদের গগনবিদারী চিৎকারে চারদিক কেঁপে কেঁপে উঠছে—জয় হোক রাজার! জয় হোক রাজা অমেনটোটের!

রাজা অমেনটোটকে উদ্ধার করতে হবে। বনভূমির উপর দিয়ে ঝড়ের বেগে এগিয়ে যেতে যেতে ভাবছে কুয়াশা। রাজাকে না দেখলে জংলীদের ভুল ভাঙবে না।

কিন্তু হাতে সময় বড় কম। পশ্চিমের হেলা পর্বত কি এখানে! সেখানে না গেলেও নয়। আবিদকে মুক্ত করা দরকার। আবিদের গরিলা বাহিনী কোন কাজে আসে কিনা দেখতে হবে।

এদিকে সন্ধ্যার আগেই ফিরতে হবে জংলীদের গ্রামে। কোনক্রমেই দেরি করা চলবে না।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল কুয়াশা। তার উপর নির্ভর করছে শহীদ, মহুয়া এবং অন্যান্যদের প্রাণ।

হাতির পিঠে চড়ে রওনা হবার কথা ভেবেছিল কুয়াশা। কিন্তু গভীর জঙ্গলে হাতি দ্রুত এগোতে পারে না। হাতির সাহায্য নিলে সময় নষ্ট হবে ভেবে কুয়াশা পা দুটোর উপর ভরসা করেই রওনা হয়েছে হেলা পর্বতের উদ্দেশে।

দুই

হেলা পর্বত অচেনা নয় কুয়াশার। পশ্চিমের হেলা পর্বতে সে কখনও না গেলেও তার কাছে যে ম্যাপ আছে তাতে হেলা পর্বতের নিশানা রয়েছে। কিন্তু পর্বতের গুহাটা খুঁজে বের করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হবে।

কোন একটা গুহার ভিতরেই আছে প্রফেসর ওয়াইয়ের আস্তানা। ম্যাটার ট্র্যান্সমিট করার মেশিন এবং আবিদ আছে সেই আস্তানায়।

পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিক দেখে নিচ্ছে সে। মাথার উপর চলে এসেছে আফ্রিকার ক্রুদ্ধ সূর্য। ট্রাউজারের পকেট থেকে বিনকিউলার বের করল সে। চোখে তুলল সেটা। পাহাড়ের প্রতি ইঞ্চি জায়গা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে সে।

অদ্ভুত একটা কাণ্ড দেখতে পেল কুয়াশা। পাহাড়ের প্রায় একশো গজ ওপরে হঠাৎ দেখা গেল দুটো গরিলাকে। পলকের জন্য দেখল কুয়াশা। গরিলা দুটো ছুটছে। পরক্ষণে পাহাড়ের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল তারা।

সেদিকে আরও খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল কুয়াশা। ব্যাপার কি! পাহাড়ী গরিলা তো সহজে ভয় পাবার মত পশু নয়। এরা যেমন হিংস্র তেমনি অসমসাহসী। মানুষ, বাঘ, সিংহ—কাউকেই এরা পরোয়া করে না।

হঠাৎ আরও একটা ব্যাপার দেখতে পেল কুয়াশা। ঠিক যে জায়গায় গরিলা দুটোকে দেখা গিয়েছিল সেই জায়গাতেই আবার দেখা গেল একটা বুনো হাতিকে। শুঁড় তুলে ঝড়ের বেগে ছুটছে হাতিটা!

পাহাড়ের উপর হাতি! অবিশ্বাস্য ব্যাপার। নিশ্চয়ই পাহাড়ের গায়ে পেঁচানো রাস্তা আছে। তা না হলে হাতি উঠল কি ভাবে অত উঁচুতে।

ঘটনা দুটো অবহেলার বিষয় নয়। কুয়াশা স্থির করল পাহাড়ের চারদিকটা দেখতে হবে। পথ একটা আছেই। নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে সেটা।

কিন্তু পথ থাকলে তা বিনকিউলারে ধরা না পড়বার কারণ কি? পথের পাশে কি পাথরের দেয়াল বা স্তূপ সৃষ্টি করে রেখেছে কেউ, যাতে নিচ থেকে পথের অস্তিত্ব টের পাওয়া না যায়?

অসম্ভব নয়।

ক্ষীণ একটা আশা জেগে উঠল কুয়াশার বুকে। প্রফেসরের কীর্তি হতে পারে এটা। হয়তো সে তার আস্তানায় যাতায়াত করার সুবিধার্থে একটা রাস্তা তৈরি করে রেখেছে। এই আস্তানা হয়তো বহুকাল আগেই গড়ে তুলেছে সে।

অল্পক্ষণ পরই কুয়াশার অনুমান সত্য প্রমাণিত হলো। যা ভেবেছিল সে, ঠিক তাই। পাহাড়ের পাদমূল থেকে পাহাড়কে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে প্রায় সমতল একটা রাস্তা ক্রমশ উঠে গেছে ওপর দিকে। পথের একধারে ছোট বড় পাথরের স্তূপ। দূর থেকে মনেই হয় না, পাথরগুলো কেউ বিশেষভাবে জড়ো করে রেখেছে।

খুব বেশি দূর উঠতে হলো না কুয়াশাকে। পাহাড়টাকে বার তিনেক ঘুরে দুশো গজের মত উপরে উঠে থমকে দাঁড়াতে হলো তাকে।

একটা গুহামুখ দেখা যাচ্ছে। ভিতরটা অন্ধকার। সোজা চলে গেছে পাহাড়ের অভ্যন্তরে।

লেসারগানটা বের করল কুয়াশা। এই গুহার ভিতর প্রফেসরের আস্তানা নাও থাকতে পারে। পাহাড়ী গরিলারা সাধারণত দখল করে রাখে এই ধরনের গুহাগুলোকে।

টর্চ বের করে জ্বালাল সে। দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ভিতর দিকে। এঁকেবেঁকে অনেক দূর চলে গেছে সুড়ঙ্গের মত। টর্চের আলোয় হঠাৎ দেখা গেল একটা দরজা।

লোহার দরজার গায়ে কোন তালা নেই। গুহার দেয়ালে টর্চের আলো ফেলল সে। সুইচবোর্ড থাকার কথা। আছে, দেখতে পেল কুয়াশা। দুটো সুইচে আঙুল দিয়ে দুটোই চেপে ধরল কুয়াশা।

উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল গুহার ভিতরটা। একই সাথে লোহার প্রকাণ্ড দরজাটা ঘড় ঘড় শব্দে সরে গেল দুদিকে।

ভিতরটাও আলোকিত। প্রশস্ত একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। কেউ কোথাও নেই। পাথরের মোটা মোটা পিলার সিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত নেমে এসেছে। চারদিকের দেয়ালে চারটে সুড়ঙ্গ পথ, চারদিকে চলে গেছে চারটে সুড়ঙ্গ।

নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল কুয়াশা। এটা প্রফেসর ওয়াইয়ের সৃষ্টি বলে বিশ্বাস হয় না। প্রকৃতিই পাহাড়ের অভ্যন্তরে এই রকম একটা হলরুম তৈরি করে রেখেছে। তবে সুড়ঙ্গ মুখের পাথর দেখে বোঝা যায়, মসৃণ করা হয়েছে ওগুলো। সুড়ঙ্গগুলো

হয়তো প্রফেসর লোক দিয়ে বা মেশিন দিয়ে তৈরি করেছে।

আবিদ!

কুয়াশার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। চারদিক থেকে ভেসে আসছে সেই একই শব্দ—আবিদ! আবিদ! আবিদ! আবিদ!

গা ছমছম করে ওঠে।

ধীরে ধীরে থামল প্রতিধ্বনি। আবিদের কোন সাড়া নেই। আবার সশব্দে নামটা ধরে ডাকল কুয়াশা!

দ্বিতীয়বার প্রতিধ্বনি থামতে ডান পাশের সুড়ঙ্গের দিক থেকে ভেসে এল আবিদের কণ্ঠস্বর, 'কে ডাকে আমাকে! কে ডাকে আমাকে! কে ডাকে আমাকে! কে ডাকে আমাকে! কে ডাকে…!'

আবিদ সাড়া দিয়েছে! সাড়া দিয়েছে সে একবারই। কিন্তু তার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে চারদিক থেকে।

দ্রুত এগিয়ে গেল কুয়াশা। সুড়ঙ্গ ধরে হন হন করে হেঁটে খানিক দূর গিয়ে দাঁড়াল সে। সামনে একটা দরজা। দরজার গায়ে গোল একটা গর্ত। গর্তটা দেখেই কুয়াশা বুঝল অক্সিজেন প্রবেশের পথ এটা।

'আবিদ! দরজা খোলার উপায় কি?'

'হাত গলিয়ে দিন গর্তে। কিন্তু…কিন্তু কে আপনি?'

কুয়াশা বলল, 'তুমি হয়তো আমাকে চিনবে না। আমার নাম কুয়াশা।'

'কুয়াশা! আপনি কুয়াশা! কুখ্যাত দস্যু আপনি! আমার ভাইয়ের মুখে শুনেছিলাম আপনার দুষ্কর্মের কথা! আপনি কেন এখানে এসেছেন? কি চান? কিছুই নেই আমার কাছে। আমাকে হত্যা করে আপনি…'

কুয়াশা গম্ভীর! দাঁড়িয়ে আছে সে পাথরের মূর্তির মত। হঠাৎ সে বলে উঠল ভারি কণ্ঠে, 'তুমি ভুল শোনোনি, আবিদ! সত্যি আমি ডাকাত! আমি শোষকদের ধন-সম্পদ কেড়ে নিই, তাদেরকে প্রয়োজনে হত্যাও করি। কিন্তু তুমি আর কিছু শোনোনি? শোনোনি আমি গরীবের পরম বন্ধু! শোনোনি, আমি অসহায় মানুষের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে যাই? শোনোনি, শোষক অত্যাচারীদের ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়ে কাদের মধ্যে সেসব বিলিয়ে দিই?'

আবিদের গলা কাঁপছে, 'না, শুনিনি! শুনলেও বিশ্বাস করতাম না। দস্যু কখনও গরীবের বন্ধু হতে পারে না।'

'এ তোমার ভুল ধারণা, আবিদ। তুমি জানো না। তুমি বিপদে পড়েছ, তাই এসেছি আমি। আমি জানি প্রফেসর ওয়াই তোমাকে বন্দী করে রেখেছে। আমি জানি, তোমার কাছে একটা কানা কড়িও নেই। তবু কেন এসেছি প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে? এসেছি তুমি বিপদে আছ বলে। এসেছি তোমাকে মুক্ত করব বলে।'

'আমি বিশ্বাস করি না। আপনি দস্যু! আপনি আমাকে মুক্ত করতে এসেছেন ঠিক, কিন্তু তাতে আপনার স্বার্থ আছে। আপনি রহস্যপুরীর সন্ধান পেতে চান। রহস্যপুরীর সন্ধান একমাত্র আমিই জানি। তাই আপনি আমার কাছে এসেছেন। রহস্যপুরীর পথ চিনে নিয়ে আপনি আমাকে খুন করবেন।'

কুয়াশা বলল, 'না। রহস্যপুরীর পথ আমিও চিনি, আবিদ। আজ নয় বহুকাল আগেই রহস্যপুরীর নক্শা আমার হাতে এসেছে। বিশ্বাস করছ না, কেমন? তবে শোনো, রহস্যপুরীর বর্ণনা দিই।'

রহস্যপুরী বাইরে থেকে দেখতে কেমন তা বর্ণনা করতে লাগল কুয়াশা। বর্ণনা শেষ করে জানতে চাইল সে, 'কি, মিলেছে?'

আবিদের গলায় বিস্ময়, 'আশ্চর্য! আপনি তাহলে···।'

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ রহস্যপুরী কোথায় অবস্থিত, কোন্ পথ ধরে গেলে তার দেখা পাওয়া যাবে তা আমি জানি। আফ্রিকার জঙ্গলে বহু জংলী রাজা আমার বন্ধু। তাদের কাছ থেকেই রহস্যপুরী সম্পর্কে জানতে পারি আমি। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রহস্যপুরীতে এতদিন অভিযান চালাইনি। তার কারণ জংলীরা বিশ্বাস করে তাদের দেবতারা রহস্যপুরীতে বাস করেন। ওখানে গেলে রহস্যপুরীর পবিত্রতা নষ্ট হবে ভেবে জংলীরা কোন অ-জংলীকে যেতে দিতে চায় না। বন্ধুদের মনে দুঃখ দিতে চাইনি বলে তখন রহস্যপুরীতে যাইনি আমি। কিন্তু এখনকার অবস্থা অন্য রকম। প্রফেসর ওয়াইকে বাধা দেবার জন্য হলেও রহস্যপুরীতে অভিযান চালাতে হবে। যাক, আবিদ, দরজাটা খোলার উপায়টি বলো এবার।'

আবিদের কথামত কুয়াশা গর্তের ভিতর হাত গলিয়ে দিয়ে একটা বোতাম স্পর্শ করল। চাপ দিতেই দরজাটা খুলে যেতে লাগল ধীরে ধীরে।

দরজা পেরিয়ে একটা কাঁচ দিয়ে ঘেরা কেবিনের ভিতর প্রবেশ করল কুয়াশা। আবিদ বসে আছে একটা হাতলওয়ালা চেয়ারের উপর। হাত-পা চেয়ারের সাথে বাঁধা তার।

কুয়াশার দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল আবিদ। এ লোক দস্যু হয় কি করে? নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করে সে। এমন রাজকীয় চেহারা, এমন সুপুরুষ কখনও ডাকাত হতে পারে না।

দ্রুত আবিদের বন্ধন মুক্ত করে দিল কুয়াশা।

বলল, 'আবিদ, তোমাকে একটা খুব জরুরী কাজ করতে হবে।'

সাগ্রহে জানতে চাইল আবিদ, 'বলুন।'

কুয়াশা বলল, 'তুমি আমার সম্পর্কে যতটা জানো, আমি কিন্তু তোমার সম্পর্কে তার চেয়েও অনেক বেশি জানি। তুমি যে নক্শাটা শিকারী অর্থাৎ বাজপাখির গলায় বেঁধে পাঠিয়েছিলে ঢাকায় তার কথাও আমি জানি। সেই নক্শাও আমার কাছেই আছে। নক্শাটা তোমাদের ঢাকার বাড়ি থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে প্রফেসর ওয়াই। আমার পরিচিত একজন ডিটেকটিভ মি. শহীদ, তার সহকারী মি. কামাল, স্পেশাল ব্রাঞ্চের গোয়েন্দা অফিসার মি. সিম্পসন, আমার সহকারী ডি. কস্টা—এরা সবাই প্রফেসরকে বাধা দেবার চেষ্টা করে। ফলে প্রফেসর এদেরকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। এরা সবাই এখন এই কঙ্গোর গভীর জঙ্গলে প্রফেসরের হাতে বন্দী। প্রফেসর ওয়াই জংলীদের রাজা অমেনটোটের ছদ্মবেশ নিয়ে আছে। জংলীরা তার ছদ্মবেশ ধরতে পারেনি। ওদের প্রকৃত রাজার কোন সন্ধান এখনও আমি পাইনি।'

'দাদা, আপনাকে আমি দাদা বলে ডাকার অনুমতি পাব কি?'

'অধিকারের প্রশ্ন নয়, ভাই। তুমি আমাকে যে কোন নামে ডাকতে পারো।'

আবিদ বলল, 'একজন জংলীকে প্রফেসর ওয়াই বন্দী করে নিয়ে এসেছিল তিন দিন আগে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, সেই হয়তো জংলীদের রাজা···।'

'সেই! প্রফেসর তাকে কি হত্যা···?'

'তা তো বলতে পারি না, দাদা। তবে এখান থেকে জংলীর অচেতন দেহটা কাঁধে করে নিয়ে বেরিয়ে যায় সে!'

'আচ্ছা আবিদ, পাহাড়ের আরও উপরে কি কোন গুহাটুহা আছে?'

'সম্ভবত আছে। আমার সন্দেহ প্রফেসর মাল পত্তর রাখার জন্য একটা গুহাকে ব্যবহার করে। এখান থেকে অনেক যন্ত্রপাতি নিয়ে গেছে সে।'

কুয়াশা বলল, 'ঠিক আছে। আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। কিন্তু হাতে সময় বড় কম, আবিদ। শহীদ, কামাল—এদেরকে প্রফেসর হত্যা করবে সন্ধ্যার পর। সন্ধ্যার আগেই আমাকে পৌঁছতে হবে জংলীদের গ্রামে। অবশ্য আমি না ফেরা অবধি প্রফেসর অপেক্ষা করতেও পারে। তবু, ঝুঁকি নেয়াটা উচিত হবে না। এদিকে জংলীদের রাজা অমেনটোটের ভাগ্য সম্পর্কে বাস্তব তথ্য চাই আমি। সে যদি বেঁচে থাকে তাহলে তাকে উদ্ধার করতে হবে। জংলীরা তাদের রাজাকে দেখে সব বুঝতে পারবে। খসে পড়বে প্রফেসর ওয়াইয়ের মুখোশ। ঠিক সেই সময়ই আঘাত হানতে চাই প্রফেসর এবং তার দলবলের ওপর।'

'আপনি অনুমতি দিলে আমি একটা কথা বলি, দাদা,' সবিনয়ে বলল আবিদ।

'তুমি বোধহয় তোমার গরিলাবাহিনীর কথা বলতে চাইছ?'

আবিদের মুখের চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল, 'দাদা, আপনি আমার মনের কথা বললেন কিভাবে!'

কুয়াশা হাসল। বলল, 'তোমার গরিলাবাহিনীর কথাও জানি আমি, আবিদ। তোমার সাহায্য দরকার হবে। কথাটা আগেই ভেবেছিলাম। তুমি এক কাজ করো। তোমার গরিলাবাহিনী নিয়ে তুমি জংলীদের গ্রামের দিকে রওনা হও। সন্ধ্যার আগে পৌঁছতে পারবে তো!'

'পারব, দাদা।'

'বেশ শোনো, গ্রামের ভিতর ঢুকো না ভুলেও। গ্রামের চারদিকে গরিলাদের লুকিয়ে রাখবে। আমি চেষ্টা করব সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে পৌঁছুতে। আমি পৌঁছে অবস্থা দেখে ব্যবস্থা করব।'

'তাই হবে, দাদা।'

আরও খানিকক্ষণ আলোচনা করল ওরা, কুয়াশা জংলীদের গ্রামের অবস্থান জানিয়ে দিল আবিদকে। আবিদের হাতে তুলে দিল একটা পিস্তল। বিপদের সাথী হিসেবে।

গুহা থেকে বেরিয়ে এল দুজন। আবিদ বিদায় নিয়ে নামতে শুরু করল পাহাড় থেকে। কুয়াশা প্রফেসরের দ্বিতীয় গুহার সন্ধানে উঠতে শুরু করল আরও উপরে।

তিন

পেঁচানো পথ ধরে পনেরো মিনিট ওঠার পর কুয়াশা থমকে দাঁড়াল। সামনে এগোনো সম্ভব নয় আর। কালো লোমশ পাহাড়ী গরিলারা পথের উপর বসে আছে। একটা নয়, পাঁচ সাতটা। পথের বাঁকেও দেখা যাচ্ছে আরও ক'টাকে। তারা ছুটোছুটি করছে। একবার ছুটে চলে যাচ্ছে পথের বাঁকে, আড়ালে, পরমুহূর্তে পিছিয়ে আসছে সবেগে। দেখে মনে হচ্ছে, গরিলারা কাউকে তাড়া করে এগিয়ে যাচ্ছে, পরমুহূর্তে প্রতিপক্ষের তাড়া খেয়ে পিছু ছুটে আসছে।

হাতে লেসারগান থাকলেও সেটা ব্যবহার করার কথা ভাবল না কুয়াশা। গরিলার ব্যাপারে তার বিশেষ দুর্বলতা আছে।

কুয়াশাকে দেখে ক্লান্ত পাহাড়ী গরিলারা উঠে দাঁড়াল। প্রমাদ গুনল কুয়াশা। ঢাকের শব্দ উঠল, কেঁপে উঠল সেই শব্দে চারদিক। পাহাড়ী গরিলা ভীষণ হিংস্র, মানুষ দেখলেই তারা ক্রোধে অন্ধ হয়ে দুই হাত দিয়ে বিশাল বুক চাপড়াতে শুরু করে। বুক চাপড়াবার শব্দটাই ঢাক পেটাবার শব্দের মত শোনা যায়। এ তাদের যুদ্ধের আহ্বান।

লেসারগান তুলে বোতামে চাপ দিল কুয়াশা। পথের মাঝখানে গভীর একটা গর্তের সৃষ্টি হলো পরমুহূর্তে। কুয়াশার উদ্দেশ্য গরিলাদেরকে ভয় দেখানো।

লাফ দিয়ে গর্ত টপকে এগিয়ে আসছে পাহাড়ের মত প্রকাণ্ডদেহী গরিলারা। কুয়াশার উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ভয় পায়নি তারা।

সাদা কোদালের মত ধারাল বড় বড় দাঁত বের করে এগিয়ে আসছে তারা! সর্বনাশ! হাতের আওতায় পেলে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে ওরা তাকে।

দ্রুত চিন্তা করছিল কুয়াশা। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার কোন পথ খুঁজে পেল না সে। স্থাণুর মত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল কুয়াশা।

এমন সময় একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটল। রাস্তার বাঁকের দিক থেকে হঠাৎ ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে দেখা গেল অসংখ্য গরিলাকে।

বিমূঢ় হয়ে পড়ল কুয়াশা। এ কি কাণ্ড! এত গরিলা এখানে আছে! কিন্তু এমন উন্মাদের মত ছুটে আসছে কেন এরা!

কুয়াশাকে আক্রমণোদ্যত চার-পাঁচটা গরিলা থমকে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল তারা। পরমুহূর্তে তাদের মধ্যেও একটা পরিবর্তন দেখা দিল। দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে তারাও ছুটল পাগলের মত।

পথ ছেড়ে দিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াল কুয়াশা। এতক্ষণে বুঝতে পারল সে, গরিলাদের ভয় পাবার কারণ।

তাড়া করে আসছে বুনো হাতির দল। গরিলারা ভয়ে ছুটছে যে যেদিকে পারছে।

ঘটনাটা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে গেল। কুয়াশার পাশ দিয়ে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটা ভয়াল আকৃতির পাহাড়ী গরিলা ঝড়ের বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল পিছনের বাঁকা পথের আড়ালে। কুয়াশাকে তারা দেখেও দেখল না।

বুনো হাতির দল এসে পড়েছে কাছে। আকাশের দিকে শুঁড় তুলে গগনবিদারী কণ্ঠে ডাক ছাড়ছে তারা। সংখ্যায় এরা পঁচিশ-ত্রিশটার কম হবে না।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াল কুয়াশা। এতটুকু নড়ছে না সে। গরিলারা পালিয়েছে, জান বেঁচেছে। কিন্তু বুনো হাতিরা এসে পড়েছে একেবারে কাছে। এদের হাত থেকে বাঁচার উপায় কি?

দশ বারোটা হাতি কুয়াশার পাশ দিয়ে চলে গেল। গরিলাদের দেখা না গেলেও, তাড়া করে পাহাড়ের একেবারে নিচে নামিয়ে দিতে চাইছে বোধহয়।

অন্যান্য হাতিরা ফিরে গেছে, যেদিক থেকে তাড়া করে এসেছিল সেদিকে।

কুয়াশা এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল, দু'দিকের রাস্তাই ফাঁকা। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল সে।

এগিয়ে গিয়ে দেখতে হবে রহস্যটা কি। বুনো হাতিরা পাহাড়ে চড়ে করছেটা কি? রাজা অমেনটোট···।

আশার একটা আলো দেখতে পাচ্ছে কুয়াশা। দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল সে সামনের দিকে।

রাজা অমেনটোটের সাথে বহু বছর আগে পরিচয় হয়েছিল কুয়াশার। রাজা অমেনটোট তখন রাজা হয়নি। সে ছিল রাজকুমার। যুবক অমেনটোটের বড় প্রিয় ছিল বনভূমির বুনো হাতিরা। শিকার করতে বেরিয়ে সে কখনও হাতি বধ করত না। কথাটা আজও মনে আছে কুয়াশার। সেজন্যেই একটা আশার আলো দেখতে পাচ্ছে সে। কিন্তু···।

মন্দ দিকটাও চিন্তা করল কুয়াশা। হয়তো রাজা অমেনটোটকে প্রফেসর ওয়াই হত্যা করেছে এই পাহাড়ে ধরে নিয়ে এসে। রাজার মৃতদেহ পড়ে আছে হয়তো সামনে কোথাও। সেই মৃতদেহ পাহারা দিচ্ছে বুনো হাতিরা। প্রভুর মৃতদেহ আগলে রেখেছে তারা, ধারে কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না পাহাড়ী গরিলাদের।

হঠাৎ সংবিৎ ফিরল কুয়াশার। বিদ্যুৎবেগে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে। লেসারগানটা তুলল উপর দিকে। কিন্তু তখন বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে!

টেরই পায়নি কুয়াশা। মনেই ছিল না দশ বারোটা হাতি গরিলাদের তাড়া করে নিয়ে গেছে, কিন্তু ফিরে আসেনি। গভীরভাবে চিন্তা করছিল বলে শব্দও পায়নি সে। বুনো হাতির দল ঝড়ের বেগে এসে পড়ল তার গায়ের কাছে।

ধাক্কা খেয়ে শক্ত পাথরের উপর গড়িয়ে পড়ল কুয়াশা। হাতের লেসারগান ছিটকে পড়ে গেল দশ হাত দূরে।

উন্মত্ত একটা হাতি বিশ মণ দেহের ওজনসহ একটা পা কুয়াশার বুকের উপর তুলে দিচ্ছে। সবেগে দেহটাকে গড়িয়ে দিল কুয়াশা। একটার থেকে রক্ষা পেলেও, আরও তিনটে তখন শুঁড় উঁচু করে ছুটে আসছে তাকে লক্ষ্য করে।

হাঁপাচ্ছে কুয়াশা। বুনো উন্মত্ত হাতির দলের মাঝখানে পড়ে গেছে সে। এরকম বিপদে পড়লে বাঁচার আশা করা বৃথা।

বিদ্যুৎ খেলে গেল কুয়াশার দেহে। চোখের পলকে উঠে দাঁড়াল সে। স্যাঁৎ করে সরে গেল প্রথমে ডান দিকে, তারপর বাঁ দিকে, তারপর আবার ডান দিকে।

তাকে লক্ষ্য করে বিভিন্ন দিক থেকে ছুটে আসছে হাতিরা একে একে। কতক্ষণ এভাবে টিকে থাকা সম্ভব? দম ফেলারও সময় পাচ্ছে না কুয়াশা। লেসারগানটা পড়ে রয়েছে হাত দশেক দূরে। সেটা কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করা তো দূরের কথা, সেদিকে তাকাবার কথাও মনে নেই কুয়াশার। তাকাতে গেলেই সময় নষ্ট। তাকাতে গেলেই হাতির পায়ের নিচে পড়ে চিড়ে-চ্যাপটা হয়ে যেতে হবে।

ঘেমে গেছে কুয়াশা। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। বিপদের চরম রূপ প্রত্যক্ষ করছে সে এবার। হাতিগুলো এবার দু'দিক থেকে দুই দলে ভাগ হয়ে ছুটে আসছে। সরে যাবার উপায় নেই কোনদিকে।

হিংস্র দানবের মত লাগছে বুনো হাতিগুলোকে। পাহাড়ও থরথর করে কাঁপছে যেন তাদের পদভারে।

প্রাণ রক্ষার শেষ চেষ্টা করল কুয়াশা। হাতিগুলো কাছাকাছি চলে এসেছে। প্রাণপণ শক্তিতে শূন্যে লাফ মারল সে।

কুয়াশাকে পরমুহূর্তে দেখা গেল একটা হাতির পিঠে চড়ে বসে থাকতে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। হাতিটা নিষ্কৃতি দিল না তাকে। শুঁড় উঁচু করে গগনবিদারী কণ্ঠে ডেকে উঠল সে। তারপর শুঁড় দিয়ে কুয়াশাকে জড়িয়ে ধরে পিঠ থেকে নামিয়ে আনল।

ছুটছে হাতির দল।

দলের আগে আগে ছুটছে যে হাতিটা তার শুঁড়ের বাঁধনে বন্দী কুয়াশা। হাত-পা ছুঁড়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে সে।

কিন্তু হাতির শুঁড় যাকে একবার জড়িয়ে ধরে তার আর রক্ষা নেই। হাতির হাতেই এখন কুয়াশার জীবন মরণ নির্ভর করছে।

সামনেই পথের বাঁক। সেদিকেই ছুটছে হাতির দল। বাঁক ঘুরে গতি মন্থর করল তারা। আরও কয়েক গজ এগোবার পর দাঁড়িয়ে পড়ল।

কুয়াশার দম বন্ধ হয়ে আসছে। শুঁড় তার বুক আর পিঠের উপর চেপে বসছে। পাঁজরের হাড়ে ব্যথা লাগছে বড়। ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠেছে কুয়াশার মুখ। ভেঙে যাবে, এবার মটমট করে ভেঙে যাবে পাঁজরের হাড়গুলো।

হঠাৎ একটু ঢিলে হলো শুঁড়ের প্যাঁচ। বুক ভরে শ্বাস নিল কুয়াশা। হাতিটা নামিয়ে দিল তাকে পথের উপর। এগিয়ে এল এক পা। হাতিটার সামনের প্রকাণ্ড ডান পা-টা মুখের উপর দেখতে পাচ্ছে কুয়াশা। নেমে আসছে পা-টা।

সরে যেতে চেষ্টা করল কুয়াশা। পারল না। ঘিরে দাঁড়িয়েছে সব'কটা প্রকাণ্ডদেহী দানব। সরে যাবে কোথায় সে?

নেমে আসছে কুয়াশার মুখের উপর বিশ মণ ওজন বিশিষ্ট দানবের পা-টা।

আর এক মুহূর্ত। তারপরেই পাথরের সাথে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে রক্ত, মাংস, হাড়, মগজ সহ কুয়াশার মুখ।

এমন সময় কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'রোল! অমেনটোট টেটা—রোল! রোল! রোল! অমেনটোট টেটা…!'

চার

অকস্মাৎ কালো ধোঁয়ায় জায়গাটা অন্ধকার হয়ে গেল। দুই কি তিন সেকেণ্ড সময় পেয়েছিল কুয়াশা। এই অল্প সময়ের মধ্যে পকেট থেকে স্বআবিষ্কৃত একটা গ্যাস বোমা বের করে ফাটিয়ে দিয়েছে সে।

হাতিরা অবশ্য আগেই সরে গেছে তার কাছ থেকে।

তখনও সেই কর্কশ কণ্ঠস্বর থেকে চিৎকার ভেসে আসছিল: অমেনটোট টেটা! রোল! কিরিক ডুরুম! 'আশা,—নাচা! নাচা! অমেনটোট টেটা! রোল! রোল! 'আশা—নাচা! নাচা!

বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে নয়, পুরানো বন্ধু জংলীদের রাজা অমেনটোট-এর কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কুয়াশার মুখ। তাকে শেষ মুহূর্তে চিনতে পেরেছে রাজা অমেনটোট। তার নির্দেশেই হাতিগুলো সরে গেছে।

কুয়াশা অবশ্য অমেনটোটের কণ্ঠস্বর শোনার আগেই ফাটিয়ে দিয়েছিল গ্যাস বোমা।

রাজা অমেনটোট ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে যেতে বলছে কুয়াশাকে। আর কোন ভয় নেই।

ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কুয়াশা। মুখোশটা খুলে সামনের দিকে তাকাল সে।

প্রকাণ্ড একটা গুহা দেখা যাচ্ছে। পথ শেষ হয়ে গেছে গুহার কাছে গিয়ে।

কিন্তু কোথায় রাজা অমেনটোট! কুয়াশার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল গুহামুখের কাছ থেকে অনেক উপরে।

পথের উপর থেকে প্রায় পাঁচ মানুষ সমান উঁচুতে একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে রাজা অমেনটোট। পাথরের সাথে তার হাত-পা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা শক্ত নাইলনের কর্ড দিয়ে।

বুনো হাতি এবং পাহাড়ী গরিলাদের লড়াইয়ের কারণ কি বুঝতে পারল এতক্ষণে কুয়াশা। গরিলারা রাজা অমেনটোটকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করছিল, বাধা দিচ্ছিল রাজার গুণমুগ্ধ বুনো হাতির দল।

রাজা অমেনটোট হাসছে। চিৎকার করছে সে: 'আশা! 'আশা! দেবতা পাঠিয়েছে তোমাকে! মরেই তো যাচ্ছিলাম, এমন সময় তুমি এলে! বন্ধু তোমার প্রতি আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব। বন্ধু, তোমার অতীতের ঋণ পরিশোধ করতে পারিনি। আজকের ঋণও পরিশোধ করতে পারব না। 'আশা, তুমি মহান! 'আশা, তুমি নমস্য!

'থামো, থামো! অত প্রশংসা কোরো না আমার। প্রাণ তো বাঁচালে তুমিই আমার। আর এক মুহূর্ত দেরি হলে তোমার ভক্তবৃন্দ দিত আমাকে খতম করে।'

রাজা অমেনটোট হাসতে লাগল, 'একটুও বদলাওনি তুমি, 'আশা। আগের মতই বিনয়ী আছ দেখছি।'

'কথা পরে হবে। দাঁড়াও তোমাকে আগে নামিয়ে আনি।'

পাহাড়ের গায়ে পা দিয়ে উপর দিকে উঠতে লাগল কুয়াশা।

রাস্তার দু'ধারে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে বুনো হাতির দল। কুয়াশার দিকে তাকাচ্ছেও না তারা, যেন লজ্জায় মিশে যেতে চাইছে মাটির সাথে।

রাজাকে বন্ধনমুক্ত করে নামিয়ে আনল কুয়াশা।

'তোমার এই দশা হলো কি করে।'

রাজা বলল, 'সে এক ভয়ঙ্কর ঘটনা। 'আশা, ঘটনাটা বললে তুমি বিশ্বাস করবে না।'

কুয়াশা হেসে ফেলল। বলল, 'বিশ্বাস করব না মানে? জানো, যা যা ঘটেছে তা আমিই বলে দিতে পারি তোমাকে?'

'সে কি! তা কেমন করে সম্ভব! তুমি সে ঘটনা জানবে কোত্থেকে!'

কুয়াশা বলল, 'সব কথা চলতে চলতে বলব। চলো, যাত্রা শুরু করি।'

'চলো।'

লেসারগানটা খুঁজতে হলো না। অদূরেই পড়েছিল সেটা। তুলে নিল কুয়াশা। হাতির পিঠে চড়ল ওরা। দুটো হাতি ওদের দু'জনকে পিঠে নিয়ে দ্রুত বেগে নামতে লাগল পাহাড়ী পথ ধরে।

কুয়াশা বলে চলেছে, 'শিকারে বেরিয়েছিলে তুমি, তাই না! শিকার করতে করতে পথ হারিয়ে ফেলেছিলে তোমরা। এমন সময় একটা সভ্য জগতের লোক তার দলবল নিয়ে তোমাকে আক্রমণ করে এবং বন্দী করে এখানে নিয়ে আসে। সে তোমার ছদ্মবেশ ধারণ করে···।'

রাজা অমেনটোট বলে উঠল, 'আশ্চর্য! সবই তুমি জানো দেখছি। কিন্তু আরও ব্যাপার আছে। পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি একা নই, আমার দেহরক্ষীরাও ছিল আমার সাথে। পথ হারাতাম না। জঙ্গলে হঠাৎ একটা মানুষের অট্টহাসির শব্দ পাই আমরা। হাসি লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে থাকি আমরা। কিন্তু যতই এগুই, হাসির শব্দের উৎস খুঁজে পাই না। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যা হয়ে গেল। এমন সময় হঠাৎ একটা ভৌতিক কাণ্ড ঘটল। আমার চোখের সামনে থেকে আমার দশজন দেহরক্ষী বাতাসের সাথে কর্পূরের মত উবে গেল। বোকা বনে গেলাম আমি। ঠিক তখন একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন সভ্য জগতের লোক। তার সাথে আরও কয়েকজন ছিল। তারাই আমাকে বন্দী করে নিয়ে আসে এখানে।'

'তোমার দেহরক্ষীরা কেউ বেঁচে নেই, অমেনটোট। যে লোকটা তোমাকে বন্দী করে সে লোকটা আমাদের দেশেরই একজন ভয়ঙ্কর অপরাধী। তার নাম প্রফেসর ওয়াই। লোকটার খুব বুদ্ধি। তার কাছে এমন একটা অস্ত্র আছে যা দিয়ে যে কোন মানুষ বা জিনিসকে বাতাসের সাথে মিশিয়ে দেয়া যায়। অস্ত্রটার নাম ভ্যানিশিং রে! যাক, সেই প্রফেসর ওয়াই এখন কোথায় জানো?'

'কোথায়?'

'তোমার গ্রামে। তোমার ছদ্মবেশ নিয়ে আছে সে। তোমার প্রজারা তার ছদ্মবেশ টের পায়নি। তারা তাকেই রাজা বলে মনে করছে।'

'কী বলছ তুমি, 'আশা।'

'ঠিকই বলছি। শুধু তাই নয়, প্রফেসর ওয়াই আমার বন্ধুবান্ধবদেরকে বন্দী করে রেখেছে গ্রামে। আজ রাতে তাদেরকে সে হত্যা করবে। অমেনটোট, তোমার হাতিদেরকে আরও জোরে ছুটতে বলো।'

রাজার আদেশ পেয়ে হাতিরা ছুটতে শুরু করল দ্রুততর লয়ে।

সূর্য ঢলে পড়ছে পশ্চিমাকাশে। দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠছে কুয়াশার কপালে। সন্ধ্যার আগে কি তারা পৌঁছতে পারবে গ্রামে।

'কিন্তু এসব কেন করছে লোকটা? সে কি রাজা হতে চায় আমার প্রজাদের?'

কুয়াশা বলল, 'না সে রহস্যপুরীর ধন-সম্পদ লুঠ করার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে। আমরা এসেছি তাকে বাধা দেবার জন্যে। তাই আমাদেরকে হত্যা করার জন্য তোমার প্রজাদেরকে বোকা বানিয়ে তাদের সাহায্য নিচ্ছে সে।'

রাজা অমেনটোট গম্ভীর হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ পর প্রশ্ন করল, 'লোকটার ক্ষমতার কাছে আমরা টিকতে পারব কি, 'আশা?'

কুয়াশা বলল, 'আমার ক্ষমতা ওর চেয়ে অনেক বেশি, অমেনটোট! তুমি চিন্তা কোরো না। আমি ভাবছি, সন্ধ্যার মধ্যে পৌঁছতে পারব কিনা গ্রামে।'

'অসম্ভব! গ্রামে পৌঁছতে বেশ রাত হয়ে যাবে আমাদের! আমাকে উদ্ধার করতে এসে ভুল করেছ, 'আশা। দেখা যাচ্ছে আমাকে উদ্ধার করার বদলে তুমি তোমার বন্ধুবান্ধবকে হারাতে যাচ্ছ।'

সন্ধ্যার আগে না হোক, সন্ধ্যার কাছাকাছি সময়ে জংলীদের গ্রামে পৌঁছবার একটা উপায় জানা আছে কুয়াশার। সামনে গভীর জঙ্গল। হাতি দ্রুতবেগে ছুটতে পারবে না।

নামতে হবে হাতির পিঠ থেকে। নেমে ছুটতে হবে। হাঁটলে চলবে না, প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়ুতে হবে। তাহলেই কেবল সম্ভব সময় মত জংলীদের গ্রামে পৌঁছুনো।

কিন্তু রাজা কি পারবে দৌড়ুতে এই ক্লান্ত, অভুক্ত শরীর নিয়ে?

পাঁচ

গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করল হাতি। গতি হলো মন্থর। ঝোপঝাড়, ঘনসন্নিবেশিত গাছপালার শাখা প্রশাখা চলার পথে বিরাট হুমকি হয়ে দেখা দিল। হাতিদেরকে ঘনঘন দিক পরিবর্তন করতে হচ্ছে। সময় নষ্ট হচ্ছে প্রচুর, কিন্তু অগ্রগতি হচ্ছে নামমাত্র।

'এভাবে সম্ভব নয়।' ব্যস্ত হয়ে উঠল কুয়াশা।

'উপায় কি, 'আশা!' রাজা অমেনটোটও উৎকণ্ঠিত।

'এক কাজ করা যাক। কিন্তু তোমার দুর্বল, অভুক্ত শরীর—তুমি কি পারবে!'

হাসল জংলীরাজ অমেনটোট।

'বন্ধুর উপকার হলে নিজের প্রাণও বিসর্জন দিতে পারে রাজা অমেনটোট।'

কুয়াশা বলল, 'হাতির পিঠ থেকে নেমে পড়ি এসো। সূর্য এখনও অস্ত যায়নি।

দু'জনে দৌড় দিই। মাইল দশেক পথ বড়জোর। সন্ধ্যার সময় ঠিক পৌঁছে যাব।'

'চমৎকার! এমন সহজ একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এল না কেন তাই বুঝতে পারছি না। দেরি নয়, 'আশা। নামা যাক। কিন্তু, বন্ধু, একটা শর্ত আছে।'

'কি শর্ত?'

'তুমি আমাকে পিছনে ফেলে রেখে এগিয়ে যেতে পারবে না। তোমার সাথে দৌড়ে আমি পারব না। গতবার, সে আজ দশ বছর আগের কথা, পারিনি তোমার সাথে…।'

বুনো হাতিদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বিদায় করল রাজা। তারা বিদায় নেবার পর দৌড়ুতে শুরু করল ওরা দু'জন। কুয়াশার কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে সে। রাজা অমেনটোটও কম যায় না। একবারও পিছিয়ে পড়েনি সে। তার গায়ে যেন বিদ্যুতের শক্তি খেলা করছে।

সূর্য অস্ত গেছে। তবে আকাশ এখনও উজ্জ্বল। গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা।

হাঁপাচ্ছে দু'জনেই। ঘামে ভিজে গেছে রাজা অমেনটোটের সর্ব শরীর। কুয়াশার পোশাকও ভিজে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল এক সাথে দুই বন্ধু। সামনে একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

পরস্পরের দিকে গম্ভীর মুখে তাকাল ওরা।

'গরিলা! তারমানে তোমার সেই লোক, কি যেন নাম, আবিদ—আবিদের ভক্ত গরিলারা…!'

কুয়াশা কথা বলল না। কপালের লম্বা চুল সরিয়ে গরিলার রক্তাক্ত দেহটার দিকে চেয়ে রইল সে। তারপর হঠাৎ আবার প্রাণপণে দৌড়ুতে শুরু করল।

পিছু নিল রাজা অমেনটোট। প্রতি মুহূর্তে বুকের ভয়টা ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে। একটা নয়, সামনে ওরা আরও অসংখ্য গরিলার মৃতদেহ রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখল। শুধু গরিলা নয়, পড়ে আছে অনেক জংলীর লাশও।

উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠল রাজা অমেনটোট, ' 'আশা! এ কী সর্বনাশা কাণ্ড! আমার প্রজাদের কারও দেহ অর্ধেকটা নেই, কারও পা দু'টো নেই, কারও মাথাটা নেই—এসব আমি কি দেখছি?'

কথা বলবার মত মানসিক অবস্থা নেই কুয়াশার। তীর বেগে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করল সে।

ফাঁকা, জনশূন্য গ্রাম।

থমকে দাঁড়াল কুয়াশা। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ছোট ছোট ঘরগুলো! গ্রামের ভিতর অনেক লাশ। জীবিত একজন মানুষকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। অধিকাংশ জংলীই গ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে।

আবার ছুটল কুয়াশা। গ্রামের মাঝখানে চলে এল সে। এখনও জ্বলছে রাজা অমেনটোটের দোতলা বাসভবন। মাঠের মাঝখানে শত শত জংলীর লাশ।

ভ্যানিশিং রে কারও মাথা, কারও কোমরের নিচের অংশ গায়েব করে দিয়েছে।

পাগলের মত মাঠের মাঝখানে ঘুরছে কুয়াশা। শহীদ, মহুয়া, কামাল, মি. সিম্পসন, ডি. কস্টা এবং আবিদ—একজনের লাশও কি পাওয়া যাবে না! গোটা মাঠের প্রায় সবগুলো লাশ দেখে ফেলল কুয়াশা। নেই!

তবে কি প্রফেসর ওয়াই জংলীদেরকে হত্যা করে পালাবার সময় ওদেরকে বন্দী করে নিয়ে গেছে?

পাথরের মূর্তির মত মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল কুয়াশা। তার চারদিকে লাশ। চোখ দুটো ভিজে গেল তার।

'আশা!' কাঁদছে রাজা অমেনটোট। কুয়াশার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে। ধীরে ধীরে তাকাল কুয়াশা। দেখল রাজার পাশে এক জংলী যুবক দাঁড়িয়ে আছে। থরথর করে কাঁপছে যুবকটি। চোখের মণি দুটো কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে তার।

'আমার প্রজাদের বেশির ভাগই পালিয়েছে গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে। এই ছেলেটা ফিরে এসেছে আমাদেরকে দেখে। এ বলছে, তোমার বন্ধু-বান্ধবদেরকে শয়তান ওয়াই বন্দী করে নিয়ে গেছে···।'

কুয়াশা কথা বলল না।

জংলী যুবক ঠকঠক করে কাঁপছে এখনও আতঙ্কে। হঠাৎ সে কাঁপা গলায় কথা বলতে শুরু করল।

জংলী যুবকের কথা শুনে প্রকৃত ঘটনাটা জানতে পারল ওরা।

আবিদ সন্ধ্যার অনেক আগেই পৌঁছেছিল গরিলাবাহিনী নিয়ে। গ্রামে ঢোকেনি সে। গ্রামের চারদিকের জঙ্গলে লুকিয়েছিল সে এবং তার গরিলাবাহিনী। কিন্তু প্রফেসর ওয়াইয়ের সহচরদের কেউ সম্ভবত ব্যাপারটা টের পেয়ে প্রফেসরকে জানায়। প্রফেসর জংলীদেরকে নির্দেশ দেয় গরিলাবাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য।

এর আগেই আবিদ একটা কাজ করে ফেলে। জঙ্গলে গরিলাদেরকে রেখে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করে জংলীদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করে সে যে বর্তমান রাজা আসল রাজা নয়, নকল রাজা। অধিকাংশ জংলী বিশ্বাস করে তার কথা। ফলে ওরা প্রফেসরের আদেশ পালন করতে রাজি হয় না।

জংলীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠছে দেখে প্রফেসর ওয়াই খেপে যায়। খেপে গিয়ে সে তার ভ্যানিশিং রে ব্যবহার করে পাঁচজন জংলীকে গায়েব করে দেয়। জংলীদেরকে নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে ভয় পাইয়ে দেবার উদ্দেশ্যে এই কাজ করে সে।

জংলীরা প্রফেসরের কাণ্ড দেখে আরও খেপে যায়। প্রফেসরকে তারা যাদুকর বলে ধরে নেয়। এবং একজোট হয়ে আক্রমণের জন্য এগিয়ে যায়।

প্রফেসর তখন একাই নেমে আসে তার বাসভবন থেকে। তার হাতে ছিল ভ্যানিশিং রে নিক্ষেপক যন্ত্র। সামনে যাকে পায় তাকেই হত্যা করে শয়তানটা। কিন্তু শহীদদেরকে এবং আবিদকে হত্যা করেনি সে। সব ধ্বংস করে দিয়ে যাবার সময় তাদেরকে নিয়ে গেছে। নিয়ে গেছে বোঝা বইবার কাজ করাবার জন্য। এক

একজনের মাথায় দুই থেকে চারমণ ওজনের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছে সবাইকে।

' 'আশা! বেঁচে থাকার ইচ্ছা নেই আমার আর!' হাহাকার করে উঠল রাজা অমেনটোট। 'কি নিয়ে, কাদেরকে নিয়ে বাঁচব? প্রজারা ছিল আমার নিজের সন্তানদের চেয়েও প্রিয়। তারা করুণভাবে মৃত্যুবরণ করেছে—আমি তাহলে কেন বাঁচি!'

রাজা অমেনটোট কথা শেষ করে অবিশ্বাস্য একটা কাণ্ড করে বসল। জংলী যুবক দাঁড়িয়েছিল তার মুখোমুখি। যুবকের হাতে ছিল একটা বর্শা। সেই বর্শা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে বিদ্যুৎবেগে নিজের বুকে বসিয়ে দিল রাজা অমেনটোট।

ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে বাধা দেবার সময়ও পেল না কুয়াশা।

পড়ে যাচ্ছে রাজা অমেনটোট।

কুয়াশা লাফ দিয়ে চলে এসেছে রাজার পাশে। এক হাত দিয়ে পতনোন্মুখ দেহটা ধরে ফেলল সে। অপর হাত দিয়ে বর্শাটা ধরে হেঁচকা টান মেরে বুকের ভেতর থেকে বের করে আনল ধারাল ইস্পাতের ব্লেডটা।

কলকল শব্দে ঝরনার পানির মত সবেগে রক্ত বেরিয়ে আসছে রাজা অমেনটোটের বুকের গর্ত থেকে।

নীল হয়ে গেছে রাজার মুখ। বর্শার আগায় বিষ মাখানো ছিল।

কুয়াশার চোখে চোখ রেখে একটু যেন হাসল রাজা। ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল একবার। কি যেন বলতে চাইছে সে।

বলা আর হলো না। রাজা অমেনটোটের প্রকাণ্ড শরীরটা একবার মাত্র কেঁপে উঠেই স্থির হয়ে গেল।

জংলী যুবক জবাই করা মুরগীর মত মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। তাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পেল না কুয়াশা।

ছয়

মহুয়ার চিবুক ধরে প্রফেসর ওয়াই ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগল। তার গলায় ফুটে উঠল মায়া-মমতা এবং সহানুভূতি, 'আহা! কী সুন্দর মুখ একটা! বাছার কী কষ্ট, দেখলে চোখ ফেটে পানি আসে! কি আর করবে বলো, সবই তোমার ভাগ্য!'

মহুয়ার দুচোখ দিয়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন। লোকটার স্পর্ধা দেখে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে তার। মাথার উপর দেড় মণ ওজনের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে শয়তানটা রসিকতা করছে।

প্রফেসর ওয়াই এরপর রাজকুমারী ওমেনার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'ম্যাটাবর!' অকস্মাৎ হাঁক ছাড়ল প্রফেসর। ম্যাটাবর ম্যাটচেক মন্টোগামারী সকলের পিছন থেকে ছুটে এল।

'তোমার আক্কেল হবে কবে শুনি! এই মেয়েটার স্বাস্থ্য দেখেছ? কুস্তিতে তোমাকে চিৎপটাং করে দিতে বড় জোর দেড় মিনিট লাগবে এর। এত কম বোঝা

কেন এর মাথায়? দাও, আরও মণখানেক চাপিয়ে দাও এক্ষুণি।'

'ইয়েস, স্যার।'

লাইন করে দাঁড় করিয়েছে প্রফেসর ওয়াই সবাইকে। সকলের মাথাতেই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বোঝা। প্রত্যেকের একটা হাত শরীরের সাথে বাঁধা নাইলনের শক্ত কর্ড দিয়ে। অপর হাতটি মুক্ত। মাথার বোঝা যাতে না পড়ে যায় সেজন্যে ওই মুক্ত হাতটা ব্যবহার করছে সবাই।

রাতের তাঁবু গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। রহস্যপুরীর দিকে যাত্রা শুরু হবে এবার। সকলকে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা করছে প্রফেসর ওয়াই। তার হাতে ভ্যানিশিং রে নিক্ষেপক যন্ত্র দেখা যাচ্ছে। তার সহকারীরা সংখ্যায় পনেরোজন। সবাই জংলীদের ছদ্মবেশ নিয়ে মিশে গিয়েছিল জংলীদের সাথে।

লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শহীদ, কামাল, মি. সিম্পসন, ডি. কস্টা, আবিদ, আবিদের বান্ধবী লিজা, ওমেনা এবং মহুয়া। লাইনের সামনে এবং পিছনে প্রফেসরের সহকারীরা পিস্তল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনের কাছে দুটো অটোমেটিক কারবাইনও দেখা যাচ্ছে।

গত রাতে ওদেরকে খেতে দিয়েছিল প্রফেসর ওয়াই শুধু নারকেলের শাঁস আর ডাবের পানি। আজ সকালে ভিজে কাঁচা ছোলা।

প্রফেসর ওমেনার সামনে থেকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল লিজার সামনে।

'বাহ! গরিলাবাহিনীর নেত্রী, হাউ ডু ইউ ডু? তোমার গরিলাবাহিনীর খবর কি? বুঝেছি, বুঝেছি, স্বর্গে গিয়ে লড়াই করছে তারা, তাই না! হাঃ হাঃ হাঃ···।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল প্রফেসর ওয়াই। হাসতে হাসতে এগিয়ে গেল সে। আবিদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'হ্যালো সিপাহসালার! প্রধান সেনাপতি, খবর কি?'

কথা নেই বার্তা নেই, প্রফেসর প্রচণ্ড একটা ঘুসি বসিয়ে দিল আবিদের নাকে।

ঝরঝর করে রক্ত বেরিয়ে এল আবিদের নাক দিয়ে। মাথায় আড়াইমণ ওজনের ভারি স্যুটকেসসহ মাটিতে ছিটকে পড়ল সে।

'স্ট্যাণ্ড আপ!'

ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল আবিদ।

'স্যুটকেসটা কে তুলবে মাথায়! তোমার তো কেউ চাকর নেই এখানে—তোলো বলছি!'

শার্টের আস্তিন দিয়ে নাকের রক্ত মুছে নুয়ে পড়ল আবিদ। অতি কষ্টে তুলে নিল সে স্যুটকেসটা মাথার ওপর। প্রফেসর ওয়াই এরপর ডি. কস্টার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

ডি. কস্টা বিনাবাক্যব্যয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।

গর্জে উঠল প্রফেসর ওয়াই, 'ড্রামা, ইজ ইট নট! শাস্তি এড়াবার কৌশল, না?'

কান্না থেমে গেল ডি. কস্টার। দ্রুত কথা বলে উঠল সে, 'ওহ্ নো, মি. ওয়াই! হামি রোডন করিটেছি হামার বস্ মি. কুয়াশার অকাল পরলোকগমনে!'

গম্ভীর হয়ে উঠল প্রফেসরের মুখের চেহারা, 'তোমার বস্ মরেননি এখনও।

আমার চোখে ধুলো দিয়ে বেঁচে আছেন তিনি এখনও। আমার হাতে মরতে তাঁকে হবেই।'

ডি. কস্টা চেঁচিয়ে উঠল, 'মি. কুয়াশা পরলোকগমন করেন নাই! ইটস্ এ গুড নিউজ, ফর গডস সেক! মি. ওয়াই, সাবধান! হামার বস্ না মরিয়া ঠাকিলে হাপনাকে সে মারিবার ব্যবস্টা অফকোর্স করিবে।'

'থু!' এক মুখ থু থু ছুঁড়ে দিল প্রফেসর ডি. কস্টার মুখে। এগিয়ে গেল সে সামনের দিকে।

ডি. কস্টা বলে উঠল বিস্মিত কণ্ঠে, 'কী আশ্চর্য! থুথুর স্বাড পেট্রলের মটো লাগিটেছে কেন! পেট্রল ডারা পরিচালিট নাকি…?'

মি. সিম্পসনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রফেসর ওয়াই। মি. সিম্পসনের চোখমুখ কঠোর, অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। প্রফেসর ওয়াইয়ের দিকে তাকাবার প্রবৃত্তি নেই তাঁর।

প্রফেসর ওয়াই মি. সিম্পসনের গালের লাল মাংসে চিমটি কাটল। তীব্র জ্বালায় মুখ বিকৃত হয়ে উঠল মি. সিম্পসনের।

'সরি! আমি মনে করেছিলাম পাথরের মূর্তি।'

কামালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল এবার প্রফেসর ওয়াই। কামাল সরাসরি চেয়ে আছে প্রফেসর ওয়াইয়ের দিকে।

'সাবাস! তেজ একটুও কমেনি দেখছি! চিনি, চিনি, খুদে হারকিউলিসদের ভাল করেই চিনি আমি। মরে না যাওয়া পর্যন্ত দমবে না তোমরা। চিন্তা কোরো না, মরার ব্যবস্থা করব আমি তোমাদের। রহস্যপুরীতে পৌঁছতে দাও, দেখবে মজাটা।'

সবশেষে শহীদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল প্রফেসর ওয়াই। শহীদ হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'কুয়াশা! এসে গেছে কুয়াশা!'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল প্রফেসর ওয়াই। হাতের ভ্যানিশিং রে নিক্ষেপ করার যন্ত্রটা উঁচু করে ধরে বনবন করে ঘুরতে শুরু করল সে, 'কোথায়! কোথায়! কোথায় মি. কুয়াশা!'

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল শহীদ।

প্রফেসর ওয়াই তাকাল ওর দিকে।

হাসি থামিয়ে শহীদ বলল, 'প্রফেসর ওয়াই, কুয়াশাকে আপনি যমের চেয়েও বেশি ভয় পান তা প্রমাণ হয়ে গেল। সাবধান প্রফেসর ওয়াই, কুয়াশা কিন্তু আশেপাশেই আছে। আমাদের দিকে আড়াল থেকে নজর রেখেছে সে। সময় এবং সুযোগ হলেই সে আক্রমণ করবে আপনাকে! ধ্বংস করে দেবে…।'

'ম্যাটাবর!' প্রফেসর গর্জে উঠল।

'ইয়েস, স্যার!'

'মি. টিকটিকির মাথায় আরও চাপাও এক মণ!'

'ইয়েস, স্যার!'

সাত

রাত। বনভূমি জেগে উঠেছে নানারকম পশুদের বিচিত্র হাঁক ডাকে। তাঁবুর আশেপাশে ঘুরঘুর করছে নেকড়ের দল। দূর থেকে ভেসে আসছে সিংহের গর্জন।

হাত পা বাঁধা অবস্থায় তাঁবুর ভেতর পড়ে আছে সবাই। ঘুম নেই কারও চোখে। তাঁবুর বাইরে ম্যাটাবর পাহারা দিচ্ছে ভ্যানিশিং রে নিক্ষেপক যন্ত্র নিয়ে। ভয়ঙ্কর অস্ত্রটা হাতে পেয়ে হত্যার নেশায় মেতে উঠেছে সে। কাছে পিঠে কোন পশুর সাড়া পেলেই যন্ত্রের ট্রিগার টেনে ধরছে সে।

পশুদের কাতর ধ্বনিতে কেঁপে উঠছে চারদিক।

আকাশ পাতাল ভাবছে শহীদ। সারাটা দিন আশা করেছে ও কুয়াশার কাছ থেকে সাহায্য পাবার। আসেনি সাহায্য। কুয়াশার ছায়াও দেখতে পায়নি ওরা কেউ। চিন্তার কথা। গতকাল সন্ধ্যায় জংলীদের গ্রামে ফেরার কথা কুয়াশার। গ্রামে ফিরে জংলী আর গরিলাদের লাশ দেখে সবই অনুমান করে নেবে সে। স্বভাবতই ওদেরকে সাহায্য করার জন্য গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে সে।

প্রফেসর ওয়াই অবশ্য একটা চালাকি খাটিয়েছে গ্রাম ছাড়ার সময়। গ্রাম থেকে রহস্যপুরী উত্তর দিকে! কিন্তু গ্রাম ছেড়ে দক্ষিণ দিকে রওনা হলো সে। উদ্দেশ্যটা অর্থপূর্ণ। কুয়াশা গ্রামে ফিরে নিশ্চয়ই জানতে চাইবে প্রফেসর কোন্ দিকে গেছে। জংলী যদি কেউ বেঁচে থাকে সে জবাব দেবে, দক্ষিণে গেছে। স্বভাবতই কুয়াশা প্রফেসরের হাত থেকে ওদেরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ দিকে ছুটবে। কিন্তু দক্ষিণ দিকে গেলে সে পাবে না ওদেরকে!

গ্রাম থেকে বেরিয়ে প্রফেসর ওদেরকে নিয়ে দক্ষিণ দিকে রওনা হলেও খানিক পর সে দিক পরিবর্তন করে। আসলে রহস্যপুরীর দিকে অর্থাৎ উত্তর দিকেই এগোচ্ছে ওরা।

শহীদ ভাবছে, কুয়াশা কি প্রফেসরের চালাকিটা ধরতে পারেনি? সে কি দক্ষিণ দিকেই রওনা হয়েছে তাদের সন্ধানে?

'ঘুমালে নাকি, শহীদ? রাত কত হলো অনুমান করতে পারো?' ফিসফিস করে প্রশ্ন করেন মি. সিম্পসন।

'না। ঘুম কি আসে। রাত সাড়ে তিনটে-চারটের কম নয় এখন।'

'অনেকক্ষণ থেকে প্রফেসর ওয়াইয়ের সাড়া পাচ্ছি না। গেল কোথায় বলো তো? ম্যাটাবর ছাড়া আর সকলেরও কোন পাত্তা নেই।'

শহীদ বলল, 'কথাটা আমিও ভাবছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েনি তো?'

মি. সিম্পসন বললেন, 'মনে হয় না। লোকটা নিশাচর। রাতের বেলা ঘুমোয় না। অন্যান্য সবাই তো আর ঘুমিয়ে পড়তে পারে না। আমাদেরকে ভয় করে যখন।'

মহুয়া বলে উঠল, 'শহীদ।'

শহীদ পাশ থেকে বলে উঠল, 'কি হলো?'

ভয়ে কাঁপছে মহুয়ার গলা, 'কে যেন আমার হাতে হাত দিয়ে…।'

'চুপ! কেউ নয়, আমি। তোমার হাতের বাঁধন খুলছি!'

চাপা কণ্ঠে মি. সিম্পসন বলে উঠলেন, 'কী বললে!'

'চুপ করুন! বাইরে ম্যাটাবর দাঁড়িয়ে আছে। শব্দ পেলেই আলো নিয়ে ঢুকবে।'

শহীদের কথা শেষ হতেই তাঁবুর ভেতর ঢুকল ম্যাটাবর। তার হাতে জ্বলন্ত একটা মশাল, 'হচ্ছেটা কি? প্রফেসর চলে যেতেই পাখা গজিয়েছে বুঝি?'

শহীদ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছিল সময় মত। ওর হাত দুটো শরীরের নিচে লুকানো। ধড়াস ধড়াস করছে বুক। এর আগে দুবার তাঁবুতে ঢুকে সকলের হাত পায়ের বাঁধন পরীক্ষা করে দেখে গেছে ম্যাটাবর। এবারও যদি দেখতে শুরু করে···।

'মি. টিকটিকি, তুমি অমন কুণ্ডলী পাকিয়ে ছোট হয়ে শুয়ে আছ কেন? মতলব খানা কি তোমার!'

কারও মুখে কোন কথা নেই। দম বন্ধ করে নিঃসাড় পড়ে আছে শহীদ। মহুয়াও নিঃশ্বাস ফেলছে না। মি. সিম্পসন ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন। উত্তেজনা সহ্য করতে পারছেন না তিনি।

কামাল দ্রুত চিন্তা করছিল ম্যাটাবরের মনোযোগ অন্য দিকে কিভাবে সরিয়ে দেয়া যায়। কথা বলে উঠল সে, 'প্রফেসর ওয়াই এই রাতে জঙ্গলে বেরিয়েছে? নির্ঘাৎ বাঘের পেটে যাবে সে।'

'পাগল! প্রফেসর ওয়াই ইতিমধ্যে ঢাকায় পৌঁছে গেছেন।'

'অ্যাঁ! কি বললে!'

ম্যাটাবর বলে উঠল, 'ঠিকই বলছি। ম্যাটার ট্র্যান্সমিট করার মেশিন ব্যবহার করেছেন তিনি।'

'জঙ্গলের ভেতরও ম্যাটার ট্র্যান্সমিট করার মেশিন আছে নাকি?'

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল ম্যাটাবর, 'তাও জানো না! শুনে রাখো তাহলে, ট্র্যান্সমিট করার স্টেশন একটা নয়, একাধিক আছে এই আফ্রিকায়।'

'আশ্চর্য!'

বাইরে ডেকে উঠল নেকড়ের পাল।

'যাচ্ছি আমি! কেউ কথা বলবে না, সাবধান! কোন রকম চালাকি করতে দেখলে খুন করতে বলে গেছেন প্রফেসর ওয়াই। তাঁর আদেশ সানন্দে পালন করব আমি। কথাটা মনে থাকে যেন।'

তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে গেল ম্যাটাবর।

তাঁবুর ভেতর ওরা সবাই চুপচাপ। কারও মুখে কোন কথা নেই। নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে শহীদ। কামালও বন্ধন মুক্ত হয়ে কাজ শুরু করল। মি. সিম্পসনকে বন্ধন মুক্ত করল সে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবাই বন্ধন মুক্ত হলো।

'এখন নয়! আরও পরে। ভোরের আলো না ফুটলে তাঁবু ছেড়ে বেরুনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

ফিসফিস করে বলল শহীদ সকলের উদ্দেশ্যে।

কামাল বলে উঠল শহীদের কানে মুখ ঠেকিয়ে, 'কিন্তু ভোর হবার আগেই যদি প্রফেসর ওয়াই এসে পড়ে?'

'আসবে বলে মনে হয় না। যদি এসেই পড়ে…।'

শেষ হলো না শহীদের কথা, বাইরে থেকে ভেসে এল ম্যাটাবর ম্যাটচেকের তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার।

পরমুহূর্তে একটা ধস্তাধস্তির শব্দ পেল ওরা। আক্রোশে গর্জে উঠল একটা বাঘ তাঁবুর দরজার কাছ থেকে।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল শহীদ অন্ধকারেই। বাঘটার ছুটে পালাবার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে পায়ের শব্দ। সেই সাথেই দূরে সরে যাচ্ছে ম্যাটাবরের তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার।

দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা। মিনিট দু'য়েকের মধ্যেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল আবার চারদিক। ম্যাটাবরের গলা আর শোনা যাচ্ছে না। দূর থেকে কেবল ভেসে আসছে একটা হায়েনার কর্কশ হাসির শব্দ। এবং আরও দূর থেকে ভেসে আসছে, শোনা যায় কি যায় না, একটা সিংহের গর্জন।

ঝিঁঝি পোকার ডাক চারদিক মাতিয়ে রেখেছে।

শহীদ নীরবতা ভাঙল, 'প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নেয়া যাক এবার।'

ডি. কস্টা হঠাৎ সশব্দে দম ছেড়ে বলে উঠল, 'ফর গডস সেক, কঠা বলিটে না পারিয়া হামার পেট ফুলিয়া ডবল সাইজ হইয়াছে!'

কামাল বলল, 'শহীদ, ভ্যানিশিং-রের যন্ত্রটা চাই আমাদের।'

'কিন্তু সেটা পাবি কোথায়! বাঘটা ম্যাটাবরকেই নিয়ে চলে গেছে…।'

'পড়ে থাকতেও তো পারে আশপাশে।'

'খুঁজে দেখা যাবেখন যাবার সময়।'

ভোরের আলো ফুটতে কাঁধে ব্যাগ-ঝোলা ঝুলিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল ওরা।

অনেক খুঁজেও আশপাশে কিন্তু যন্ত্রটা পাওয়া গেল না।

আট

রাগে সর্বশরীর জ্বালা করছে। কার উপর রাগ তা জানে না সে। প্রফেসর ওয়াই বোকা বানিয়েছে তাকে। গ্রামের যুবকটিকে জিজ্ঞেস করাই ভুল হয়েছিল। যুবকটি অবশ্য সঠিক উত্তরই দিয়েছিল।

দক্ষিণ দিকে অন্ধের মত ছুটেছিল কুয়াশা গ্রাম থেকে বেরিয়ে। প্রফেসর ওয়াইকে বন্দী এবং দলবল নিয়ে ওদিকেই যেতে দেখা গেছে। প্রফেসর যে চালাকি করে গেছে তা সে বুঝতেই পারেনি।

বুঝতে যখন পারল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। দিক পরিবর্তন করে আবার উত্তর দিকে হাঁটতে হয়েছে তাকে। পথে অনেকবার অনেক জায়গায় থামতে হয়েছে তাকে। শহীদদের সন্ধানে গাছের মগডালে চড়ে দেখে নিয়েছে চারদিক।

কিন্তু প্রফেসর বা তার বন্দীদের কোন চিহ্নই দেখতে পায়নি সে কোথাও।

অনেক ভেবে চিন্তে কুয়াশা সিদ্ধান্ত নেয়, সরাসরি রহস্যপুরীর দিকেই যাবে সে। প্রফেসর হয়তো রহস্যপুরীতে পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যে। অকারণে দেরি করার চীজ সে নয়। শহীদরা যদি প্রফেসরের হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে থাকে ভাল। পালাতে যদি না পেরে থাকে তাহলে বিপদের কথা।

রহস্যপুরীতে পৌঁছে প্রফেসর ওদেরকে নিঃসন্দেহে হত্যা করবে।

সাত পাঁচ ভেবে সরাসরি রহস্যপুরীতে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় কুয়াশা।

মাথার উপর জ্বলন্ত সূর্য, ঠিক দুপুর বেলা গভীর বনভূমি থেকে ফাঁকা জায়গায় পৌঁছুল কুয়াশা।

সামনে প্রকাণ্ড তেপান্তরের মত মাঠ। মাঠের সর্বশেষ প্রান্তে আফ্রিকার আশ্চর্যতম নিষিদ্ধ দর্শনীয় বস্তু।

পাথরের পাহাড়ের মত পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তিনটে মূর্তি। আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে মূর্তি তিনটের মাথা। তিন মূর্তির দুই পাশে লাইন দিয়ে গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আরও অসংখ্য মূর্তি। ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে মূর্তিগুলো। তবে কোন মূর্তির উচ্চতাই সাত ফুটের কম নয়।

এই হলো রহস্যপুরী। রহস্যপুরী যে সত্যি রহস্যপুরী তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

মূর্তিগুলো প্রকৃতপক্ষে রহস্যপুরীর পাঁচিলের কাজ করছে। মাঝখানের তিনটে মূর্তির মধ্যবর্তী জায়গাটা সম্ভবত প্রবেশ পথ। বন্ধ সেটা।

খাঁ-খাঁ করছে নির্জন মাঠ। রহস্যপুরীর আশপাশেও জনমনিষ্যির চিহ্নমাত্র নেই। ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিল কুয়াশা। দেরি করার কোন মানে হয় না। জঙ্গল থেকে মাঠে পা রাখল সে। এগিয়ে চলল রহস্যপুরীর দিকে।

কিংবদন্তীর রহস্যপুরী মিথ্যে নয়। শত শত বছর ধরে সভ্য দুনিয়ার মানুষ শুনেছে এই রহস্যপুরী সম্পর্কে হাজার রকম গল্প। কেউ এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করত, কেউ করত না। যে বিশ্বাস করত সে-ও অনুমানের উপর ভরসা করে বিশ্বাস করত। রহস্যপুরী নিজের চোখে দেখেছে এই দাবি আবিদ ছাড়া আর কেউ কোন দিন করেনি।

অসংখ্য জংলী উপজাতি এই রহস্যপুরীতে দশ বছর অন্তর অন্তর একবার করে আসে। সাথে করে তারা নিয়ে আসে দশ বছর ধরে সঞ্চিত এবং সংগৃহীত স্বর্ণ, মূল্যবান পাথর। রহস্যপুরীর দেবতাদের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকার ধনসম্পদ রেখে যায় তারা। ধরে নিয়ে আসে সভ্য দুনিয়ার বন্দীদেরকে। রহস্যপুরীতে বন্দীদেরকে বলি দেয় তারা। বলি না পেলে নাকি দেবতারা অসন্তুষ্ট হন। শুধু মানুষ না জংলীরা এখানে বলি দেয় বাঘ, সিংহ, নেকড়ে ও অন্যান্য পশুদেরকেও।

শত শত বছর ধরে চলেছে এই নিয়ম।

কিন্তু শিক্ষিত, যুক্তিবাদী মন মেনে নিতে চায় না রহস্যপুরী সম্পর্কে অনেক বিষয়। দেবতারা কি সত্যিই বসবাস করে রহস্যপুরীতে। বিশ্বাস করা কঠিন। দেবতারা তো স্বর্গের বাসিন্দা, তারা পৃথিবীতে বসবাস করবে কেন?

কুয়াশার ধারণা, শত শত বছর আগে এই এলাকায় কোন উন্নত জাতির অভ্যুদয় ঘটেছিল। তারা ছিল সভ্য একটা জাতি। এই রহস্যপুরী তাদেরই সৃষ্টি। সেই সভ্য জাতির রাজা বা বাদশা হয়তো এই রহস্যপুরীতে বাস করতেন। সময়ের অমোঘ বিধানে আজ সেই রাজা বা বাদশাও নেই, নেই সেই উন্নত জাতিরও কোন অস্তিত্ব। কিন্তু আজও মাথা উঁচু করে আছে রহস্যপুরী। জংলী অসভ্যরা এই রহস্যপুরী আবিষ্কার করে কয়েক হাজার বছর আগে। তারা ধরে নেয় রহস্যপুরী দেবতাদের সৃষ্টি, দেবতারা এখানে বাস করে।

তারপর থেকেই সম্ভবত নরবলি এবং ধন-সম্পদ উপঢৌকন দিয়ে দেবতাদেরকে সন্তুষ্ট করার নিয়ম চালু হয়। আবার এমনও হতে পারে—সভ্য দুনিয়ার কোন শিকারী বা অভিযাত্রীদল আফ্রিকার এই এলাকায় কয়েক শত বছর আগে এসে দেখতে পেয়েছিল রহস্যপুরীকে।

রহস্যপুরী দেখে তারা স্বভাবতই মুগ্ধ হয়। ভিতরে প্রবেশ করে মানুষজন না দেখে তারা এখানে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা হয়তো শ্বেতাঙ্গ। জংলীরা তাদেরকে দেখে দেবতা বলে মনে করে।

হতে পারে আরও অনেক কিছু। কিন্তু জংলীদের ধারণাগুলো বাস্তব বা সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না।

মধ্যবর্তী তিন মূর্তির পাদদেশে এসে দাঁড়াল কুয়াশা। সত্যি, বড় বিস্ময়কর সৃষ্টি। হাজার হাজার বছর আগে কারা নির্মাণ করেছিল এই মূর্তিগুলো ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

তিন মূর্তির মাঝখানে দুটো প্রকাণ্ড প্রবেশ পথ। চমকে এক পা পিছিয়ে এল কুয়াশা। যান্ত্রিক শব্দ হচ্ছে একটা।

খুলে যাচ্ছে একটা প্রবেশ পথ। প্রকাণ্ড কাঠের কপাট দুটো দু'ফাঁক হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

চিন্তার রেখা ফুটল কুয়াশার কপালে। নিশ্চয়ই কেউ বা কোন একদল মানুষ তার উপর নজর রেখেছে। প্রবেশ পথ হঠাৎ আপনা আপনি উন্মুক্ত হতে পারে না। কেউ চাইছে সে রহস্যপুরীর ভিতরে প্রবেশ করুক। প্রবেশ পথ খুলে যাবার পিছনে নিশ্চয়ই কারও হাত আছে।

একমুহূর্ত চিন্তা করল কুয়াশা। প্রবেশ করবে, না, করবে না?

পা বাড়াল কুয়াশা। বিপদ ঘটবে, টের পাচ্ছে সে। রহস্যপুরীর ভিতর প্রতি পদে বিপদ ওৎ পেতে আছে। মন বলছে কথাটা। মনের কথা কখনও মিথ্যে হয় না। কিন্তু বিপদের ভয়ে পিছিয়ে যাবার মত মানুষও তো সে নয়।

প্রকাণ্ড গেট অতিক্রম করে রহস্যপুরীর বিশাল পাকা উঠানে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। শব্দ শুনে সবেগে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে।

গেটটা ধীরে ধীরে খুলে গিয়েছিল। কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাতেই কুয়াশা দেখল সেটা ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে নয়, এক নিমেষে বন্ধ হয়ে গেছে সেটা।

রহস্যপুরীর ভিতর আটকা পড়ে গেছে সে, বুঝতে কোন অসুবিধে হলো না

কুয়াশার।

নয়

উঠানটা মস্ত বড়। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত উঁচু প্রাচীর ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

প্রাচীরের গায়ে অনেকগুলো লোহার দরজা। দীর্ঘ পদক্ষেপে সেদিকে এগোল কুয়াশা। দুটো হাতই তার শূন্য। লেসারগানটা পকেটেই ভরে রেখেছে।

কুয়াশা উঠানের মাঝখান বরাবর পৌঁছুতেই প্রাচীরের গায়ের অনেকগুলো দরজার মধ্যে থেকে একটি দরজা খুলে গেল।

মুচকি হাসল কুয়াশা। প্রতি মুহূর্তে নজর রাখা হচ্ছে তার উপর। অদৃশ্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা যে পথে তাকে যেতে দিতে চায় সেই পথের দরজা খুলে দিচ্ছে আগে ভাগে। কুয়াশা যাতে অন্য কোন দরজা ভেঙে অন্য কোন পথে না যেতে চায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

ঠিক আছে, দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছানো যায়।

উন্মুক্ত দরজা অতিক্রম করে প্রশস্ত একটা করিডরে পা রাখল কুয়াশা। মেঝে, সিলিং এবং দেয়ালগুলো মসৃণ পাথরের। ঝক ঝক তক তক করছে চারদিক। যেন এই মাত্র কেউ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রেখে গেছে।

করিডরের সিলিংয়ের উপর টিউব লাইট জ্বলছে। দিনের মত উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত সামনেটা। করিডরের দুই পাশে সেগুনকাঠের নতুন পালিশ করা দরজা। কয়েকটা দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে দেখল কুয়াশা।

সবগুলো দরজাই ভিতর থেকে বন্ধ। কেউ সাড়া দিল না ভিতর থেকে, কোন দরজা খুলেও গেল না।

হঠাৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ছে কুয়াশা। কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। কোথাও কোন শব্দ নেই। নেই কোন জনমনিষ্যির সাড়া-শব্দ।

সশব্দে খুলে গেল আচমকা ডান দিকের একটা দরজা। কে খুলল? ভিতরে কেউ আছে নাকি, খোলা দরজা টপকে ভিতরে ঢুকল কুয়াশা। কেউ নেই। কোন মানুষের ছায়া কায়া কিছুই নেই।

দরজাটা পরীক্ষা করল কুয়াশা। স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিচালিত দরজা। নিশ্চয় সবগুলোই তাই।

সরু একটা প্যাসেজে চলে এসেছে কুয়াশা। প্যাসেজের একপাশে মসৃণ পাথরের দেয়াল, আর এক পাশে দুই হাত অন্তর অন্তর একটা করে কাঠের দরজা।

প্যাসেজের শেষ মাথায় একটা সিঁড়ি। নেমে গেছে নিচের দিকে। পাথরের ধাপগুলো টপকাতে টপকাতে গুনতে শুরু করল কুয়াশা। একশো, একশো এক, একশো দুই…।

একশো আটাশটা ধাপ। সিঁড়ি থেকে নামল কুয়াশা একটা হলরুমের ভিতর।

রুমের ভিতরের দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। নিজের চোখ দুটোকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। এত আধুনিক মারণাস্ত্র কোত্থেকে এল

এখানে! হেভী মেশিনগান, স্টেনগান, দেড় ইঞ্চি মর্টার, অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান, গ্রেনেডের বাক্স, রাইফেল, বাজুকা, পিস্তল—সর্বনাশ। এসব এখানে কেন? কারা আনিয়েছে এগুলো?

প্রফেসর ওয়াই?

সশব্দে খুলে গেল হলরুমের একটা দরজা। সেদিকে পা বাড়াল কুয়াশা। চেহারাটা থমথমে হয়ে উঠেছে। কপালে দুশ্চিন্তার রেখা।

খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল কুয়াশা, বিস্ময়ে মাত্রা ক্রমেই বাড়ছে তার। দরজার ওপারে এবার প্যাসেজ বা করিডর নয়, একটা এলিভেটর।

এলিভেটরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল আপনা আপনি। উপর দিকে সবেগে উঠে যাচ্ছে যান্ত্রিক কেবিনটা।

অস্ত্রগুলোর কথা ভাবছিল কুয়াশা। অস্ত্রগুলো তাকে দেখাবার জন্য নিচে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অস্ত্রগুলো দেখাবার কারণ কি? ভয় দেখানো?

এলিভেটর থামতে দরজা খুলে গেল। নেমেই আরেক বিস্ময়ের মুখোমুখি হতে হলো কুয়াশাকে।

সামনেই মস্ত একটা ফাঁকা জায়গা। অস্বাভাবিক লম্বা ধাপ বিশিষ্ট একটা সিঁড়ি উঠে গেছে উপর দিকে।

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উপরে উঠল কুয়াশা। প্রকাণ্ড একটা লাউঞ্জের মত উপরের জায়গাটা। লাউঞ্জের মাঝখানে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা প্রকাণ্ড কূয়া। কূয়া বললে জিনিসটার বিরাটত্ব ঠিক বোঝানো যাবে না। এটা এমন একটা কূয়া যে এর গোলাকার পাঁচিলে বসে অন্তত দুশো লোক বালতি ফেলে পানি তুলতে পারবে।

পাঁচিলটা প্রায় দুই মানুষ সমান উঁচু। কূয়ার আরও অনেক উপরে সিলিংয়ের সাথে গায়ে প্রায় গা ঠেকিয়ে ঝুলছে একটা মস্ত ইস্পাতের ঢাকনি। লোহার ভারি শিকল দিয়ে বাঁধা ঢাকনিটা। সিলিংয়ের কাছাকাছি লোহার চেনের সাথে বাঁধা অবস্থায় ঝুলতে দেখল কুয়াশা কয়েকটা লোহার মইকে।

কূপের ওদিকে সবচেয়ে বিস্ময়কর দ্রষ্টব্য বস্তু বসে আছে। ব্রোঞ্জের প্রকাণ্ড একটা মূর্তি হাঁটু মুড়ে বসে আছে। মূর্তিটার মাথা সিলিং ছুঁই ছুঁই করছে। মূর্তিটার এক একটা আঙুল কুয়াশার এক একটা বাহুর সমান। মূর্তিটার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল কুয়াশা।

মুগ্ধ হয়ে গেল সে। অপূর্ব সৃষ্টি। মূর্তি বলে মনেই হয় না। চোখ দুটোর মণি নীল। নীলকান্ত মণি হওয়াও বিচিত্র নয়। উন্নত নাসা। প্রশস্ত কপাল। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল। মুখটা ভয়ঙ্কর সজীব। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কুয়াশার মনে হলো, এই বুঝি মাথা নেড়ে কথা বলে উঠবে, বা হাসিটা আরও বিস্তৃত হয়ে উঠবে মূর্তিটার।

শব্দ হলো পিছন দিকে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কুয়াশা। একটা দরজা। এই মাত্র খুলে গেছে সেটা।

একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগল আবার। প্যাসেজ থেকে করিডর,

করিডর থেকে প্যাসেজ। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ল কুয়াশা। একটার পর একটা দরজা সশব্দে খুলে যাচ্ছে। ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ভিতরে ঢুকতে হচ্ছে তাকে। না ঢুকে করবেটা কি সে?

ফাঁদ নয়তো এটা? এভাবেই যদি চলতে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন…।

ওই যে, আবার শব্দ হলো। আবার খুলে গেল একটা দরজা। এই শেষ, মনে মনে ভাবল কুয়াশা। এরপর যত দরজাই খুলুক, ঢুকবে না সে। অন্যান্য দরজা দিয়ে নিজের খুশিমত ঘুরে বেড়াতে চায় সে। দরজা যদি বন্ধ থাকে তাহলে লেসারগান ব্যবহার করবে।

খোলা দরজাটা দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই বন্ধ হয়ে গেল সেটা।

প্রকাণ্ড একটা গোলাকার কামরায় পা রেখেছে কুয়াশা। চোখ ঝলসে গেল তার স্বর্ণের স্তূপ দেখে।

রহস্যপুরীর স্বর্ণ ভাণ্ডারে প্রবেশ করেছে সে। উপর দিকে তাকাল কুয়াশা। চারদিকের দেয়াল পাথরের নয়, ইস্পাত দিয়ে মোড়া। সিলিং নেই। উপরটা ফাঁকা। তবে আরও উপরে দেখা যাচ্ছে সেই ঝুলন্ত মস্ত ঢাকনাটাকে।

ব্রোঞ্জ মূর্তির পাদদেশে খানিক আগে যে প্রকাণ্ড কূয়াটা দেখেছিল সে, এই জায়গা সেই কূয়ারই তলদেশ। চারদিকে অনেকগুলো দরজা দেখা যাচ্ছে। সবক'টাই বন্ধ।

স্বর্ণের স্তূপের আড়াল থেকে আচমকা দশ বারো জন লোক উঠে দাঁড়াল। প্রত্যেকের হাতে পিস্তল বা রিভলভার।

প্রফেসর ওয়াইয়ের হাতটা শূন্য। হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল সে।

বলে উঠল, 'মি. কুয়াশা! কেমন আছেন? আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যেই এখনও অপেক্ষা করছি আমি এখানে!'

দশ

প্রফেসরের সহচররা ঘিরে ফেলেছে কুয়াশাকে। তাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল সে, অবস্থা সুবিধের নয়। প্রত্যেকের চোখে খুনের নেশা। তার জন্যই অপেক্ষা করছিল এরা, তাকে হত্যা করারই ষড়যন্ত্র করেছে।

'মি. কুয়াশা, হাত দুটো মাথার উপর তুলুন!'

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুয়াশা। মাথার উপর হাত তোলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তার মধ্যে। প্রফেসরের দশাসই চেহারার সহকারীরা এগিয়ে এসে কুয়াশার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। হাতের রিভলবার এবং পিস্তলের নলগুলো কুয়াশার বুকে, পিঠে, পাঁজরে ঠেকিয়ে রেখেছে তারা।

কুয়াশা গম্ভীর। তার চোখমুখের চেহারা দেখে মনে হয় না এতটুকু ভয় পেয়েছে সে। ভারি গলায় কথা বলে উঠল সে।

'রহস্যপুরীতে ঢুকেছ তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু বেরিয়ে যেতে পারবে তো, ওয়াই?'

শূন্যে লাফিয়ে উঠে গগনবিদারী অট্টহাসিতে গোলাকার জায়গাটাকে কাঁপিয়ে তুলল প্রফেসর ওয়াই। অনেকক্ষণ পর হাসি থামল তার। বলল, 'মি. কুয়াশা এখনও আপনি প্রফেসর ওয়াইকে চিনতে পারেননি? প্রকৃতপক্ষে আমাকে চিনবার, আমার ক্ষমতা, প্রতিভা, যোগ্যতা—এই সব গুণের মূল্যায়ন করার চেষ্টা আপনি কোনদিনই করেননি। আমি যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রেন, আমি যে সারা বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানী একথা আপনি আজও স্বীকার করলেন না। ভুল করেছেন, মি. কুয়াশা। আমার পর আপনাকেই সেরা বিজ্ঞানী বলে মনে করতাম। মনে করতাম বুদ্ধিমানদের মধ্যে আমার পরেই আপনার স্থান। তাই আপনাকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, একবার নয় অসংখ্যবার, আমার সাথে একযোগে বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য কাজ করতে। কিন্তু আপনি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন।'

কুয়াশা বলে উঠল, 'তোমার ব্রেন আছে স্বীকার করি। কিন্তু তুমি মিস গাইডেড। তোমার মধ্যে দয়ামায়া, মমতা, সহানুভূতি, মানবতা—এতটুকুও নেই। তুমি নীতিহীন। তোমাকে আমি ঘৃণা করি, ওয়াই। শুধু তাই নয়, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, তোমাকে আমি সমূলে ধ্বংস করে দেব।'

প্রফেসরের দুচোখে কৌতুক ফুটে উঠল, 'আমাকে? ধ্বংস করে দেবেন? আপনি? হাঃ হাঃ হাঃ হা!'

'থামো!' গর্জে উঠল এতক্ষণে কুয়াশা।

প্রফেসরের অট্টহাসি থেমে গেল।

বজ্রকণ্ঠে কুয়াশা বলে উঠল, 'বারবার তোমাকে আমি নানা কারণে এর আগে ক্ষমা করেছি, ওয়াই। প্রত্যেকবার ভেবেছি, এরপর হয়তো তোমার পরিবর্তন ঘটবে। কিন্তু মিথ্যে আশা। তুমি দিনে দিনে নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছ। নির্মম ভাবে অকারণে হত্যা করছ নিরীহ মানুষকে।'

'করছি! আরও করব! কারও যদি ক্ষমতা থাকে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুক। দেখব! কার কত বুকের পাটা।'

প্রফেসর খেপে উঠছে আস্তে আস্তে। চোখ দুটো দিয়ে আগুনের শিখা বেরিয়ে আসছে যেন। দ্রুত, উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলে চলেছে সে।

'কার কি ক্ষতি করেছি আমি? আমি একজন বিজ্ঞানী, আমার কি নিজের খুশি মত যে কোন বিষয়ের ওপর রিসার্চ করার অধিকার নেই? রিসার্চ করতে গেলে, বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য কাজ করতে গেলে দু'একজন লোককে প্রাণ হারাতে হয়। সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তির স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়। যা বলছিলাম, আমাকে কেউ নিশ্চিন্ত মনে কাজ করতে দিতে চায় না। উপায় কি আমার বেপরোয়া না হয়ে? কোটি কোটি টাকার দরকার আমার। চাইলে পাব কারও কাছ থেকে? দেবে কেউ? দেবে তো না-ই, আবার ডাকাতি করে লুঠ করে টাকা সংগ্রহের চেষ্টা করলে বাধা দিতেও আসবে। এটা বুঝি ন্যায়? এটা বুঝি সঙ্গত?'

কুয়াশা হেসে উঠল। বলল, 'প্রফেসর, তোমার মাথায় কোন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। মাথায় ভাল করে নিয়মিত তেল টেল ঢাল তো?'

'ঠাট্টা করছেন? হাঃ হাঃ হাঃ! প্রফেসর ওয়াইয়ের সাথে ঠাট্টা করার স্পর্ধা অবশ্য শুধু আপনারই আছে, স্বীকার করতে আমি বাধ্য। তবে, সেই স্পর্ধারও সমাপ্তি ঘটবে, মি. কুয়াশা। আপনার সাথে সাথে মৃত্যু ঘটবে ওই স্পর্ধার। এই সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে পারি না, বুঝতেই পারছেন। আপনি সত্যি ভয়ঙ্কর প্রতিভাবান বিজ্ঞানী। নিজের হাতে হত্যা করতে চাইনি আমি। কাক কাকের মাংস খায় না। নিজের হাতে হত্যা করতে চাইনি বলেই আপনাকে ডিজইন্টিগ্রেট করে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম সীমাহীন মহাশূন্যে। মাই গড! ওহ্ জেসাস! আপনি মহাশূন্য থেকেও বহাল তবিয়তে ফিরে এসেছেন! ভেবেছিলাম এই পৃথিবীতে আর কোনদিন ফেরা সম্ভব হবে না আপনার পক্ষে। ভুল করেছিলাম। যাক, একই ভুল দ্বিতীয়বার করতে চাই না আমি। কাক কাকের মাংসও খায় প্রয়োজনে, তা এখন প্রমাণ হবে। মি. কুয়াশা, আপনাকে এই স্বর্ণস্তূপের পাশে হত্যা করতে যাচ্ছি আমি। সত্যি, মি. কুয়াশা, আমি দুঃখিত। আশা করি আপনি আমার সমস্যাটা হৃদয়ঙ্গম করবেন। এ ছাড়া আমার সামনে দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই, বিশ্বাস করুন।'

পাশে দাঁড়ানো একজন সহচরের হাত থেকে একটা পিস্তল ছোঁ মেরে কেড়ে নিল প্রফেসর ওয়াই।

'আমাকে হত্যা করবে? ভাল কথা, করো। কিন্তু আমাকে হত্যা করলেই তো শুধু হবে না, ধনসম্পদ নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়ার ব্যবস্থা করে রেখেছ তো? কেউ যদি বাধা দেয়?'

'বাধা দেবে? কে? কার এত সাহস আমাকে বাধা দেবে?' সদম্ভে জানতে চাইল প্রফেসর ওয়াই।

কুয়াশা হাসল। বলল, 'যে বা যারা তোমাকে এই রহস্যপুরীতে ঢুকতে দিয়েছে সে বা তারাই বাধা দেবে ওয়াই। এই সহজ কথাটা ঢোকেনি তোমার মাথায়? তুমি না বিজ্ঞানী? নিজেকে না সেরা বিজ্ঞানী বলে দাবি করো? বলো তো, রহস্যপুরীর দরজাগুলো একটার পর একটা কে খুলে দিয়েছে তোমাকে?'

'কে খুলে দিয়েছে?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল প্রফেসর। বিমূঢ় দেখাচ্ছে তাকে।

কুয়াশা বলল, 'প্রশ্ন আমি করেছি। উত্তর তুমি দেবে।'

'কে খুলেছে দরজা তা তো আমি জানি না।'

সশব্দে হেসে উঠল কুয়াশা, 'বাহ! চমৎকার! কিন্তু উত্তরটা গণ্ডমূর্খের মত হয়ে গেল না, ওয়াই! শোনো তবে, আসল ব্যাপারটা কি। এই রহস্যপুরীতে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী একটা দল আছে।'

'দল আছে? কই, কোথায়? কি করছে তারা?'

কুয়াশা বলল, 'অস্থির হয়ো না। সব কথা শোনো আগে! যেখানেই তারা থাকুক, সহজে আমরা তাদের অবস্থান জানতে পারব না। তবে এই রহস্যপুরীর ভিতরেই যে তারা আছে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না ঠিক, কিন্তু তারা সর্বক্ষণ, এমনকি এই মুহূর্তেও আমাদের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। হয়তো, আমাদের কথাও শুনতে পাচ্ছে তারা।'

প্রফেসর উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। বলল, 'আপনি বলতে চাইছেন টিভি ক্যামেরার সাহায্যে লোকগুলো আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে!'

'হ্যাঁ। এতক্ষণে বুঝেছ। তারা টিভিতে দেখতে পাচ্ছে আমাদেরকে। স্বয়ংক্রিয় দরজাগুলো বিদ্যুতের সাহায্যে পরিচালিত, লক্ষ করেছ নিশ্চয়! টিভিতে আমাদের অবস্থান দেখে নিয়ে নির্দিষ্ট একটার পর একটা বোতাম টিপে একটার পর একটা দরজা মেলে দিয়েছে আমাদের সামনে। তার কারণ কি, ওয়াই? বলতে পারো?'

'তার কারণ? কি হতে পারে তার কারণ?' প্রফেসর চিন্তা করার চেষ্টা করছে কারণটা।

কুয়াশা বলল, 'তার কারণ লোকগুলো চাইছিল আমরা এই স্বর্ণ ভাণ্ডারে প্রবেশ করি।'

'তা চাইবার কারণ?'

'কারণটাও বলে দিতে হবে? স্বভাবতই আমাদেরকে বন্দী করতে চায়।'

'তার মানে আমরা এই গোল জায়গাটায় বন্দী এখন?'

কুয়াশা গম্ভীর হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, তাই। শুধু তাই নয়, আমাদেরকে তারা হত্যা করার জন্যেই বন্দী করেছে।'

'এসব কি বলছেন আপনি?'

প্রফেসর ঘন ঘন মাথা নাড়তে নাড়তে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, 'অসম্ভব। সব মিথ্যে, সব বাজে কথা! আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না! আপনি নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য অহেতুক আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু, মি. কুয়াশা আপনার আশা পূর্ণ হবার নয়। আয়ু শেষ হয়ে গেছে আপনার। আমার করার কিছু নেই।'

প্রফেসর ওয়াই হাতের পিস্তলটা তুলে ধরল। পিস্তলের নলটা ঠেকিয়ে দিল সে কুয়াশার বিশাল বুকের মাঝখানে। ট্রিগারে চেপে বসছে তার আঙুল।

হঠাৎ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল কুয়াশা।

'হোয়াট!'

গলা ছেড়ে উদাত্ত কণ্ঠে হেসেই চলেছে কুয়াশা। প্রফেসরকে বিমূঢ় দেখাচ্ছে, চেয়ে আছে সে কুয়াশার দিকে।

হাসি থামল কুয়াশার। বলে উঠল সে, 'হাসছিলাম কেন জানো, ওয়াই?'

'কেন?' প্রফেসর অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল।

'হাসছি তোমার কাণ্ড দেখে। আমার বুকে পিস্তল ঠেকিয়েছিলে ঠিকই, কিন্তু তোমার হাতটা কাঁপছিল থরথর করে। আসলে, নিজের হাতে আমাকে গুলি করার সাহস তোমার নেই। হাজার হোক...'

কুয়াশার শরীরে অকস্মাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। ডান হাতটা ইলেকট্রিক পাখার মত শূন্যে ঘুরতে শুরু করল তার। চারদিকে ঘিরে দাঁড়ানো প্রফেসরের সহচরদের নাকে মুখে তার হাতের বাড়ি লাগল প্রচণ্ডভাবে। ছিটকে পড়ে গেল সবাই। বাঁ হাত দিয়ে প্রফেসরের হাতের পিস্তলটা কেড়ে নিল সে। পরমুহূর্তে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল তাকে।

'কেউ নড়েছ কি মরেছ!' গর্জে উঠল কুয়াশা, 'হাতের অস্ত্র ফেলে দাও সবাই!'

দু'পা ফাঁক করে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা। প্রফেসরের সহচররা সবিস্ময়ে চেয়ে আছে তার দিকে। কি থেকে চোখের পলকে কি হয়ে গেল তখনও তা বুঝতে পারছে না যেন তারা।

প্রফেসর ওয়াই কুয়াশার ধাক্কা খেয়ে স্তূপীকৃত স্বর্ণের উপর গিয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে সে।

'কোথায় গুলি করতে হবে আমি জানি। সুতরাং কোন চালাকি করার চেষ্টা কোরো না! সাবধান!'

হঠাৎ সশব্দে খুলে গেল একটা দরজা। গোলাকার স্বর্ণ ভাণ্ডারে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করল শহীদ।

'চমৎকার ধনসম্পদ, সেই সাথে শয়তান ওয়াই—শাবাশ কুয়াশা! এতদিনে তুমি একটা মনের মত কাজ করেছ।' কথা বলে উঠলেন শহীদের পিছন থেকে মি. সিম্পসন।

কুয়াশা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'শহীদ, দরজাটা সবাই মিলে ধরে রাখো। ওটা যেন কোন মতে বন্ধ হয়ে না যায়!'

ভিতরে ঢুকে পড়েছে শহীদ তখন। ওর পিছনে বাকি সবাই দাঁড়িয়ে আছে। কুয়াশার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল ওদের পিছনের দরজাটা।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল শহীদ।

কুয়াশা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু মুখ খোলার অবসর পেল না সে। যান্ত্রিক একটা শব্দ কানে ঢুকল সকলের।

সবাই মুখ তুলে তাকাল উপর দিকে। প্রকাণ্ড লোহার ঝুলন্ত ঢাকনিটা নেমে আসছে নিচের দিকে। ঘর ঘর করে একটানা আওয়াজ হচ্ছে।

উপরকার ফাঁকটা বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক টন ওজনের ঢাকনিটা ঢেকে দিয়েছে স্বর্ণ ভাণ্ডারের মুখ।

কুয়াশা বলে উঠল, 'আমরা বন্দী এখানে!'

শহীদ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় গোপন লাউডস্পীকার থেকে একটা জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে: 'রহস্যপুরীর পবিত্রতা নষ্ট করে যারা তাদেরকে দেবতারা ক্ষমা করতে জানেন না। তোমরা দেবতাদের অনুমতি না নিয়ে রহস্যপুরীতে অনুপ্রবেশ করেছ। তোমাদের একমাত্র প্রাপ্য শাস্তি মৃত্যু। দেবতা রোটেনহেপো হেমনোসান ক্যানক্যান-এর পাদমূলে আগামীকাল সকালে তোমাদের সবাইকে বলি দেয়া হবে।'

'ঘোড়ার ডিম হবে!' থর থর করে কাঁপছে প্রফেসর ওয়াই প্রচণ্ড রাগে। চিৎকার করে উঠল সে হঠাৎ।

লাউডস্পীকার থেকে সেই জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর উচ্চারণ করে চলেছে তখনও: 'দেবতাদের আজ্ঞাবহ দাস আমরা। তোমাদের ব্যাপারে আমাদের করার কিছুই নেই। আজকের মত বিদায়!'

প্রফেসর ওয়াই উপর দিকে তাকিয়ে আবার চিৎকার করে উঠল, 'দাঁড়াও, আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও!'

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না।

'কান খুলে শুনে রাখো, তোমাদের দেবতার কান মলে দেব আমি।'

হেসে ফেলল কুয়াশা। বলল, 'আহ্! থামো!'

কুয়াশার দিকে চিন্তিতভাবে তাকাল প্রফেসর ওয়াই! 'ভারি মুসিবতে পড়লাম দেখা যাচ্ছে। মি. কুয়াশা, এখন উপায়! আমার ভ্যানিশিং রে যন্ত্রটাও ম্যাটাবরের সাথে গায়েব হয়ে গেছে—করিটা কি! একটা উপায় বের করুন তো দেখি। আসুন সবাই মিলে একটা পরামর্শ করা যাক।'

কুয়াশা বলল, 'তোমার হলো কি? এমনভাবে কথা বলছ শুনে মনে হচ্ছে সকলের সাথে তোমার পরম বন্ধুত্বের সম্পর্ক!'

'শত্রুতা আসলে বন্ধুত্বেরই পূর্ব শর্ত অথবা শত্রুতা বন্ধুত্বেরই নামান্তর মাত্র। পরস্পরের শত্রু আমরা এতক্ষণ ছিলাম ঠিক, কিন্তু সে তো নিজেদের মধ্যে। তৃতীয় একটা পক্ষ যখন আমাদের ক্ষতি করতে চাইছে তখন শত্রুতা ভুলে যাওয়া উচিত আমাদের···।'

হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল কুয়াশা।

শহীদ বলল, 'প্রফেসর, মাথা ঠিক আছে তো? ভয়ে আধমরা হয়ে গেছেন দেখছি!'

খেপে গেল প্রফেসর। চিৎকার করে উঠল সে, 'হোয়াট! কি বললে টিকটিকি তুমি! আমি ভয় পেয়েছি! হাঃ হাঃ হাঃ হা।' হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল প্রফেসর ওয়াই।

শহীদ লক্ষ করছিল কুয়াশাকে। লেসারগানটি বের করে ফেলেছে সে পকেট থেকে। একটা দরজার দিকে তাক করে ধরেছে সেটা।

উন্মাদের মতই হেসে চলেছে প্রফেসর ওয়াই। চমকে উঠল কুয়াশা।

'সর্বনাশ! শহীদ!'

'কি হলো? লেসারগান নষ্ট হয়ে গেছে!'

কুয়াশা তাকাল শহীদের দিকে। দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে তার প্রশস্ত কপালে। হ্যাঁ, নষ্ট হয়ে গেছে।

লেসারগানটা ছুঁড়ে ফেলে দিল কুয়াশা।

'এখন উপায়!'

'জানি না। আমরা সাংঘাতিক হিংস্র এবং খুনী লোকদের হাতে বন্দী হয়েছি, শহীদ। এদের হাত থেকে বাঁচব কিনা জানি না।'

প্রফেসর ওয়াইয়ের থামার কোন লক্ষণ নেই। সেই গগনবিদারী কণ্ঠে হাঃ হাঃ হাঃ হা করে উন্মাদের মত হেসেই চলেছে সে।

কুয়াশা ৫০

প্রথম প্রকাশ: মার্চ, ১৯৭৬

এক

গহীন গভীর আফ্রিকার অরণ্য।

সেই দুর্গম অরণ্যের ভিতর প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে রহস্যপুরী। এই রহস্যপুরীর কথা যুগ যুগ ধরে শুনে এসেছে সভ্য জগতের মানুষ, চোখে দেখেনি কেউ। যদিও বা কেউ দেখে থাকে, দেখাটুকুই সার, রহস্যপুরী দেখে সশরীরে সভ্য দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারেনি কেউ।

বাঙালী কিশোর আবিদই ঘটনাচক্রে এই রহস্যপুরী দেখে সর্বপ্রথম। সে আজ এক যুগেরও বেশি দিনের কথা। আফ্রিকার জঙ্গলে দীর্ঘদিন কাটিয়েছে সে এবং লিজা। নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে, আবিদের মাধ্যমেই রহস্যপুরী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারে পৃথিবীর মানুষ। জানতে পারে প্রফেসর ওয়াই, জানতে পারে কুয়াশা, জানতে পারে শহীদ, কামাল, মি. সিম্পসন, মহুয়া।

রহস্যপুরীতে শত শত বছর ধরে জমে উঠেছে সোনা, মণি-মাণিক্যের সুউচ্চ পাহাড়। রহস্যপুরী হলো দেবতাদের বাসস্থান। জংলীদের এই দেবতারা উপঢৌকন চান। জংলীরা দেবতাদের তুষ্ট করার জন্য শত শত বছর ধরে অলঙ্ঘনীয় নিয়ম অনুযায়ী সোনা, মণি-মাণিক্য রেখে আসে রহস্যপুরীতে। দেবতারা আরও একটা জিনিস চান। সেটা হলো নরবলি। জংলীরা তাও দেয়। জংলীরা বন্দী করে আনে সভ্য দুনিয়ার মানুষ।

দেবতার পাদমূলে তারা বলি দেয় বন্দী মানুষদেরকে।

দেবতারা তুষ্ট হন।

কিন্তু প্রফেসর ওয়াই দেবতাদেরকে তুষ্ট করতে নয়, রুষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিল। রহস্যপুরীর ধনভাণ্ডার লুট করার পরিকল্পনা করল সে। তার সেই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে বাধা দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগল মহাশক্তিশালী কুয়াশা। কুয়াশা একা নয়, প্রফেসরের উদ্দেশ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল শহীদ, কামাল, মি. সিম্পসন। নানা ঘটনা ঘটতে লাগল। আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ চলল। অবশেষে ওরা সবাই পৌঁছুল রহস্যপুরীতে।

রহস্যপুরীর ধনভাণ্ডারের ভিতর ওরা বন্দী হলো। প্রফেসর ওয়াই, কুয়াশা, শহীদ, কামাল, মি. সিম্পসন, টুইন আর্থ আনতারার রাজকুমারী ওমেনা, ডি. কস্টা, মহুয়া— সবাই।

রহস্যপুরীর ধনভাণ্ডারটি গোলাকার প্রকাণ্ড একটি কারাকক্ষের মত দেখতে।

চারদিকের পাথরের দেয়াল কঠিন ইস্পাতের পুরু পাত দিয়ে সম্পূর্ণ মোড়া। মাথার উপর কোন ছাদ বা সিলিং না থাকলেও প্রকাণ্ড একটা লোহার ঢাকনি ঢাকা দিয়ে রেখেছে জায়গাটাকে। বিরাটাকার একটা ড্রামের সাথে তুলনা করা যায় জায়গাটাকে। ওরা এই ড্রামের ভিতর আটকা পড়ে গেছে।

দরজাগুলো বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালিত। রহস্যপুরীর সর্বত্র, এমন কি এই ধনভাণ্ডারের ভিতরও লুকানো আছে টিভি ক্যামেরা। রহস্যপুরীর মহাশক্তিশালী কর্তৃপক্ষ সর্বক্ষণ সেই ক্যামেরার সাহায্যে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাচ্ছে ধনভাণ্ডারের বন্দী প্রত্যেককে। তারা লক্ষ্য রাখছে এদের গতিবিধি ভাবভঙ্গির উপর।

বন্দী হবার পর আমূল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে প্রফেসর ওয়াইয়ের মানসিকতার। তার কথাবার্তা শুনে অন্তত তাই মনে হচ্ছে। কুয়াশাকে মহাবিজ্ঞানী বলে স্বীকার করলেও তাকে প্রাণের দুশমন বলে মনে করে প্রফেসর ওয়াই। সেই কুয়াশার প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সে। তার বক্তব্য, আমরা পরস্পরের শত্রু হলেও পরস্পরকে আমরা শ্রদ্ধাও করি, ভালও বাসি। তাছাড়া, আমরা সবাই বাংলাদেশেরই নাগরিক। বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে বিজাতীয় একদল শত্রুর ফাঁদে যখন পা দিয়েছি তখন পরস্পরকে ক্ষমা করে দিয়ে আমরা বন্ধুত্বে উত্তীর্ণ হতে পারি এবং সবাই একজোট হয়ে এই মহা সংকট থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে চেষ্টা করতে পারি।

শহীদ প্রফেসরের কথা শুনে ঠাট্টা করে তাকে ভীতু বলে সম্বোধন করলে প্রফেসর উন্মাদের মত অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। একনাগাড়ে তিন মিনিট বিকট স্বরে হাসার পর থামল প্রফেসর।

শহীদের দিকে তাকিয়ে বজ্রকণ্ঠে সে বলতে শুরু করল নিজের কথা। কর্কশ, ঘরঘরে তার কণ্ঠস্বর। এক একটা শব্দ যেন এক একটা বোমা।

'ভয়? ভয়ে আমি আধমরা হয়ে গেছি? ইউ গডড্যাম ফুল!'

থরথর করে কাঁপছে প্রফেসর। খেপে গেছে সে শহীদের উপর। জংলীদের পোশাক পরা প্রকাণ্ড দেহটা নিয়ে পায়চারি শুরু করল সে মেঝেতে। পরনে রাজা অমেনটোট টেটার ছদ্মবেশ। মুখময় লাল, হলুদ, কালো রঙের লম্বা লম্বা নকশা। কপালে চন্দন। মাথায় মুকুট। মুকুটের চার ধারে ইগল পাখির পালক আটকানো। গলায় ঝুলছে মানুষের হাতের আঙুলের হাড় দিয়ে তৈরি মালা। মালার মাঝখানে শোভা পাচ্ছে একটি নরকরোটি। কোমরে জড়ানো ডোরা কাটা চিতাবাঘের ছাল। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত হলেও বুকের কাছে সাপের চামড়ার বেল্ট বাঁধা। সেই বেল্টের সাথে ঝুলছে স্বর্ণের এবং মুক্তার মেডেলসদৃশ অলঙ্কারাদি। প্রফেসরের বিখ্যাত ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি দেখা যাচ্ছে না। সাধের দাড়িটা তাকে কাটতে হয়েছিল জংলীদের রাজা অমেনটোট টেটার ছদ্মবেশ গ্রহণের প্রয়োজনে।

পায়চারি থামিয়ে শহীদের মুখোমুখি দাঁড়াল প্রফেসর ওয়াই। সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল সে। চমকে উঠল শহীদ। কী সাংঘাতিক! প্রফেসরের নিঃশ্বাস যেন আগুনের মতই গরম।

দাঁতে দাঁত চেপে প্রফেসর বলতে শুরু করল, 'আমার মহাশত্রুরাও যা বলতে পারেনি তুমি আজ তাই বললে আমাকে! পৃথিবীতে একমাত্র আমি, প্রফেসর ওয়াই, এই বুকে হাত দিয়ে বলছি, কাউকে ভয় করি না! না, ভুল হলো। ভয় আমি মাত্র একজনকে করি। সে কে জানো? মি. শহীদ, শুনবে তার নাম?'

ভাঁটার মত বড়বড় চোখে চেয়ে আছে প্রফেসর। খানিক আগে চোখের মণি দুটো একটু যেন লালচে বলে মনে হয়েছিল তার, কিন্তু সবিস্ময়ে শহীদ দেখল সে দুটো এখন যেন নীলচে দেখাচ্ছে।

'তার নাম প্রফেসর ওয়াই। তাকেই আমি সত্যিকার অর্থে একটু যা ভয় করি। কেন, কেন তাকে ভয় করি? কারণ, আমি জানি, তারই একমাত্র ক্ষমতা আছে খেপে গেলে যে-কোন ধ্বংসকাণ্ড ঘটাবার। আমি, প্রফেসর ওয়াই, পারি না এমন কাজ নেই। তোমরা বুদ্ধু, তাই আজও আমাকে চিনতে পারোনি। আমাকে তোমরা চ্যালেঞ্জ করো? বেশ, মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দাও আমাকে। আমি কথা দিচ্ছি, পৃথিবী নামক তোমাদের এই গ্রহকে আমি আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মহাশূন্যে মিশিয়ে দেব ধূলিকণায় রূপান্তরিত করে।'

কুয়াশাকে গম্ভীর দেখাচ্ছে। মেঝের উপর বসে সে তার লেসারগানটা মেরামত করার চেষ্টা করছিল। মুখ তুলে তাকিয়ে প্রফেসরের উদ্দেশ্যে কথা বলে উঠল সে, 'শান্ত হও, ওয়াই। সত্যিসত্যি খেপে গেছ দেখছি।'

'মি. কুয়াশা! বিশ্বাস করুন, একমাত্র আপনাকেই শুধু আমি আমার সমকক্ষ বলে মনে করি। আপনি আমার ক্ষমতা সম্পর্কে জানেন। এরা বোকা, এরা আমাকে চিনতে পারে না।'

কুয়াশা বলল, 'কিন্তু একটা কথা, ওয়াই। তোমার ক্ষমতা আছে, স্বীকার করি। কিন্তু সে ক্ষমতাও আর সকলের সব ক্ষমতার মত আপেক্ষিক। তোমার ক্ষমতা ব্যবহার করার সুযোগের ওপর সব কিছু নির্ভর করে। কেউ যদি তোমাকে বাধা না দেয় অর্থাৎ বিনা বাধায় যদি তুমি তোমার ক্ষমতা ব্যবহার করার সুযোগ পাও শুধুমাত্র তখনই যা খুশি তাই করতে পারো, ঘটাতে পারো যে-কোন ধ্বংসকাণ্ড। কিন্তু কেউ যদি তোমাকে বাধা দেয়? তুমি জানো, তোমার কাজে বাধা দেবার মত মানুষ কেউ একজন আছে। অবশ্য তুমি যদি ভাল কাজ করো তাহলে কেউ তোমাকে বাধা দেবে না।'

'হ্যাঁ, জানি। বাধা একজন অন্তত দেবে। আমাকে বাধা দেবার ক্ষমতা তার আছে, স্বীকার করি। তিনি আর কেউ নন—আপনি স্বয়ং। কিন্তু, মি. কুয়াশা, বিচলিত হবেন না। কারণ, সত্যিসত্যি এই পৃথিবীটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার পরিকল্পনা এখনও আমি করিনি। পৃথিবীটাকে আমি নতুন ভাবে গড়ে তুলতে চাই। ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানে, এই পৃথিবীতে সঠিক পথে কোনদিন শান্তি আসেনি। পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেন, শান্তি আগামীতেও আসবে না। এর কারণ কি? পৃথিবীর মাটিতে কি চিরকাল ধরে চলবে এই দলাদলি, এই হিংস্র স্বার্থপরতা? হিংসা-বিদ্বেষের বিষবাষ্প থেকে পৃথিবীর বাসিন্দারা কি কোনদিন মুক্ত হতে পারবে না? এই প্রশ্নের উত্তর কি তা আমাদের মোটামুটি জানা আছে। মানুষ জন্মসূত্রেই কিছু

দুর্বলতার শিকার। সে পরশ্রীকাতর, সে স্বার্থপর, সে ভাবাবেগজড়িত, সে অন্ধ এবং নীতিহীন। সভ্যতাও তাকে পরিপূর্ণভাবে মানুষ করতে পারেনি। সুযোগ পেলেই সে অসৎ হয়। শিক্ষা তার ভিতরকার পশুটাকে বন্দী করে রাখতে সমর্থ হলেও তাকে পোষ মানাতে সক্ষম হয়নি। সুযোগ পেলেই সেই পশুটা বীভৎস চেহারা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাইরে। শিক্ষার সুযোগ আর পাওয়া যায় না। এই নিয়েই চলছে মানুষ। তাই মানুষের সমাজে এত অশান্তি, এত দাঙ্গাহাঙ্গামা, এত যুদ্ধ-বিগ্রহ। এর প্রতিকার আমি করতে চাই। আমি চাই স্থায়ী এবং শর্তহীন শান্তি নেমে আসুক এই পৃথিবীতে। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? সম্ভব বিজ্ঞানের উন্নতির মাধ্যমে। বিজ্ঞানের দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করা অসাধ্য নয়। মানুষকে রূপান্তরিত করতে হবে বিজ্ঞানের মাধ্যমে। এই দায়িত্ব যার-তার দ্বারা পালন করা সম্ভব নয়। আমি একজন বিজ্ঞানী এবং আমি মনে করি গোটা পৃথিবীতে আমার মত বিজ্ঞানী আর একজনও নেই, আপনি ছাড়া। আমি পরীক্ষা চালাচ্ছি মানুষকে রূপান্তরিত করার সম্ভাব্যতা নিয়ে। মানুষের শরীরের সবচেয়ে গোলমেলে এবং জটিল যন্ত্র হচ্ছে তার মস্তিষ্কটি। ব্রেন হচ্ছে সবকিছুর মূল। এই ব্রেন, আগেই বলেছি, খুব জটিল একটা যন্ত্র। আমি এই যন্ত্র নিয়েই গবেষণা করছি। সাধারণ একটা ধারণা থেকে আমি আমার কাজ শুরু করেছি। ধারণাটা হলো, ব্রেনটাকে নানা কাজে ব্যবহার না করে মাত্র কয়েকটা কাজে ব্যবহার করা হলে কাজগুলো হবে অপেক্ষাকৃত নিখুঁত এবং নিপুণ। ধরা যাক এমন একটা ব্রেনের কথা, যে ব্রেন দুশ্চিন্তা করতে জানে না। যতবড় বিপদই ঘনিয়ে আসুক, সেই ব্রেনের অধিকারী দুশ্চিন্তাহীন থাকতে পারে। সাংঘাতিক একটা ব্যাপার হবে না কি সেটা? আমি এই ধরনের ব্রেন আবিষ্কারও করেছি। এক্সপেরিমেন্টালি এই কৃত্রিম ব্রেন মানুষের মধ্যে যুক্ত করে দিলে কেমন হবে? হয়তো দারুণ ভাল ফল পাওয়া যাবে। তবে অনেক অসুবিধেও দেখা দিতে পারে। সে যাই হোক, সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানও করা যাবে। মোটকথা, এই গবেষণা ব্যর্থ হলেও আমি ক্ষান্ত হব না। একটার পর একটা উপায় উদ্ভাবন করে পৃথিবীর লোককে নিঃস্বার্থ, কর্মনিষ্ঠ, হিংসা-বিদ্বেষ শূন্য, আদর্শ এবং ভোগ-বিলাসহীন নিখুঁত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই আমি; যাতে পৃথিবীটা সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। যাতে শান্তি স্থায়ী এবং সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠে। সে কারণেই পৃথিবীকে ধ্বংস করার কথা এখনও ভাবিনি আমি। মি. কুয়াশা, ভয়ের কিছু নেই। তবে, হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আমি যদি ব্যর্থ হই, যদি প্রমাণিত হয় যে এই পৃথিবীতে যারা বাস করে তারা কোনদিনই সত্যিকার অর্থে ত্রুটিহীন পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানুষে রূপান্তরিত হতে পারবে না—সেদিন আমি নির্দ্বিধায় ধ্বংস করে ফেলব নিজেকে, তার আগে অবশ্যই গুঁড়ো করে উড়িয়ে দেব জঞ্জালসর্বস্ব এই প্রাচীন দুনিয়াটাকে।'

দীর্ঘ ভাষণ দেয়া শেষ করে আবার পায়চারি শুরু করল প্রফেসর ওয়াই। অস্বাভাবিক উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে।

মুচকি মুচকি হাসছে কুয়াশা। শহীদ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কৌতুক খেলা করছে তার দৃষ্টিতে। প্রফেসর ওয়াইয়ের দশবারোজন অনুচর পাথরের মূর্তির মত একধারে লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা সবাই সতর্ক, প্রস্তুত। প্রফেসর

ওয়াই কোন নির্দেশ দেয়া মাত্র তা পালনের জন্য একপায়ে খাড়া হয়ে আছে।

কামাল ফিসফিস করে কি যেন বলছে মহুয়ার কানের কাছে মুখ নামিয়ে। মি. সিম্পসন গম্ভীর ভাবে চেয়ে আছেন স্তূপীকৃত স্বর্ণের দিকে।

বিড় বিড় করে কিছু বলছে প্রফেসর ওয়াই আপনমনে। ডি. কস্টা কয়েক পা এগিয়ে গেল তার দিকে। গলাটা লম্বা করে দিয়ে খাড়া করে রাখল কান, প্রফেসরের অস্পষ্ট শব্দগুলো শুনতে চাইছে সে।

কুয়াশার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কথা বলে উঠল টুইন আর্থের রাজকন্যা রাজকুমারী ওমেনা, 'কুয়াশা!'

ওমেনার কণ্ঠে উদ্বেগ। কুয়াশা দ্রুত তাকাল তার দিকে।

'কি ব্যাপার, ওমেনা?' ওমেনাকে সিরিয়াস দেখাচ্ছে। হঠাৎ চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলল সে।

চিন্তিত হয়ে উঠল কুয়াশা। চিন্তিত হয়ে উঠল শহীদও। কেননা ওরা জানে ওমেনা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী। অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে ওমেনার ব্রেনের। ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা সে আগে থেকে কিভাবে যেন টের পায়। হুবহু ঘটনাটা বলে দিতে না পারলেও ঘটনার প্রকৃতিটা কেমন হবে তা সে চেষ্টা করলে বলে দিতে পারে।

কয়েক মুহূর্ত পর চোখ মেলল ওমেনা। বলল, 'মনটা কেন যেন খুঁত খুঁত করছিল। গভীরভাবে চিন্তা করলাম তাই। আমার মনে হচ্ছে, একটা বিপদ এগিয়ে আসছে দ্রুত আমাদের দিকে।'

'কি ধরনের বিপদ?'

'শত্রুতামূলকভাবে কেউ আমাদেরকে শাস্তি দেবার বা শাস্তি ভোগ করবার মত পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেবে। পরিষ্কার করে বলতে পারছি না আমি।'

প্রফেসর ওয়াই পায়চারি থামিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওমেনার দিকে। হঠাৎ সে তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল: 'রাজকুমারী, আমি একটা কথা বলতে চাই তোমাকে। অবশ্য তুমি যদি অনুমতি দাও।'

ওমেনা সরে গেল প্রফেসরের কাছ থেকে। মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে সে বলে উঠল, 'মাফ করবেন। আপনাকে আমি পছন্দ করি না। সুতরাং অনুমতির প্রশ্নই ওঠে না।'

আর কেউ এই কথা বললে প্রফেসর ওয়াই খেপে গিয়ে তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দিতেন। কিন্তু ওমেনার কথা শুনে তাকে এতটুকু বিরূপ হতে দেখা গেল না। মুখের চেহারা একটু ম্লান হয়ে উঠল কেবল। এমন কি ওমেনার কথা শুনে সে কোন মন্তব্যও করল না। কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

শহীদ বলল, 'আসল সমস্যার প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেছে। প্রফেসর ওয়াই, এই বন্দীদশা থেকে আমাদের মুক্তি পাবার ব্যাপারে···।'

'ওহ-হো!' প্রফেসর ব্যস্ত হয়ে উঠল। কুয়াশার দিকে তাকাল সে।

'আমাদের সমস্যার প্রকৃতিটি আগে জানা দরকার। আমার কাছে অস্ত্র বলতে আছে রিভলভার আর অটোমেটিক কারবাইন। এসব এখানে কোন কাজে আসবে না। ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রটা ছিল ম্যাটাবরের কাছে। তার কপালে কি ঘটছে তা

আপনার বন্ধু মি. শহীদ হয়তো বলতে পারবেন।'

শহীদ নয়, উত্তর দিল কামাল। বলল, ' ম্যাটাবরের কপালে যা ঘটেছে তার জন্য আমরা কেউ দায়ী নই। নেকড়েরা তাকে পছন্দ করে, তাই সাথে করে নিয়ে গেছে ডিনার খাবে বলে।'

প্রফেসর গর্জে উঠল, 'শাট আপ! আমার ডানহাত সে। নেকড়ে কেন, সিংহও তাকে খেয়ে হজম করতে পারবে না।'

কুয়াশার দিকে তাকাল প্রফেসর ওয়াই, 'মোটকথা, ম্যাটাবর কোথায় এখন তা আমি জানি না। ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রটা তার কাছে ছিল, সেটার খবরও বলতে পারছি না। অস্ত্রপাতি আপনার কাছে কি কি আছে বলুন তো?'

কুয়াশা বলল, 'আছে তো অনেক। তবে লেসারগানের মত কোনটাই তেমন কাজের নয়, এই পরিস্থিতিতে। লেসারগানটা নষ্ট হয়ে গেছে। নষ্ট হবার কারণটা এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না আমি। তবে দরজা বা ইস্পাতের দেয়াল কেটে পথ তৈরি করার জন্য আমি ছোটখাটো এক আধটা অস্ত্র দিতে পারি। কিন্তু তাতে কি লাভ হবে কিছু?'

প্রফেসর বলল, 'সব দিক ভাল করে ভেবে দেখে তবে কাজে হাত দিতে হবে আমাদের। সবচেয়ে আগে আমাদের মধ্যে একটা আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়ে যাওয়া উচিত। আমি একটা সভা করার কথা বলছি। সভা করতে হলে একজন সভাপতি দরকার। আজকের এই বিপদের হাত থেকে মুক্তি লাভের জন্য যে সভা একটু পরই শুরু হবে'সেই সভার চেয়ারম্যান হিসেবে আমি মি. কুয়াশার নাম প্রস্তাব করছি।'

'হামি, দি গ্রেট স্যানন ডি. কস্টা. এই প্রষ্টাবের ঘোর বিরোচিটা করিটেছি!'

'হোয়াই।'

খিক খিক করে খানিকক্ষণ হাসল ডি. কস্টা। তারপর বিরক্তির সাথে বলল, 'এটো বুড্ডি হাপনার আর সামান্য জিনিসটা ধরিটে পারিলেন না? মি. অ্যাবসেন্ট মাইডেন্ট প্রফেসর, হাপনি কি চেয়ারম্যানের অর্ঠ অবগট নহেন?'

প্রফেসর ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠছে। রক্তচক্ষু মেলে সে তাকিয়ে আছে ডি. কস্টার দিকে, 'জানি বৈকি। কি বলতে চান আপনি পরিষ্কার করে বলুন।'

ডি. কস্টা প্রফেসর ওয়াইয়ের রক্তচক্ষুকে এতটুকু গ্রাহ্য করল না। বলে উঠল, 'না জানিয়া জানি বলাটা খুবই বড় ঢরনের আহম্মকি, বিলিভ মি। চেয়ারম্যানের জন্য একটি চেয়ার ডরকার হয়। কোঠায় সেই চেয়ার? চেয়ার ছাড়া হামার ফ্রেণ্ড মি. কুয়াশা চেয়ারম্যান হইটে পারেন না।'

হেসে উঠল সবাই। হাসল না শুধু প্রফেসর ওয়াই। গর্জে উঠল সে।

চেয়ার নেই বলে কি সভা হবে না?

'হোবে, হোবে। অন্য কারও নামে প্রস্টাব করিলে হোবে। মি. কুয়াশার কঠা আলাডা। হি ইজ এ গ্রেট ম্যান। টাহাকে চেয়ারম্যান করিটে চাহিলে চেয়ার অফকোর্স ঠাকিবে।'

কামাল বলে উঠল, 'কিন্তু চেয়ার ছাড়া চেয়ারম্যান হতে আর কেউই বা রাজি হবে কেন?'

ডি. কস্টা গম্ভীর হয়ে উঠল, 'বিপডের সময় হামি প্রেসটিজ ট্যাগ করিটে সম্মট আছি।'

'তারমানে?'

'চেয়ারের অভাবে কেউ চেয়ারম্যান হইটে রাজি হইবে না, বুঝিটে পারিটেছি। কিন্টু হামার ওইসব বালাই নাই। হামি বিপডটাকেই অগ্রাটিকার ডিটে চাই। হাপনারা সাপোর্ট ডিলে হামি চেয়ারম্যানের জন্য নিজের নাম প্রস্টাব করিটে পারি। ফ্র্যাঙ্কলি, আমি সেই প্রস্টাবই ডিটেছি।

হাসির বন্যা বয়ে গেল। কামাল বলে উঠল, 'আমি ডি. কস্টার প্রস্তাব সমর্থন করছি।'

হাততালি দিয়ে উঠল ওমেনা।

গম্ভীর, কর্কশ কণ্ঠে প্রফেসর বলে উঠল, 'বেশ। তাহলে সভার কাজ শুরু করা যাক।'

'ওয়েট এ বিট!' ডি. কস্টা কথাটা বলে সরু পাটখড়ির মত ডানহাতটা তুলে প্রফেসর ওয়াইয়ের মূর্তিবৎ দণ্ডায়মান অনুচরদেরকে কাছে ডাকল, 'শোনো টোমরা। এডিকে অ্যাডভান্স করো।'

প্রফেসরের দশবারোজন অনুচর যন্ত্রের মত একযোগে তাকাল প্রফেসর ওয়াইয়ের দিকে।

গর্জে উঠল ডি. কস্টা। 'ওডিকে কি, হামার ডিকে টাকাও টোমরা। শুনটে পাওনি, সবাই হামাকে চেয়ারম্যানের পোস্টে বরণ করিয়া নিয়াছে? হামি যে অর্ডার ডিবো টাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিটে হইবে।'

অনুচরবৃন্দ তাকাল ডি. কস্টার দিকে।

'টোমরা ওই গোল্ডের মাউন্টেন অর্থাৎ স্বর্ণের স্টুপগুলাকে সুগুর করিয়া সাজাও। এমনভাবে সাজাইবে যাহাটে হামি উহার উপরে বসিটে পারি।'

কুয়াশার দিকে তাকাল ডি. কস্টা। মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল, 'স্বর্ণের সিংহাসন, হামার মটো একজন সভাপটির যোগ্য আসন, ইজ ইট নট?'

প্রাণ খুলে হেসে উঠল কামাল।

প্রফেসর ওয়াইয়ের অনুচরেরা ডি. কস্টার নির্দেশে কাজে লেগে গেল। খানিক পর স্বর্ণের স্তূপের উপর বসল ডি. কস্টা।

সভার কাজ শুরু হলো।

প্রথমেই ভাষণ দিল ডি. কস্টা, 'লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, অ্যাটেনশান প্লীজ। হামি, হাপনাডের রেসপেক্টবল চেয়ারম্যান সকল বণ্ডির উড্ডেশ্যে ভাষণ ডিটেছি। হামাডের সামনে ভয়অংকর বিপড ডেকা ডিয়াছে। এই ভয়অংকর বিপড হইটে পলাইটে হইলে ডল-মট নিরবিশেষে হামাডেরকে এক হইটে হইবে। পাওয়ার হামাডের এনিমিডের টুলনায় বহুট বেশি, সুটরাং উইন হামাডের অবঢারিট। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ, সায়েনটিস্ট মি. কুয়াশা এবং টাঁহার মিস-গাইডেড প্রাক্টন শিষ্য অ্যাবসেন্ট মাইণ্ডেড প্রফেসর ওয়াই ছাড়াও হামাডের মড্যে রহিয়াছেন ফেমাস প্রাইভেট ডিটেকটিভ মি. স্যানন ডি. কস্টা, মি. শহীড, রহিয়াছেন প্রিন্সেস ওমেনা,

মিসেস মহুয়া এবং মি. কামাল। সরি, হামার জাটভাই, স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিস অফিসার মি. সিম্পসনের কঠা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। টিনিও হামাডের মধ্যে রহিয়াছেন! হামরা সবাই নিজ নিজ ক্ষেট্রে এক একজন জিনিয়াস। সুটরাং এনিমিবাহিনী যটো বড় এবং ভয়ঙ্করই হোক, হামরা বিজয়ী হইবই।'

দম নিয়ে সকলের দিকে একবার করে তাকিয়ে নিল ডি. কস্টা। খুশি হয়ে উঠল সে। সবাই বেশ মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনছে। আবার শুরু করল সে:

'এনিমিডের কবল হইটে নিজেডেরকে মুক্টো করাটা কোন সমস্যা নয়, টাহা আগেই হামি বলিয়াছি। সমস্যা আই মীন প্রবলেম, অন্যখানে। এই বণ্ডিখানায় হামরা বণ্ডি হইয়াছি ডুইটা ডল। একটি ডলের নেটা প্রফেসর ওয়াই, অন্য ডলের নেটা মি. কুয়াশা। হামরা প্রফেসর ওয়াইয়ের কার্যকলাপ এবং নীটি সাপোর্ট করি না। টিনি আইন মানেন না, টিনি মানুষকে অকারণে মার্ডার করেন। যাহাই হউক, টারই রিকোয়েস্টে হামরা সব বিভেড ভুলিয়া এক হইয়াছি। এই একোটা যেন অটুট ঠাকে, এই হামার অনুরোঢ। প্রফেসর ওয়াইকে হামরা খুব ভাল করিয়াই চিনি। টিনি কঠা ডিয়া কঠা রাখেন না। টিনি সুযোগ পাইলে বেঈমানী করেন। টাই টাহাকে হামি বিশেষভাবে বলিটে চাই যে, ডয়া করিয়া বেঈমানী করিবেন না। ডয়া করিয়া হামাডেরকে না জানাইয়া কোন গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁডিবেন না। হামার ঐটিহাসিক ভাষণ শেষ করিটেছি। টার আগে শেষ একটা কঠা বলিটে চাই। এই বণ্ডিকক্ষে লক্ষ লক্ষ ডলারের গোল্ড রহিয়াছে। এই গোল্ড ডুই ভাগে ভাগ হইবে। এখান হইটে মুকটো হইয়া ভাগাভাগি করিব। একভাগ পাইবেন মি. কুয়াশা। বাকী এক ভাগ হামরা সকলে সমানভাগে বণ্ঠন করিয়া লইব। আশা করি ইহাটে কাহারো কোন আপট্টি নাই।'

এক পা সামনে এগিয়ে এল প্রফেসর ওয়াই।

'আছে। আমি আপত্তি করছি। মি. কুয়াশা একা পাবেন অর্ধেক আর বাকী অর্ধেক আমরা সবাই ভাগ করে নেব—এ কেমন বিচার? মি. ডি. কস্টা, মাননীয় সভাপতি, আপনি আগেই বলেছেন এখানে আমরা দুটো দল আছি। একটি দলের নেতা মি. কুয়াশা, অপর দলটির নেতা আমি। স্বর্ণ দুই ভাগেই ভাগ হোক। কিন্তু একটি ভাগ আমরা, আর একটি ভাগ আপনারা নিন।'

ডি. কস্টা প্রফেসর ওয়াইয়ের বক্তব্য শোনার পর বলল, 'প্রফেসর ওয়াই, হাপনি একটা ইমপরট্যান্ট কঠা ভুলিয়া গিয়াছেন। হামি টাহা হাপনাকে মনে করাইয়া ডিটে চাই। মি. কুয়াশার ডল অর্ঠাট হামরা ইচ্ছা করিলেই সব গোল্ড ডখল করিয়া নিটে পারি। ক্ষমতার জোর হামাডের বেশি, বুড্ডির জোরও হাপনাডের চেয়ে হামাডের বেশি। হাপনার ডলে ওনলি হাপনিই একমাট্র বুড্ডিমান। বাকী সবাই ব্রেনলেস মাঙ্কি অর ডাঙ্কি। কিন্টু হামাডের ডলে হামরা সবাই বুড্ডিমান। সুটরাং, ইচ্ছা করিলে ছলে-বলে কৌশলে এই গোল্ড হামরা নিজেডের দখলে রাখিটে পারি। কিন্টু টাহা হামরা চাহি না। হামরা বিবেকবান, হামাডের ডয়ামায়া আছে। ডয়া করিয়া টাই হাপনাডেরকে স্বর্ণের ভাগ ডিটে চাহিটেছি। এ ব্যাপারে হাপনার উচিট হামাডের প্রটি কৃটজ্ঞটা প্রকাশ করা।'

প্রফেসর ওয়াই অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল। রক্তচক্ষু মেলে ঠায় চেয়ে রইল সে ডি. কস্টার দিকে। তারপর হুঙ্কার ছাড়ার মত একটা শব্দ করল সে: 'হুঁ।'

ডি. কস্টা বলতে শুরু করল, 'গোল্ড ভাগ বাটোয়ারার প্রবলেম সলভ হইয়া গেল। এখন গোল্ডগুলা চটের ব্যাগে ভরিয়া ভাল করিয়া বাঁধা হউক। এখান হইটে মুকটো হইয়া পালাইবার সময় যেন হাঙ্গামা পোহাইটে না হয়। এ ব্যাপারে হামি প্রফেসর ওয়াইয়ের শিষ্যডের সুযোগ ডিটে চাই। টাহারাই চটের ব্যাগে গোল্ড ভরিবার দায়িত্ব পালন করুক। সাবঢান, কেউ যেন দু'এক টুকরা পকেটে ভরিবার চেষ্টা করিবেন না। চুরি করিলে গড, ভগবান এবং খোদার কাছে ঠেকা ঠাকিবেন। লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টলমেন, হামার বক্তব্য শেষ।'

ডি. কস্টা থামতে কথা বলে উঠল কামাল।

'এবার এই বন্দীখানা থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

সভাপতি বলে উঠল, 'হাপনার প্রস্টাব পেশ করুন।'

কামাল বলল, 'আমাদের সকলের কাছে যা যা অস্ত্র আছে তা একত্রিত করা হোক। অস্ত্রের সংখ্যা এবং গুণাগুণ সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পেতে চাই আমরা। মনে করতে হবে, শত্রু মহাশক্তিশালী। এবং শত্রুরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদের হত্যা করবে। সমস্যাটা জীবন-মরণের। এই বিপদ থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে বুদ্ধির চেয়ে বেশি দরকার অস্ত্র। অস্ত্র যদি কাজের হয় তাহলে আমরা পরবর্তী কর্তব্য সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসতে পারব।'

কুয়াশা বলে উঠল, 'আমি কামালের প্রস্তাব সমর্থন করি।'

প্রফেসর ওয়াই বলে উঠল, 'আমিও।'

সভাপতি বলল, 'গুড। ডেরি না করিয়া যে যার উইপন বাহির করিয়া মেঝেটে রাখুন।'

কুয়াশা তার পকেট থেকে ছোট ছোট অনেকগুলো অস্ত্র বের করে মেঝেতে রাখল। সব অস্ত্রই তার নিজের আবিষ্কৃত। স্মোক বম, গ্যাস বম থেকে শুরু করে কাঠকাটার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, ইস্পাত ছিদ্র করার যন্ত্র, রিভলভার, মাস্ক, বিষাক্ত সুচ নিক্ষেপক পিস্তল—সবই রয়েছে। প্রফেসর ওয়াইয়ের অস্ত্রগুলো স্ব-আবিষ্কৃত। স্টেনগান, স্মোক বম্ গ্যাস বম্ ছাড়া সে মেঝেতে রাখল একটা পেটমোটা বোতলের মত স্টীলের যন্ত্র।

'ওটা কি?' জানতে চাইল শহীদ।

প্রফেসর বলল, 'এটা একটা রেডিও। আমার হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য এটা ব্যবহার করি। তাছাড়াও, এটা ব্যবহার করা যায় অন্য নানা কাজে। পাইলটহীন এরোপ্লেন আছে আমার গোটা চারেক। সেগুলোকে পরিচালনা করতে হলে এই রেডিওর সাহায্য একান্ত দরকার। কিন্তু কপাল খারাপ, পরীক্ষা করে দেখেছি আমি এটা কোন কারণে যেন নষ্ট হয়ে গেছে।'

কুয়াশা বলে উঠল, 'আমার লেসারগানটাই শুধু নয় অন্যান্য অস্ত্রও বিকল হয়ে গেছে। এখন আমি কারণটা অনুমান করতে পারছি। এই রহস্যপুরীর কোথাও

শক্তিশালী ম্যাগনেট আছে। যার প্রভাবে সব যন্ত্রের কলকজা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। ফলে কোন অস্ত্রই আর কাজের নেই।'

সভাপতি চেঁচিয়ে উঠল, 'টাহলে উপায়?'

প্রশ্ন করল শহীদ, 'কুয়াশা, অস্ত্রগুলো কি মেরামত করা সম্ভব হবে?'

'তা সম্ভব হবে। তবে জটিল যন্ত্রগুলো মেরামত করতে প্রচুর সময় লাগবে। আমার লেসারগান বা ওয়াইয়ের রেডিও মেরামত করতে কমপক্ষে দু'দিন লাগবে। ছোটখাটো অস্ত্রগুলো মেরামত করতে একঘণ্টার বেশি সময় লাগবে বলে মনে হয় না।'

'বোমাগুলোর খবর কি?'

'ওগুলো ঠিকমত আছে।'

শহীদ বলল, 'সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কাজ অস্ত্রগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেরামত করে ফেলা।'

কুয়াশা বলল, 'ঠিক তাই।'

প্রফেসর বলল, 'আর একটা ব্যাপার। ওরা আমাদের ওপর সর্বক্ষণ নজর রাখছে। নিশ্চয়ই এখানে টিভি ক্যামেরা লুকানো আছে। ক্যামেরাগুলো খুঁজে বের করে নষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে।'

কুয়াশা বলল, 'এই দায়িত্ব আমি শহীদকে দিতে চাই।'

সভাপতির আসন থেকে মি. ডি. কস্টা বলে উঠল, 'মি. কুয়াশার এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করিটেছি। আর কাহারো কোন প্রস্টাব আছে?'

ওমেনা বলে উঠল, 'আছে। আমার মন বলছে, আমাদের মধ্যে একজন লোক মনে মনে চিন্তা করছে নিজের দলকে নিরাপদে মুক্ত করে এই বন্দীখানা থেকে পালিয়ে যাবার কথা। লোকটা কে তা আমি জানি না। সে মি. কুয়াশার দলের লোকও হতে পারে, প্রফেসর ওয়াইয়ের দলের কেউও হতে পারে। এই ধরনের চিন্তা করা অন্যায়। আমি প্রস্তাব করছি, এই ধরনের চিন্তা থেকে বিরত থাকার জন্য তাকে হুঁশিয়ার করে দেয়া হোক।'

সভাপতি গর্জে উঠল, 'টুমি বেঈমান যেই হও, সাবটান! টরা পড়িলে হামি টোমার কাঁচা মাংস চিবাইয়া খাইব!'

প্রফেসর বলে উঠল, 'আমি বা আমার কোন লোক এই ধরনের চিন্তা করছে না।'

কাপাল বলে উঠল, 'ওমেনা কিন্তু কারও নাম উল্লেখ করেনি। ব্যাপারটা—"আমি কলা খাইনি" ধরনের হয়ে গেল না কি, প্রফেসর?'

'ওহে মি. টিকটিকির সহকারী, ব্যঙ্গ করে কথা বলো না!' প্রফেসর গর্জে উঠল।

কুয়াশা থামিয়ে দিল ওদেরকে, 'থামো সবাই। যে যা ইচ্ছা চিন্তা করুক। কেউ যদি বেঈমানী করে করুক, প্রাপ্য শাস্তি সে পাবে। এ প্রসঙ্গে আর কোন আলোচনার দরকার নেই। এবার কাজে হাত দেয়া যাক।'

সভাপতি বলে উঠল, 'সভার সমাপ্তি ঘোষণা করিটেছি। ডুই ডল ডুই ডিকে

সরিয়ে গিয়া বসুন। খুডে অস্ত্রগুলো মেরামতের কাজ শুরু করা যাক।'

সভার কাজ শেষ হয়ে গেল।

দুই

জরুরী সভা বসেছে রহস্যপুরীর আর এক প্রকোষ্ঠে।

সভাপতির আসনে বসে আছে দেবতা অ্যাংগেলা। তার সম্মুখবর্তী স্বর্ণাসনে পাশাপাশি বসে আছে আরও ডজন দেড়েক দেবতা। জংলীদের মধ্যে তারা দেবতা রোহান কোরা, হিরোশো হালা, রাঙাচা পাঙশি, গটেন টট, হোমরু চোমরু, বেলকা চামুর, বিজা বিজা চোন, জেমবালা ধুরী, মালকোস মামবানা, লুলুলা লাম্বালা, ফেকরী কদ্দম, ওয়ালাফা মোয়াল্লাফা, তানতবলা ডুমা, বেয়াকানা জীরন, সালায়কা হোদালা প্রভৃতি নামে পরিচিত।

এক একজন দেবতা এক একরকম দেখতে। মানুষের মত হাত পা এবং শরীর হলেও মুখের চেহারা কারুরই মানুষের মত নয়। কোন দেবতার মুখ হুবহু বাঘের মত, কোন দেবতার মুখ হুবহু সিংহের মত, কারও বা ভাল্লুকের মত মুখ, কারও বা গরুর মত।

সভাপতি দেবতা অ্যাংগেলার মুখ হুবহু হাতির মত। প্রকাণ্ড দুটো কান নাড়তে নাড়তে ভাষণ দিচ্ছে সে।

'শত্রুরা ছোট নয়। এদের মধ্যে এমন দু'জন লোক রয়েছে যারা এই রহস্যপুরী কেন, গোটা আফ্রিকা মহাদেশকে ধ্বংস করে দিতে পারে। তবে, ভয়ের আর কোন কারণ নেই। কেন না, তারা যত ভয়ঙ্করই হোক, সবাই এখন আমাদের হাতে বন্দী। তবু, সাবধানের মার নেই। আমাদেরকে সারাক্ষণ সাবধানে থাকতে হবে।'

দেবতা বিজা বিজা চোন বলে উঠল, 'শত্রুদেরকে হত্যা করে ফেললেই তো সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।'

সভাপতি দেবতা অ্যাংগেলা বলল, 'অধৈর্য হওয়া কোন মতেই উচিত হবে না আমাদের। আমি আগেই বলেছি, গত শত বছরের মধ্যে এত বড় বিপদের মুখোমুখি হইনি আমরা। সত্যি কথা বলতে কি, এই বিপদ আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। তাড়াহুড়ো করে এমন কোন কাজ করা উচিত হবে না যার ফলে হিতে বিপরীত ঘটে যায়। যাই করি, নিখুঁতভাবে করতে হবে। করার আগে বারবার ভেবে চিন্তে দেখতে হবে। শত্রুদের মধ্যে কুয়াশা নামে যে মানুষটা আছে তার কথা তোমরা কেউই বিশেষ কিছু জানো না। কিন্তু আমি তোমাদের নেতা, অনেক খবর রাখতে হয় আমাকে। আমি এই কুয়াশা সম্পর্কে অনেক কথা জানি। কুয়াশা হচ্ছে বাংলাদেশের সন্তান। শুধু বাংলাদেশের না, সারা বিশ্বের নীতিহীন ধনী সম্প্রদায়ের কাছে কুয়াশা মূর্তিমান আজরাইল এবং সারা বিশ্বের গরীব, নির্যাতিত মানুষের কাছে এই কুয়াশাই ফেরেশতার মত শ্রদ্ধেয়। আজ পর্যন্ত কোন দেশের পুলিস বা সামরিক বাহিনী কুয়াশাকে বন্দী করে রাখতে পারেনি। এগারোটা দেশ কুয়াশাকে জীবিত বা

মৃত ধরে দেবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে। সর্বমোট পঁয়ত্রিশ লক্ষ ডলার। এত বড় অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করা সত্ত্বেও কেউ কুয়াশাকে বন্দী বা হত্যা করতে এগিয়ে আসতে সাহস পায়নি। বুঝতেই পারছ, আগুন নিয়ে খেলছি আমরা। ইচ্ছা করলে এই আগুন নিভিয়ে ফেলতে পারি অর্থাৎ কুয়াশাকে হত্যা করতে পারি। কিন্তু কুয়াশাকে হত্যা করার পর কিছু ঘটবে কিনা তাও ভেবে দেখতে হবে আমাদেরকে। এই এলাকার প্রায় প্রতিটি জংলী উপজাতির রাজা মহারাজার সাথে কুয়াশার বন্ধুত্ব আছে। দু'চার বছর পর পর কুয়াশা এই এলাকায় একবার না একবার আসেই। জংলীরা সবাই কুয়াশার প্রতি কৃতজ্ঞ। বিপদের সময় কুয়াশা তাদেরকে সাহায্য করেছে, তাদের নানান আপদ-বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে। তারা অন্ধের মত ভালবাসে কুয়াশাকে। বহু জংলীরাজা জানে, কুয়াশা রহস্যপুরীতে প্রবেশ করেছে। তারা হয়তো অপেক্ষা করছে কুয়াশার জন্যে। কুয়াশাকে যদি তারা রহস্যপুরী থেকে বেরুতে না দেখে তাহলে স্বভাবতই তাদের মনে নানারকম সন্দেহের উদ্রেক হবে। দলবেঁধে তারা যদি রহস্যপুরীতে কুয়াশার খোঁজে ঢুকে পড়ে তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'তাহলে উপায়?'

সভাপতি বলল, 'অপেক্ষা করব আমরা। দেখি, জংলীদের মধ্যে কিরকম প্রতিক্রিয়া হয় আমি অবশ্য অন্য একটা সম্ভাবনার কথাও ভাবছি।'

সকলে জানতে চাইল, 'কি সম্ভাবনা?'

সভাপতি অ্যাংগেলা প্রকাণ্ড কান দুটো নাড়তে নাড়তে বলল, 'কুয়াশা খুবই শক্তিশালী লোক। তার ক্ষমতা অতুলনীয়। তার মেধা, প্রতিভা, বুদ্ধি এবং সাহস ঈর্ষার বস্তু। তার মত দুর্লভ রত্নকে যদি আমরা দলে পাই তাহলে আমাদের ক্ষমতা হয়ে উঠবে আকাশচুম্বি।'

সকল দেবতা সানন্দে করতালি দিয়ে উঠল।

সভাপতি অ্যাংগেলা বললেন, 'প্রফেসর ওয়াই নামে আর একজন মহা বৈজ্ঞানিক আছে বন্দীদের মধ্যে। কুয়াশার মতই ভয়ঙ্কর ক্ষমতাবান সে। তবে লোকটার মাথায় গণ্ডগোল আছে। তাকে খতম করাই উচিত কাজ হবে। লোকটা এককথায়, হিংস্র বাঘ একটা। ওকে দলে গ্রহণ করার কথা ভাবা যায় না। বন্দীদের মধ্যে আরও আছে বিশ্ববিখ্যাত ডিটেকটিভ শহীদ খান এবং তার সহকারী কামাল আহমেদ। আছে বাংলাদেশের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের প্রখ্যাত অফিসার মি. সিম্পসন। কুয়াশার সহকারী স্যানন ডি. কস্টার কথা বলিনি, না? এই লোকটা দেখতে রোগা পটকা তালপাতার সেপাই হলে কি হবে, ভয় বলে কিছু নেই লোকটার মধ্যে। কুয়াশার নির্দেশে নিজেকে টুকরো টুকরো করে কাক চিলকে খাইয়ে দিতে পারে। আনুগত্য ছাড়াও লোকটার আর একটা গুণ হচ্ছে তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি। কিছুই ভোলে না লোকটা। দলে আছে মিসেস শহীদ এবং মিস ওমেনা। এই ওমেনা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। যতটুকু জানি, মিস ওমেনা এই পৃথিবীর মেয়ে নয়। সে নাকি অন্য এক গ্রহের রাজার মেয়ে। ওমেনা অনেক অস্বাভাবিক গুণের অধিকারিণী। এমনকি, সামনে কোন বিপদ আছে কিনা তা সে আগে থেকে বলে দিতে পারে। কুয়াশাকে

আমরা হত্যা করব এখবর ওমেনা হয়তো জেনে ফেলবে বা ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছে। আমার ইচ্ছা, ওকে সবার আগে হত্যা করা উচিত। অবশ্য এখনি নয়। জংলী রাজাদের প্রতিক্রিয়া দেখার পর সিদ্ধান্ত নেব আমরা।'

দেবতা ফেকরী কদ্দমের মুখটা হুবহু সিংহের মত। অবশ্য কণ্ঠস্বরটা তার একেবারে মিহি, মেয়েদের মত, 'আমার একটা প্রশ্ন আছে। বন্দীরা যদি ধনভাণ্ডারের দরজা ভাঙার চেষ্টা করে বা অন্য কোন উপায়ে নিজেদেরকে মুক্ত করার চেষ্টা করে তাহলে আমরা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব?'

উত্তর দিল নেকড়েমুখো রাঙাচা পাঙশি, 'দরজা ভাঙা সম্ভব নয়। দরজার ভিতর আছে স্টিলের পাত। তবু, যদি ভেঙেও ফেলে, লাভ হবে না কোন। প্রতিটি দরজার তিন হাত সামনে আছে স্টীল শাটার। এক একটা শাটার এক একটা দরজার মতই প্রকাণ্ড। মোটা ইস্পাত দিয়ে তৈরি শাটারগুলো। ভাঙা বা কেটে ফেলা সম্ভব নয়। মোটকথা, পালাবার কোন উপায় ওদের নেই। তাছাড়া টেলিভিশনে ওদের সকলকে দেখা যাচ্ছে, কিছু করার চেষ্টা করলে আমরা সাথে সাথে তা দেখতে পাব।'

দেবতা গটেন টট প্রশ্ন করল, 'আপনি বলছেন কুয়াশা সাংঘাতিক ক্ষমতাশালী লোক, তাকে দলে ভেড়াবার চেষ্টা করা হবে। ভাল কথা। তার সাথে কথা বলে দেখলে কেমন হয়?'

সভাপতি বলল, 'আসলে কুয়াশাকে হত্যা করা সম্ভব হলে আমরা কোনরকম ঝুঁকি নিতে চাই না।'

দেবতা রোহান কোরা বলে উঠল, 'বন্দীরা এক একজন ভয়ঙ্কর প্রকৃতির লোক। ওদের একসাথে রাখা কি উচিত হচ্ছে? আমার মতে, ওদেরকে আলাদা আলাদা ফেলে রাখাটাই সবদিক থেকে নিরাপদ হবে।'

সভাপতি দেবতা অ্যাংগেলা বলল, 'এব্যাপারে ভেবে দেখেছি আমি। ওরা কেউই সাধারণ মানুষ নয়, এক একজন এক একটা আগ্নেয়গিরি। ওদেরকে বেশি ঘাঁটাতে চাই না। ধনভাণ্ডার থেকে ওদেরকে স্থানান্তরিত করতে যাওয়া মানে ভয়ঙ্কর একটা ঝুঁকি নেয়া। একটু এদিক ওদিক হলেই ভীষণ কাণ্ড বাধিয়ে দেবে ওরা। আমি আগুন নিয়ে খেলা করতে চাই না। ওখানেই থাক ওরা। তেমন কিছু করছে দেখলে আমরা গ্যাস ছাড়ব। অজ্ঞান করে রাখব সবাইকে।'

সভাপতি অ্যাংগেলা সকলের দিকে একবার করে তাকাল। তারপর আবার কথা বলতে শুরু করল, 'কয়েকটা নির্দেশ দিচ্ছি আমি। সবাইকে মেনে চলতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমরা আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় বিপদের মুখোমুখি হয়েছি। এই বিপদের হাত থেকে মুক্ত হতে না পারলে আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাবে। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত, কেউ নিজের মুখোশ খুলবে না। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা সবাই মুখোশ পরে থাকবে। দুই নম্বর নির্দেশ,—প্রত্যেকেই নিজের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র রাখবে। অবশ্য অপ্রয়োজনে অর্থাৎ প্রাণ বাঁচাবার প্রয়োজন ছাড়া, কেউ বন্দীদেরকে গুলি করবে না। গুলি করলেও হত্যা করার জন্যে গুলি করা নিষেধ। প্রয়োজনে বন্দীদেরকে আহত করার জন্যে গুলি করা যেতে পারে। অবশ্য

আমি উপস্থিত থাকলে আমার কাছ থেকে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত গুলি করা চলবে না। তিন নম্বর নির্দেশ, —যে যার দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করে যাও। তোমাদের অধস্তন কর্মীদেরকে সতর্ক করে দাও। সবাই যেন যে-কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকে। ওদের সবাইকেও মুখোশ পরে থাকতে নির্দেশ দাও। সভা আজকের মত এখানেই শেষ হলো।'

সভাশেষে ভোজন পর্ব।

প্রকাণ্ড ডাইনিং রুমে গিয়ে বসল সবাই। ডাইনিং রুমের মাঝখানে মাঝারি আকারের একটা স্টেজ। স্টেজের পর্দাটা গাঢ় নীল রঙের। টেবিলের চারদিকে বসল দেবতারা। দেবতাদের কর্তা অ্যাংগেলা ডাইনিং রুমে প্রবেশ করেনি। হলরুম থেকে সরাসরি সে তার খাস কামরায় গিয়ে ঢুকেছে। অয়ারলেসে কথা বলছে সে তার বস্-এর সাথে। সুদূর ক্যালিফোর্নিয়া থেকে ভেসে আসছে তার বস্-এর যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর।

এই রহস্যপুরী কে বা কারা তৈরি করেছিল তা জানা যায় না, জানার কোন উপায় নেই। আফ্রিকার এই অঞ্চলে হয়তো বা কোন এক যুগে সভ্যতা ছিল, সভ্য মানুষ বসবাস করত, এ কীর্তি হয়তো তাদেরই।

রহস্যপুরী বর্তমানে যারা দখল করে আছে তারা জংলীদের কাছে দেবতা হিসাবে পরিচিত হলেও এরা আসলে একদল ঠকবাজ, লম্পট, লোভী অপরাধী ছাড়া আর কিছু নয়।

ক্যালিফোর্নিয়ায় এদের দলপতি থাকে। তার নির্দেশেই এরা পরিচালিত।

এই রহস্যপুরী আবিষ্কার করে সেই দলপতি, কার্ল শার্প হুড।

কার্ল শার্প হুড ওয়াশিংটনে বসবাস করত। ব্যবসা ছিল তার আফিম, গাঁজা, কোকেন অর্থাৎ নানা জাতের মাদকদ্রব্য চোরাচালান করা। পুলিস তার পিছু ধাওয়া করে। সে প্রায় পাঁচ বছর আগের কথা।

কার্ল পালিয়ে আসে দলবল নিয়ে আফ্রিকায়। গহীন জঙ্গলে শিকার করে দিন কাটতে থাকে তাদের। এইসময়েই তারা আবিষ্কার করে রহস্যপুরী।

জংলীরা শত শত বছর ধরে দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য রহস্যপুরীতে স্বর্ণ ও মহামূল্যবান পাথর রেখে যেত। শত শত মণ স্বর্ণ এবং পাথর জমা হয়েছিল রহস্যপুরীতে। কার্ল এবং তার দলবল সেই কোটি কোটি টাকার ধনরত্ন লুঠ করবার পরিকল্পনা নেয়।

কার্ল কিছু দিন পর সেই ধনরত্ন নিয়ে ফিরে যায় আমেরিকায়। ছদ্মবেশ নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় বসবাস করতে থাকে সে। নতুন ব্যবসা শুরু করে সেখানে। ব্যবসাটা স্বভাবতই স্বর্ণের।

কার্লের লোকজন এখন থাকে রহস্যপুরীতে। আশাতীত বেতন পায় এরা। এরা প্রত্যেকেই এক একজন কুখ্যাত অপরাধী। কার্ল বেছে বেছে কুখ্যাত অপরাধীদেরকেই এই রহস্যপুরীতে পাঠায়। বছরে দুইবার আসে কার্লের নিজস্ব মালবাহী প্লেন। সেই প্লেনে করে পাঠিয়ে দেয়া হয় সোনা এবং পাথর।

অপরাধীরা জংলীদের সামনে নরবলি দেবার সময় ছাড়া বের হয় না। কিন্তু

সর্বদা মুখোশ ব্যবহার করে এরা, কারণ, বলা তো যায় না, জংলীরা যদি হঠাৎ কাউকে দেখে ফেলে! মুখোশ পরা অবস্থায় দেখলে জংলীরা মানুষ বলে মনে না করে বরং দেবতা বলে মনে করবে—এই ভেবেই মুখোশের প্রচলন হয়েছিল এদের মধ্যে।

অপরাধীরা মিথ্যে ভাবেনি। সত্যি জংলীরা এদের দু'একজনকে দৈবাৎ দেখে ফেলেছে।

এদিকে ডাইনিং হলে সুন্দরী মেয়েরা পরিবেশনের কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। দামী পোশাক পরা পরিচারিকারা টেবিলে টেবিলে সাজিয়ে রাখছে সুস্বাদু খাদ্যবস্তু। হরেক রকম মদ, বিভিন্ন প্রাণীর রান্না করা মাংস, সুস্বাদু ফল, ইংলিশ এবং চায়নিজ ডিশ—টেবিল ভরে উঠল দেখতে দেখতে। এমন সময় দেবতা অ্যাংগেলা প্রবেশ করল ডাইনিং হলে। সকলের মুখোমুখি একটি আসনে বসল সে। বেজে উঠল দ্রুত তালে ইংরেজি বাজনা। ধীরে ধীরে সরে গেল স্টেজের পর্দা।

মঞ্চে দেখা যাচ্ছে অপূর্ব সুন্দরী মেয়েদেরকে। তারা নাচতে শুরু করল।

ভোজনপর্ব শুরু হলো। সময় বয়ে যাচ্ছে। দ্রুত থেকে দ্রুততর তালে বাজছে বাজনা। নর্তকীরা উদ্দাম তালে নাচছে।

দেবতারা আনন্দ উল্লাসে চিৎকার করে উঠছে থেকে থেকে। গ্লাসে ঢেলে দিচ্ছে পরিচারিকারা দামী মদ।

দেবতারা মাতাল হয়ে উঠছে।

ডাইনিং হলে ভীষণ উল্লাসে ফেটে পড়ছে দেবতার ছদ্মবেশে কুৎসিত শয়তানের দল। মঞ্চে অশ্লীল ভঙ্গিতে নাচছে নর্তকীরা।

সময় বয়ে চলেছে। ভোর হতে চলল। মাতাল শয়তানরা হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ করে হাসছে। এমন সময় বেজে উঠল সাইরেন।

থেমে গেল বাজনা। থেমে গেল নাচ। বন্ধ হলো বোতল থেকে গ্লাসে মদ ঢালা। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ব্যস্ত পরিচারিকার দল। ছদ্মবেশী শয়তানরা চমকে উঠল। কেটে গেল তাদের নেশার ঘোর।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সবাই। সব শব্দ থেমে গেছে। সবাই অধীর, উত্তেজিত। সবাই তাকিয়ে আছে দরজার দিকে।

অপেক্ষার পালা শেষ হলো একমুহূর্ত পরই। শূকরের মুখোশ পরা মেসেঞ্জার ঢুকল ডাইনিং রুমে।

সে ঘোষণা করল, 'জংলীদের একটি দল এসে হাজির হয়েছে। মণ দুয়েক স্বর্ণ, চারজন বন্দীসহ নিয়ে এসেছে অশুনতি পশু।'

অ্যাংগেলা তার প্রকাণ্ড কান দুটো নাড়তে নাড়তে কর্কশ কণ্ঠে নির্দেশ জারি করল, 'রাঙাচা পাঙাশি, গটেন টট, জেমবালা ধুরী—তোমরা দেবতা রোটেনহেপো হেমনোসান ক্যান ক্যান-এর পাদমূলে জংলীদের বন্দীদেরকে বলি দেবে আজ। জংলীদের থাকার ব্যবস্থা করো গে হিরোশা হালা এবং তানতবলা ডুমা। আর বেয়াকানা জীরন ও মালায়কা হোদানা, তোমাদের দু'জনের ওপর দায়িত্ব রইল জংলীদের শরীরে তাজা রক্ত মাখিয়ে দেবার।'

নির্দেশ পেয়ে বেরিয়ে গেল সবাই।

দেব-মূর্তি রোটেনহেপো হেমনোসান ক্যান ক্যান-এর পাদমূলে জংলীরা জমায়েত হয়েছে।

রাঙাচা পাঙাশি, গটেন টট এবং জেমবালা ধুরী উপস্থিত হলো সেখানে। গটেন টটের হাতে প্রকাণ্ড একটা ভোজালি।

জংলীরা বন্দীদেরকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। হঠাৎ তারা সিংহমুখো, ভাল্লুক-মুখো এবং ঘোড়ামুখো দেবতাদেরকে দেখে মেঝের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বিকট এবং দুর্বোধ্য স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করতে শুরু করল।

রাঙাচা পাঙাশি এবং জেমবালা ধুরী হাত-পা বাঁধা বন্দীদেরকে প্রকাণ্ড দেব-মূর্তি রোটেনহেপো হেমনোসান ক্যান ক্যান-এর পাদমূলে জোর করে ধরে শুইয়ে দিল।

বন্দীদের চারজনই শ্বেতাঙ্গ। তারা এসেছিল আফ্রিকার জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে। ঘটনাচক্রে মাস সাতেক আগে তারা ধরা পড়ে জংলীদের হাতে। জংলীরা গত সাত মাস তাদেরকে বন্দী করে রেখেছে। শিকারীরা নিজেদের প্রাণের মায়া অনেক আগেই ত্যাগ করেছে। ওরা ছিল স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। সেই চেহারা আজ আর নেই। রোগা, হাড্ডিসার হয়ে গেছে সবাই। দাড়ি গোঁফ গজিয়েছে লম্বা লম্বা। বুনো পশুদের মত হয়ে উঠেছে হাত পায়ের নখ।

গটেন টট এগিয়ে গেল।

রাঙাচা পাঙাশি বিকট স্বরে গর্জে উঠে কি যেন বলল জংলীদের ভাষায়।

জংলীরা মাথা তুলল। উঠে বসল সবাই একে একে। একটা দরজা খুলে গেল। সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করল গরুমুখো এবং বানরমুখো দুই ছদ্মবেশী শয়তান। এই সব শয়তান জংলীদের কাছে দেবতা হিসেবে পরিচিত। এরা দেবতা বেয়াকানা জীরন এবং মালায়কা হোদানা।

বন্দীরা করুণ চোখে তাকিয়ে আছে।

বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ছে জংলীরা। গটেন টটের হাতে ধারাল, চকচকে ভোজালি। বন্দীরা সবাই বুঝতে পারছে। তাদেরকে হত্যা করা হবে এখানে। গত সাত মাস ধরে এই কারণেই তাদেরকে বন্দী করে রেখেছিল জংলীরা।

গটেন টট একজন বন্দীর উদ্দেশ্যে মাথার উপর ভারি ভোজালিটা তুলে ধরল।

মৃত্যুপথযাত্রী নিরীহ বন্দী আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। সেই চিৎকার শয়তান গটেন টটের হৃদয়ে এতটুকু দয়ামায়ার সঞ্চার করল না।

নেমে এল ভোজালি। বন্দীর আতঙ্কিত চিৎকার অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে তার দেহ। ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে তার মুণ্ডুটা।

রক্তের বন্যা বইছে দেব-মূর্তি রোটেনহেপো হেমনোসান ক্যান ক্যান-এর পাদদেশে।

গরুমুখো এবং বানরমুখো শয়তান অর্থাৎ বেয়াকানা জীরান ও মালায়কা হোদানা সেই তাজা উষ্ণ লাল রক্ত আঁজলা ভরে তুলে নিয়ে ছিটিয়ে দিল জংলীদের মাথা লক্ষ্য করে।

জংলীরা জয়ধ্বনি করে উঠল।

এবার গটেন টট এগিয়ে গেল দ্বিতীয় বন্দীর দিকে।

বন্দী বোকার মত তাকিয়ে আছে। হঠাৎ সে গগন বিদারী কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল।

কিন্তু কে তার চিৎকারে কান দেয়! এর নাম রহস্যপুরী। রহস্যপুরীর নির্মম শয়তানদের খপ্পরে এসে পড়েছে তারা। এখান থেকে, এদের হাত থেকে বাঁচার কোন উপায় নাই।

আজ পর্যন্ত কেউ বেঁচে ফিরে যেতে পারেনি।

তিন

প্রফেসর ওয়াইকে ঘিরে বসেছে তার স্বাস্থ্যবান অনুচরবৃন্দ। সবার মাঝখানে প্রফেসর ওয়াই। তাকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। প্রফেসর স্বয়ং এবং তার দলের লোকেরা অস্ত্রগুলো মেরামতের কাজে ব্যস্ত।

ব্যস্ত কুয়াশাও। একের পর এক অস্ত্র মেরামত করছে সে।

শহীদ কামাল এবং ডি. কস্টার কাঁধে চড়ে ধন-ভাণ্ডারের গোলাকার ইস্পাত নির্মিত দেয়ালগুলো পরীক্ষা করা শেষ করেছে। শেষ করেছে প্রতিটি দরজার নিম্নভাগ থেকে উর্ধ্ব ভাগ পরীক্ষা করার কাজ। গোপন টিভি ক্যামেরার হদিস পায়নি ও।

মাথার উপরকার মস্ত লোহার ঢাকনিটার সাথে টিভি ক্যামেরা ফিট করা আছে বলে সন্দেহ হলো ওর। কিন্তু সেখানে পৌঁছানো অসম্ভব। পাঁচ ছয় মানুষ উঁচুতে সেই ঢাকনি, উঠবে কিভাবে অত উপরে?

শহীদ ঘোষণা করল, 'আমি ব্যর্থ। লুকানো টিভি ক্যামেরার খোঁজ পাচ্ছি না।'

সবাই আশা করল প্রফেসর ওয়াই এ ব্যাপারে তার মতামত দেবে। কিন্তু প্রফেসর ওয়াই বা তার অনুচরেরা যেন শহীদের কথা শুনতেই পায়নি। আপন মনে তারা সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত।

কুয়াশা মুখ তুলে তাকাল। চোখাচোখি হলো শহীদের সাথে। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পরমুহূর্তে ডি. কস্টার দিকে তাকাল কুয়াশা। তারপর শহীদের উদ্দেশ্যে বলল, 'করার কিছু নেই। দেবতারা আমাদেরকে দেখছে, দেখুক। যখন মনে করব আমাদের গতিবিধি ওদেরকে দেখতে দেয়া উচিত নয় তখন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা যাবে। চিন্তা কোরো না।'

ডি. কস্টা ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। এক পা দু'পা করে কক্ষটার দূর প্রান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। প্রফেসর ওয়াইকে দেখতে পাচ্ছে সে। মাথা নিচু করে প্রফেসর ওয়াই বিড় বিড় করে কি যেন বলছেন।

হঠাৎ একজন অনুচর প্রফেসরের উদ্দেশ্যে কিছু বলল। অনুচরটি ডি. কস্টাকে এগিয়ে আসতে দেখে ফেলেছে। ঝট করে প্রফেসর ওয়াই মাথা তুলে শিরদাঁড়া সোজা করে বসল। দ্রুত কি যেন ঢুকিয়ে ফেলল সে পরনের বাঘের চামড়ার

অন্তরালে।

'মি. ডি. কস্টা যে! আসুন আসুন! কি মনে করে হঠাৎ এদিকে? আপনাদের অস্ত্রগুলো মেরামতের কাজ কতদূর এগোল বলুন দেখি?'

ডি. কস্টা গম্ভীর। বাঁকা চোখে তাকিয়ে আছে সে প্রফেসরের কোলের দিকে।

'প্রফেসর! সট্টিকঠা বলিবেন। হাপনি মিঠ্যা কঠা বলিলে দোজখে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবেন। বাঘের চামড়ার ভিটর ঝটপট কি লুকাইলেন বলুন টো?'

'লুকিয়েছি? কি লুকিয়েছি? ইয়ার্কি মারা হচ্ছে, না? ও, বুঝেছি, ঠাট্টা মস্করা করছেন! হাঃ হাঃ হাঃ হা…।'

প্রফেসর প্রথমে গর্জে উঠলেও হঠাৎ সে গলা ছেড়ে কর্কশ বিকট কণ্ঠে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল।

ডি. কস্টা তার সরু গলা সপ্তমে চড়িয়ে গর্জে উঠল। রেগে উঠেছে সে, 'স্টপ! স্টপ! ঠামান হাপনার ব্যর্থ অভিনয়! মাই গড, ডোজখের ভয় নাই হাপনার। কী ডেঞ্জারাস আদমি বাপ্! পাক্কা বডমাশ, ডিনকে রাট করিয়া ফেলিটে পারে। হামি উইথ মাই ওউন আইজ ডেকিলাম কি যেন একটা জিনিস লুকাইয়া ফেলিলেন। অঠচ ডিনাই করিটেছেন ডিব্যি!'

প্রফেসর হাসি থামিয়ে বলল, 'মি. ডি. কস্টা, বয়স তো আর কম হলো না আপনার। তাই চোখে ছানি পড়া বিচিত্র কিছু নয়। কি দেখতে কি দেখেছেন। যাক, মাফ করে দিলাম আপনাকে। সত্যি আমি কিছু মনে করিনি।'

ডি. কস্টা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, 'লে বাবা! প্রফেসর ডেকটি বড্ড চালাক! হয় কে নয় করিটে এক নম্বরের ওস্টাড! বাট হামার চোখে ঢুলো ডিটে পারেন নাই! প্রফেসর!'

'বলুন।'

'ডয়া করিয়া ভড্ডরলোকের মটো একবার সোজা হইয়া উঠিয়া ডাড়ান টো ডেকি। টাহা হইলেই প্রমাণ হইয়া যাইবে হাপনি হাপনার পরনের বাঘের চামড়ার ভিটর কিছু লুকাইয়া রাখিয়াছেন কিনা?'

প্রফেসর এবার খেপে উঠল, 'কী! এতবড় কথা! আপনার সন্দেহ দূর করার জন্য আমাকে উঠে দাঁড়াতে হবে! ইউ ননসেন্স! সরে যান বলছি সামনে থেকে।'

হঠাৎ হেসে উঠল ডি. কস্টা খিকখিক করে।

'হোয়াট! সাহস তো কম নয় পাটখড়ির। হাসি থামিয়ে দেব বলছি চিরকালের জন্য…।'

কথা বলতে বলতে প্রফেসর কোলের ভিতর থেকে পেট মোটা বোতলের মত দেখতে রেডিও সেটটা বের করে পাচার করে দিল তার সামনে বসা একজন অনুচরের কোটের পকেটে।

চোখ বুজে দুলে দুলে বেদম হাসছে ডি. কস্টা।

এদিকে থরথর করে কাঁপছে প্রফেসর ওয়াই। যেন রাগে উন্মাদ হয়ে গেছে। মারমুখো হয়ে ডি. কস্টার দিকে এক পা এগিয়ে এল সে।

হাসি থামল ডি. কস্টার। সকৌতুকে চেয়ে রইল প্রফেসরের দিকে কয়েক

মুহূর্ত। তারপর বলে উঠল, 'সাচে কি হাপনাকে হামি অ্যাবসেন্ট মাইণ্ডেড প্রফেসর বলি! ওহ্ প্রফেসর, সট্টিসট্টি হাপনি আজব এক চীজ। আরে, হামি টো হাপনার সাথে ঠাট্টা মস্করা করিটেছিলাম। আশ্চর্য ব্যাপার, হাপনি হাস্য-কৌটুকও বোঝেন না!'

প্রফেসর গলে পানি হয়ে গেল নিমেষে।

'ও, তাই বলুন। হেঃ হেঃ হেঃ, সত্যিই স্বীকার করি, আপনার রসিকতা করার ক্ষমতা অসাধারণ। যাক, কিছু মনে করবেন না। নীরস লোক আমি, আপনার রসিকতা ঠিক ধরতে পারিনি।'

ডি. কস্টা একগাল হেসে বলে উঠল, 'মনে করিবার কিছু নাই। হাপনি হামার ব্রাদার। হামি আপনার ব্রাদার। আসুন, হামরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া বন্ধুত্বটা পাকাপোক্ত করিয়া লই।'

কথাটা বলে ডি. কস্টা প্রফেসরের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে দিল। প্রফেসর সানন্দে ডি. কস্টাকে জড়িয়ে ধরল নিজের বুকের সাথে।

মাত্র এক মুহূর্ত, তারপরই চেঁচিয়ে উঠল ডি. কস্টা, 'মাই গড! মরিয়া গেলাম। ছাড়িয়া ডিন! ফর গডস সেক, ছাড়িয়া ডিন হামাকে! বাপরে কী শক্ট হাপনার বুক!'

প্রফেসর হাসতে হাসতে ছেড়ে দিল ডি. কস্টাকে।

হাঁপাচ্ছে ডি. কস্টা। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে তার। বোকার মত চেয়ে আছে সে প্রফেসরের দিকে।

'মাই গড! হাপনার শরীর অটো কঠিন কেন বলুন টো? লোহা দিয়া টৈরি নাকি?'

হোঃ হোঃ শব্দে হেসে উঠল প্রফেসর ওয়াই। ডি. কস্টা পিছিয়ে এল। বলল, 'না পলায়ন করি। লাইফে আর কোনডিন হাপনার সাঠে কোলাকোলি করিব না। হামার শখ মিটিয়া গেছে। আর একটু হইলে প্রাণটা বাহির হইয়া যাইট।'

শহীদ এবং কামাল কক্ষের অপরপ্রান্ত থেকে গোটা ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল।

ফিসফিস করে কথা বলে উঠল শহীদ। 'কামাল লক্ষ্য করলি?'

'কি বল তো?'

'চোখে পড়েনি কিছু?'

কামাল ভুরু কুঁচকে তাকাল শহীদের দিকে, 'না তো। তুই কি প্রফেসরের অভিনয়ের কথা বলছিস? তা যদি জানতে চাস—হ্যাঁ, লক্ষ করেছি। প্রফেসর সত্যি কিছু একটা লুকিয়ে ফেলেছিল কোলের ভিতর। সেটা সে পাচার করে দিয়েছে তার নিজের একজন লোকের কাছে। তবে জিনিসটা কি তা আমি দেখতে পাইনি।'

শহীদ মৃদু হেসে বলল, 'না, আমি প্রফেসরের অভিনয়ের কথা বলছি না। প্রফেসরের অভিনয় তো ধরা পড়ে গেছে। এমন কি ডি.কস্টার চোখকেও সে ফাঁকি দিতে পারেনি। আমি বলছি প্রফেসরের নয়, ডি. কস্টার অভিনয়ের কথা।'

'কী বলছিস তুই? ডি. কস্টা আবার অভিনয় করল কোনখানটায়?'

শহীদ বলল, 'তুই আসলে দেখতে পাসনি। কিন্তু আমি পরিষ্কার দেখতে পেয়েছি। ব্যাপারটা ঘটেছে ওরা যখন পরস্পরকে আলিঙ্গন করছিল তখন।'

'কি ঘটেছে?'

শহীদ বলল, 'ডি. কস্টা আলিঙ্গন করার সময় প্রফেসরের মাথার মুকুটের ওপর ছোট্ট একটা জিনিস ফেলে দিয়েছে।'

'বলিস কি!'

'হ্যাঁ। জিনিসটা কি তা আমি দেখিনি। তবে আমার ধারণা কুয়াশার ইঙ্গিতেই জিনিসটা ডি. কস্টা প্রফেসরের মুকুটে রেখে এল।'

কামাল বলল, 'তারমানে কুয়াশা প্রফেসরকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না? কিন্তু জিনিসটা কি হতে পারে?'

'বিশ্বাস তো আমিও করি না প্রফেসরকে। কুয়াশাও বিশ্বাস করে না। জিনিসটা? কী জানি, ওটা হয়তো মিনি মাইক্রোফোন। প্রফেসর তার অনুচর বা ওয়্যারলেস কিংবা রেডিওর সাথে কি কথা বলে তা হয়তো জানতে চায় কুয়াশা। মিনি মাইক্রোফোনটা হয়তো ট্র্যান্সমিটারের কাজ করবে। কুয়াশার রিসিভিং সেটে ধরা পড়বে প্রফেসরের কথাগুলো।'

কামাল কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই গমগম করে উঠল লাউডস্পীকারের মাধ্যমে ভরাট একটা কণ্ঠস্বর।

'দেবতা রোটেনহেপো হোমনোসান ক্যান ক্যান-এর নগণ্য সেবক কথা বলছি আমি। আপনারা বন্দী হয়েছেন কেন তার কারণ আগেই জানানো হয়েছে। রহস্যপুরীর পবিত্রতা নষ্ট করেছেন আপনারা। দেবতারা ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আপনাদের এই গুরুতর অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। বিনা বিচারে আপনাদেরকে হত্যা করা হবে এই সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম আমরা। দেবতা রোটেনহেপো হেমনোসান ক্যান ক্যান-এর সেবকবৃন্দ আমরা আপনাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে নতুন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তা হলো এই যে, বিনা বিচারে আপনাদেরকে হত্যা করা হবে না। এখন থেকে চব্বিশ ঘন্টা পর অর্থাৎ আগামীকাল সকাল আটটার সময় আপনাদের সকলের বিচার হবে। আমরা একমত হয়ে যে রায় দেব তাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। বিচারে আপনাদের মৃত্যুদণ্ড নাও হতে পারে। আপনারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবেন। বিচারের রায়ে যদি আপনারা নির্দোষ প্রমাণিত হন তাহলে সসম্মানে মুক্তি দেয়া হবে আপনাদেরকে। আমাদের তরফ থেকে আপনাদের প্রতি নির্দেশ এবং অনুরোধ, আপনারা দয়া করে কোন রকম কৌশল বা চালাকীর আশ্রয় নেবেন না। আপনাদের গতিবিধির ওপর আমরা সারাক্ষণ নজর রাখছি। আপনারা যাই করুন, আমরা তা দেখতে পাব। ভুলে যাবেন না, এই রহস্যপুরী থেকে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কোন দিন পালাতে পারেনি, আপনারাও পারবেন না। চেষ্টা করা বৃথা। আমাদের সাবধান বাণী সত্ত্বেও আপনারা যদি সেরকম কোন চেষ্টা করেন তাহলে লাভবান তো হবেনই না, বরং বিচারের রায় তার ফলে আপনাদের বিরুদ্ধে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আপনারা অপরিচিত ছোটখাট অস্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। বিশ্বাস করুন, আপনাদের বোকামি দেখে হাসি পাচ্ছে। ওই সব ছেলে ভুলানো অস্ত্রের সাহায্যে রহস্যপুরী থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।'

দেবতা রোটেনহেপো হেমনোসান ক্যান ক্যান-এর সেবক দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করল, 'ছেলেমানুষি ত্যাগ করুন। আমাদের পরামর্শ নিন। তাতে লাভ বই লোকসান হবে না আপনাদের। অস্ত্রগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিন এক কোনায়। চুপচাপ অপেক্ষা করুন। খানিক পর উপর থেকে পানীয় জল এবং ব্রেকফাস্টের জন্য প্রচুর খাবার নামিয়ে দেয়া হবে নিচে। খাওয়া দাওয়া করুন, আর দেবতার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে প্রার্থনা করুন। দেবতা সন্তুষ্ট হলে আপনারা অবশ্যই মুক্তি পাবেন, ফিরে যেতে পারবেন নিজেদের দেশে। আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি। আপনারা কি করবেন না করবেন ভেবে দেখুন। অস্ত্রগুলো আপনারা ফেলে দিয়েছেন দেখলেই আমরা আপনাদের জন্য খাবার নামাবার ব্যবস্থা করব। সুপ্রভাত। দেবতা রোটেনহেপো হেমনোসান ক্যান ক্যান আপনাদের সুমতি দিন এবং আপনাদের সহায় হোন।'

দেবতার সেবক তার ভাষণ শেষ করল।

উঠে দাঁড়াল কুয়াশা।

'ওয়াই!'

প্রফেসর ওয়াই মাথা নিচু করে আগের মত তার রেডিওর সাথে কথা বলছিল এতক্ষণ। লাউডস্পীকারের মাধ্যমে এতক্ষণ যা বলা হলো তা সে শোনেনি, শোনার চেষ্টাও করেনি। সে ছিল তার নিজের কাজে ব্যস্ত। কুয়াশার ডাকে মাথা তুলে তাকাল সে।

'বলুন।'

কুয়াশা বলল, 'তোমার অস্ত্র মেরামত হয়েছে সব?'

'প্রায় সব।'

কুয়াশা বলল, 'গুড। আর দেরি করার কোন মানে হয় না। এবার আমরা কাজে হাত দিতে চাই। দরজা ভাঙা যাবে না তা আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি। তা না যাক। আমার অটোমেটিক করাত দিয়ে দরজার কবাটের কাঠ কেটে ফেলতে হবে। মানুষ যাবার মত খানিকটা কেটে এই বন্দীখানা থেকে আগে বেরুতে চাই আমরা। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে। তুমি কি বলো?'

'আপনার আইডিয়াটাই বেস্ট। আমি সমর্থন করি আপনাকে।'

কুয়াশা বলল, 'কাজ শুরু করার আগে আর একটা ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। শত্রুরা আমাদের ওপর নজর রাখছে। আমরা দরজা কাটছি দেখতে পেলে ওরা পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সুতরাং, আমরা কি করছি তা যাতে ওরা দেখতে না পায় তার ব্যবস্থা করতে হয়।'

'কিন্তু তা কি সম্ভব?'

কুয়াশা বলল, 'সম্ভব। এই দেখো।' কথাটা বলেই কুয়াশা পকেট থেকে মারবেল আকৃতির একটা স্মোক বম বের করে সজোরে ছুঁড়ে দিল উপর দিকে।

পাঁচ-ছয় মানুষ সমান উঁচুতে মস্ত ঢাকনির গায়ে গিয়ে লাগল বমটা! সাথে সাথে বিস্ফোরিত হলো সেটা। চোখের পলকে ধূসর রঙের ধোঁয়ায় উপরিভাগটা ভরে উঠল।

ক্রমে ঢাকা পড়ে গেল ঢাকনিটা। সকলের মাথার উপর যেন ভাসছে একটা মেঘের টুকরো। অনড়, নিশ্চল।

কুয়াশার গলা শুনে সবাই দৃষ্টি নামাল, 'এই ধোঁয়া ওপরেই থাকবে, নিচের দিকে নেমে আসবে না। তবু, আমাদের সকলের উচিত মুখোশ পরে নেয়া।'

পকেট থেকে অনেকগুলো মুখোশ বের করল কুয়াশা। প্রত্যেকের হাতে দিল একটা করে। রবারের মুখোশ। ভিতরটা ফাঁপা। কুয়াশা বলল, 'যে-কোন বিষাক্ত পরিবেশে এই মুখোশ অদ্ভুত কাজ দেয়। সবচেয়ে মজার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর অক্সিজেন উৎপাদন করার ক্ষমতা। পরে নাও সবাই।'

সবাই এমনকি প্রফেসর এবং তার অনুচরেরাও পরে নিল একটি করে মুখোশ।

'শত্রুরা আমাদেরকে এখন আর দেখতে পাচ্ছে না। এবার আমরা কাজ শুরু করতে পারি। তবে, সবাই সাবধান থেকো। আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না বলে ওরা নিশ্চয়ই পাল্টা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বলা যায় না, গরম পানি ছেড়ে দিয়ে এই জায়গাটা ভরে দেবার ব্যবস্থাও করতে পারে। সবাই মরব তাহলে এখানে। বুঝতেই পারছ, যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদেরকে। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি স্মোক বম ফাটিয়ে দিয়ে।'

শহীদের হাতে একটা স্বয়ংক্রিয় করাত দিল সে। জিনিসটা একটা সিগারেটের প্যাকেটের মত দেখতে।

'এটার উল্টো দিকটা চেপে ধরবে তুমি দরজার কবাটের গায়ে। বোতাম টিপলেই ধারাল ব্লেড সেকেণ্ডে তিনশো বাটবার ঢুকবে আর বেরুবে। খুব জোরে চেপে ধরে রাখবে তুমি যন্ত্রটা দরজার গায়ে। আপনাআপনি কাটতে থাকবে কাঠ। তুমি শুধু একটু একটু করে সরিয়ে নিয়ে যাবে চেপে ধরে রেখে। যেদিকে সরাবে সেদিকেই কাটবে।'

প্রফেসর ওয়াই ঘন ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল, 'আপনি এ দায়িত্ব মি. শহীদকে দিচ্ছেন কেন? আপনি কি করবেন তাহলে?'

কুয়াশা বলল, 'আমার হাতে অনেক কাজ। সবচেয়ে জরুরী কাজ হলো, ওয়্যারলেসটা মেরামত করা। রেডিও সিগন্যাল পাঠাতে পারছি না। তুমি বোধহয় জানো না ওয়াই, আফ্রিকায়ও আমার একটা আস্তানা আছে। নাইজেরিয়ার এক পাহাড়ে অনেকদিন ছিলাম। সেখানে আধুনিক একটা আস্তানা গড়ে তুলেছিলাম। সেখানে আমার বিমানবাহিনীর শাখাও আছে। রেডিওর সাহায্য পেলে একটা বিমান নিয়ে আসার চেষ্টা করতে পারি এখানে বসে বসেই। দেখি, কতদূর কি করতে পারি।'

শহীদ ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। তার আশেপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে সবাই। শুধু প্রফেসর এবং তার অধিকাংশ অনুচর ছাড়া। প্রফেসর নিজের জায়গায় গিয়ে বসেছে। তাকে ঘিরে বসে আছে অনুচরবৃন্দ। প্রফেসর মাথা নিচু করে পেট মোটা রেডিওর সাথে কথা বলছে বিড় বিড় করে, যাতে আর কেউ তার কথা শুনতে না পায়।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে মুচকি হাসল শুধু কুয়াশা। পর মুহূর্তে সে তার কাজে মগ্ন

হয়ে পড়ল।

চার

আশায় ভরে উঠেছে সকলের বুক। কুয়াশার স্বয়ংক্রিয় করাত যাদুমন্ত্রের মত কাজ করছে। দরজার কবাটের কাঠ, ইস্পাতের পাতসহ দ্রুত কেটে ফেলছে।

দশ মিনিটের মধ্যে উদ্দেশ্য পূরণ হলো। গোল করে কাটা হয়েছে কবাটের মাঝখানে। একজন মানুষ অনায়াসে গলে যেতে পারে।

মাথা নিচু করে ফাঁকটা দিয়ে দরজার ওপারে চলে গেল সবার আগে শহীদ ও তার পিছু পিছু কুয়াশা স্বয়ং।

'সর্বনাশ! এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ হয়ে গেল দেখছি!'

ব্যাপারটা কুয়াশাও দেখেছে। দরজার কাছ থেকে হাত তিনেক দূরেই দেখা যাচ্ছে আর একটা দরজা। সম্পূর্ণ স্টীলের।

'এটা আসলে মূল দরজার শাটার। শহীদ, শত্রুরা বোকা নয়। যাক, নিরাশ হবার কিছুই নেই। এই করাত দিয়েই কাটা যাবে স্টীলের দরজা। তবে সময় লাগবে কিছু বেশি। হাত পা গুটিয়ে বসে না থেকে তুমি তোমার কাজ শুরু করে দাও। আমি আমার রেডিওটা সেরে ফেলেছি, মেসেজ পাঠাবার কাজটা শেষ করে ফেলি এবার।'

'তাই যাও।'

শহীদ নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করল। এবার আর কাঠ কাটার কাজ নয়, স্টীল কাটার কাজ।

এক ইঞ্চি কাটতেই সময় লাগল পনেরো মিনিট। মনে মনে হিসেব কষতে গিয়ে নিরাশ হলো শহীদ। মানুষ যাবার মত ফাঁক চাই। অতটা কাটতে সময় লাগবে অন্তত পাঁচ সাত ঘন্টা। এত সময় কি দেবে শত্রুরা? তাছাড়া এই স্টীলের দরজা কাটার পর সামনে আবার কিসের বাধা পাওয়া যাবে তাই বা কে জানে। তবু, অত কথা ভাবলে কোন কাজই হবে না।

কাজ করে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ, ফলাফল কি হবে সেটা পরে দেখা যাবে।

হঠাৎ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল প্রফেসর ওয়াই ধনভাণ্ডারের ভিতর থেকে। ব্যাপার কি? হাতের কাজ বন্ধ করে কান পাতল শহীদ। দরজার ফাঁক দিয়ে গলে দেখে আসবে নাকি একবার? পর মুহূর্তে কাজে মন বসাল ও। পাগল প্রফেসর অকারণেই হয়তো হাসছে। খামোকা সময় নষ্ট করে দেখতে যাওয়ার কোন মানে হয় না। তেমন কিছু ঘটলে কুয়াশা ওকে ডাকবে।

'শহীদ!'

কুয়াশার ডাক। গলার স্বর শুনেই শহীদ বুঝতে পারল মারাত্মক কিছু একটা ঘটছে। প্রফেসর কোন ষড়যন্ত্র করেনি তো? শহীদের মনে প্রথমেই প্রশ্নটা দেখা দিল।

দরজার ফাঁক গলে ভিতরে ঢুকল শহীদ। ঢুকে দেখল সবাই উপর দিকে মুখ তুলে কি যেন দেখছে।

'দেখছ?' প্রশ্ন করল কুয়াশা।

শহীদ উপর দিকে তাকিয়ে দেখল স্মোক বমের ধূসর রঙের ধোঁয়া গোলাপি হয়ে গেছে। দ্রুত বদলাচ্ছে ধোঁয়ার রঙ। টকটকে লাল হয়ে উঠছে ক্রমশ।

'ব্যাপারটা কি?' শহীদ প্রশ্ন করল অবাক হয়ে।

উত্তর দিল প্রফেসর, 'মি. কুয়াশার স্মোক বম্ব থেকে বেরিয়েছে এই ধোঁয়া। এ এমনই ধোঁয়া, যে ধোঁয়া নিজের রঙ বদলাতে পারে। মানে, টেকনিকালার ধোঁয়া, বহুরূপী।'

কথাগুলো বলেই হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল প্রফেসর ওয়াই।

'থামো তুমি!' ধমকে উঠল কুয়াশা। তাকাল সে শহীদের দিকে। বলল, 'শহীদ, বিপদ নেমে আসছে। শত্রুরা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে। বিষাক্ত গ্যাস ছাড়ছে ওরা ওপর থেকে।'

মহুয়া কুয়াশার পাশ থেকে বলে উঠল, 'সে কি!'

'ভয় পাসনে বোন। গ্যাস যতই বিষাক্ত হোক, যতক্ষণ মুখোশ পরে থাকব আমরা ততক্ষণ ভয়ের কিছু নেই।'

ওরা আলোচনা করছে, সেই ফাঁকে প্রফেসর ওয়াই আবার কক্ষের দূর প্রান্তে ফিরে গেছে। তার অনুচরদের মাঝখানে বসেছে সে। তাকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। মাথা নিচু করে কথা বলছে সে রেডিওর সাথে। চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে কাউকে যেন জরুরী কোন নির্দেশ দিচ্ছে সে।

কামালের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কুয়াশা, ওপর দিকে চেয়ে দেখো। গ্যাস নেমে আসছে নিচের দিকে।'

সবাই আবার তাকাল উপর দিকে। সত্যিই তাই। ঘন লাল ধোঁয়া ধীরে ধীরে নেমে আসছে নিচের দিকে।

'শহীদ তোমার কাজে তুমি ফিরে যাও!' কুয়াশা বলে উঠল। শহীদ দরজার ফাঁক গলে বেরিয়ে গেল কক্ষ থেকে। কুয়াশা পকেট থেকে রেডিও সেটটা বের করে মেসেজ পাঠাতে শুরু করল তার নাইজেরিয়ার আস্তানার উদ্দেশ্যে।

মুখোশ পরে থাকা সত্ত্বেও সবাই ভয় পাচ্ছে। গ্যাস নেমে আসছে নিচে। কি রকম গ্যাস কে জানে। শত্রুরা হয়তো খুন করার জন্যই ছেড়েছে এই গ্যাস। মুখোশের দ্বারা কতক্ষণ ফাঁকি দেওয়া সম্ভব বিষাক্ত গ্যাসকে? চারদিকের আবহাওয়া বা বাতাস যদি বিষাক্ত হয় তাহলে কি মুখোশের সাথে ফিট করা অক্সিজেন তৈরি করার যন্ত্রটা নির্ভেজাল অক্সিজেন তৈরি করতে পারবে? না, তা সম্ভব নয়। তাছাড়া গ্যাসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেও কি মৃত্যুকে এড়ানো যাবে? শত্রুরা নিশ্চয়ই টের পাবে, গ্যাস কোন ক্ষতিই করতে পারেনি তাদের। টের পাওয়া মাত্র তারা নতুন উপায়ে হত্যা করার ব্যবস্থা করবে। হয়তো কুয়াশার আশঙ্কা সঠিক প্রমাণিত হবে। শত্রুরা হয়তো গরম পানি ছেড়ে দেবে, ভরাট করে দেবে এই কক্ষটা। সবাইকে মরতে হবে অসহায় অবস্থায়।

রেডিও মেসেজ পাঠাবার কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। সকলের উদ্দেশ্যে বলল, 'সাহস হারিও না কেউ। ধোঁয়া নেমে আসছে, আসুক। খুব ঘন ধোঁয়া, সম্ভবত ঢেকে ফেলবে আমাদেরকে। পরস্পরকে হয়তো দেখতে পাব না। যাই হোক, বিচলিত না হয়ে যে যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। নড়াচড়া কোরো না। শহীদ স্টীল শাটার কাটার চেষ্টা করছে। দেখা যাক কতদূর কি হয়।'

কামাল সরে এল কুয়াশার পাশে। পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে কুয়াশার কানের কাছে ঠোঁট নিয়ে গেল সে। ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'তোমার বিমান কি আসবে আমাদেরকে উদ্ধার করতে?'

'আসবে। তবে দেরি হবে। নাইজেরিয়ায় আস্তানার দায়িত্বে যে লোক আছে সে জানাল সবগুলো বিমানকেই একটা অ্যাসাইনমেন্টে পাঠিয়েছে সে। ওখানে মাত্র তিনটে বিমান আছে আমার। তিনটের মধ্যে একটা সি প্লেন্। ওটাকেই পাঠাতে বলেছি।'

'কতক্ষণ লাগবে বলে মনে করো?'

'ঠিক বলতে পারছি না। তবে ঘন্টা ছয়েক তো লাগবেই।'

নিরাশ হলো কামাল।

কুয়াশা বলল, 'বিমানটা আমাদেরকে ঠিক উদ্ধার করতে আসবে না। এই রহস্যপুরী থেকে মুক্তি পেতে হবে আমাদেরকে বাইরে থেকে কোন সাহায্য না পেয়েই। বিমানটা আসবে শুধুমাত্র আমাদেরকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। রহস্যপুরীর আশেপাশে সেটা ল্যাণ্ড করবে।'

কামাল নিচু গলায় জানতে চাইল, 'প্রফেসর ওয়াই-এর কি খবর? সেও নিশ্চয়ই নানা রকম চেষ্টা করছে মুক্তি লাভের জন্যে?'

'তা করছে বৈকি।'

'সে কি বাইরে থেকে সাহায্য পাবে?'

কুয়াশা বলল, 'পাবে। তবে কি ধরনের সাহায্য তা আমি জানতে পারিনি।'

উপর দিকে তাকাল কামাল। চমকে উঠল সে। ঘন লাল ধোঁয়া নেমে এসেছে মাথার কাছে।

দেখতে দেখতে ওদের শরীর ঢেকে ফেলল ধোঁয়া। মুখোশ পরা ছিল বলে কোন অসুবিধেই হলো না ওদের। স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ ব্যাহত হলো না। কিন্তু গাঢ় ধোঁয়ায় আধহাত দূরের জিনিসও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

সবাই স্থির চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

কারও কিছু করার নেই। মিনিট পাঁচেক পর কুয়াশা কামালের হাতে অনেকগুলো ক্যাপসুল দিল। বলল, 'সবাইকে একটা করে ক্যাপসুল দাও। এখুনি গিলে ফেলুক সবাই একটা করে। ফুসফুসকে গ্যাসের হাত থেকে নিরাপদে রাখার জন্যে এই ক্যাপসুল। আগে থেকে সাবধান হয়ে যাওয়া দরকার।'

কামাল ক্যাপসুলগুলো নিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়ল। আধ হাত দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে জানা নেই। তবু কাজটা করা দরকার। ডি. কস্টার নাম ধরে ডাকল ও, 'মি. ডি. কস্টা?'

সাড়া নেই।

বিরক্ত হলো কামাল ডি. কস্টা ইচ্ছা করে সাড়া দিচ্ছে না মনে করে। আবার ডাকল সে, 'মি. ডি. কস্টা!'

তবু ডি. কস্টা সাড়া দিল না।

কথা বলে উঠল কয়েক হাত দূর থেকে আবিদ, 'কামাল ভাই, মি. ডি. কস্টা তো আমার গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল খানিক আগে। হঠাৎ সে খুব তাড়াতাড়ি সরে গেল কোথায় যেন।'

'চুলোয় যাক। আপনি আমার দিকে এগিয়ে এসে একটা হাত বাড়িয়ে দিন। একটা ক্যাপসুল দেব, খেয়ে ফেলবেন সাথে সাথে। লিজা কোথায়?'

'আমার পাশেই।'

'ওকেও একটা দেবেন।'

আবিদ কয়েক পা এগিয়ে এল কামালের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে। কামাল হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। আবিদের হাতটা স্পর্শ করল সে। দুটো ক্যাপসুল আবিদের হাতে দিয়ে মুখ খুলল, 'মহুয়াদি।'

'বলো।'

'কোথায় তুমি?'

মহুয়া হেসে ফেলল, 'কোথায় তা তো ঠিক জানি না। তবে রহস্যপুরীর বন্দীখানা থেকে তোমরা এখনও আমাদেরকে মুক্ত করতে পারোনি, এটুকু জানি। আরে! দাদা! ধোঁয়া যেন হালকা হয়ে যাচ্ছে!'

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ। আমি বাতাসে স্প্রে করে দিয়েছি এক ধরনের রাসায়নিক তরল পদার্থ। ধোঁয়া বা গ্যাস কিছুই থাকবে না আর।'

কথা বলে উঠল ওমেনা, 'মি. কুয়াশা।' ওমেনার গলায় উত্তেজনা।

'কি হলো?'

ওমেনা রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, 'এই বন্দীখানার কোন একটা দরজা খুলে গেছে—মন বলছে আমার। সেই খোলা দরজা দিয়ে কেউ বা কারা যেন বেরিয়ে গেছে। কিন্তু দরজাটা ঠিক কোন দিকে তা বুঝতে পারছি না।'

কুয়াশা বলল, 'ধোঁয়া সরে যাচ্ছে দ্রুত। এখুনি জানা যাবে।'

কামাল বলে উঠল, 'শহীদ নয় তো? ও হয়তো স্টীলের দরজা কেটে বেরিয়ে গেছে বাইরেটা দেখার জন্য।'

ধোঁয়া দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পরস্পরকে আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছে ওরা। হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন মি. সিম্পসন।

'কুয়াশা। শয়তান প্রফেসর ওয়াই তার দলবল নিয়ে পালিয়েছে।'

কামালের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল পরক্ষণে, 'সর্বনাশ! স্বর্ণ বোঝাই বস্তাগুলোও নেই দেখছি!'

ওমেনা বলল, 'ওই যে, ওই যে—হাঁ হাঁ করছে একটা দরজা। ওই পথেই পালিয়েছে ওরা!'

'কিন্তু ডি. কস্টা কোথায় গেল?'

সত্যিই তো! ডি. কস্টাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না কেন?

কুয়াশা ভারি কণ্ঠে ডেকে উঠল, 'শহীদ!'

একমুহূর্ত পরই শহীদ কক্ষে প্রবেশ করল।

'প্রফেসর পালিয়েছে, কেমন?' জানতে চাইল শহীদ।

কুয়াশা বলল, 'হ্যাঁ। পালিয়ে গেছে। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়? আমি সেকথা ভাবছি না, শহীদ। ভাবছি ম্যাটাবরের কথা। শহীদ, খোলা দরজাটা পরীক্ষা করো একবার।'

হাঁ হাঁ করছে দরজাটা। শহীদ ও কামাল দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পরীক্ষা করতে হলো না, দেখেই যা বোঝবার বুঝে নিল ওরা।

'ভ্যানিশিং রে-র দ্বারা দরজার কবাট দুটো গায়েব করে দেয়া হয়েছে। তারমানে, ম্যাটাবর মরেনি। নেকড়েদের কবল থেকে বেঁচে গেছে সে।'

কুয়াশা ওদের পিছন থেকে বলে উঠল, 'হ্যাঁ। ম্যাটাবরই ভ্যানিশিং রে ব্যবহার করে রহস্যপুরীর দরজা একটার পর একটা অদৃশ্য করে দিয়ে এখানে এসেছিল। প্রফেসর রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ রাখছিল তার সাথে সারাক্ষণ। ধোঁয়া আমাদের সবাইকে ঢেকে ফেলায় সুযোগটা পায় সে পালাবার।'

শহীদ বলল, 'সবাই তৈরি তো? এখনও বেশিদূরে যেতে পারেনি শয়তানটা। পিছু ধাওয়া করলে ধরা অসম্ভব হবে না।'

কুয়াশা বলল, 'চলো সবাই।'

খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল সবাই বাইরের করিডরে।

সবার আগে কুয়াশা এবং শহীদ। ওদের পিছনে মহুয়া, ওমেনা, লিজা, আবিদ। সবার পিছনে রিভলভার হাতে কামাল এবং মি. সিম্পসন।

ছুটছিল ওরা। সবাইকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে। কিন্তু কুয়াশা একেবারেই শান্ত। শহীদও অচঞ্চল।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ওরা দুজন।

কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে দুজনেই।

প্রথম মুখ খুলল শহীদই, 'কোথাও যেন কে চিৎকার করছে, তাই না কুয়াশা? তোমার শ্রবণশক্তি তো সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক গুণ বেশি। বলতে পারো কে চিৎকার করছে?'

চিন্তার কয়েকটা রেখা ফুটে উঠেছে কুয়াশার প্রশস্ত, চকচকে কপালে। মুখ খুলল সে, 'পারি। ডি. কস্টার গলা ওটা।'

'দেরি করা উচিত হচ্ছে না…।'

ছুটল শহীদ। ছুটল কুয়াশা।

ছুটল আবার সবাই ওদের পিছু পিছু।

পাঁচ

ছুটতে ছুটতেই শহীদ জানতে চাইল, 'কুয়াশা, তখন তুমি বললে প্রফেসর খুব বেশি

দূর যেতে পারেনি। কথাটার অর্থ?'

কুয়াশা বলল, 'অপেক্ষা করো। দেখতে পাবে।'

পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে ডি. কস্টার তীক্ষ্ণ সরু কণ্ঠের আর্তচিৎকার। কেউ যেন ভয় দেখাচ্ছে বা ভূতের দল ঘিরে ধরেছে তাকে, তাই চেঁচাচ্ছে, 'হেল্প মি! হেল্প মি! আর পারিটেছি না। ফর গডস সেক, যুডঢে জিটিয়াও হারিয়া যাইবার সম্ভাবনা ডেকা ডিটেছে। হেল্প মি! হেল্পি মি!'

করিডরের শেষ মাথায় আবার একটা দরজা। সেটার কবাট দুটোও ভ্যানিশিং রে-এর সাহায্যে অদৃশ্য করে দেয়া হয়েছে। তীর বেগে দরজা অতিক্রম করে একটি প্রশস্ত করিডরে পৌছল ওরা। ডি. কস্টার চিৎকার ভেসে আসছে ডানদিক থেকে।

ছুটল ওরা সেদিকে। সামনেই একটা বাঁক। বাঁক ঘুরতেই ডি. কস্টাকে দেখা গেল।

সবাইকে ছুটে আসতে দেখে ডি. কস্টা উল্লাসে গর্জে উঠল, 'জিটিয়া গিয়াছি। মাই গড, জিটিয়া গিয়াছি।'

কথা শেষ করে ডি. কস্টা ম্যাটাবর ম্যাটচেক মন্টোগোমারীর বাঁ হাতটা আরও জোরে সর্বশক্তি দিয়ে মুচড়ে দিল।

অসহনীয় ব্যথায় ককিয়ে উঠল ম্যাটাবর।

ওদের দুজনকে ঘিরে দাঁড়াল সবাই। হড়বড় করে কথা বলতে শুরু করল ডি. কস্টা। তার কথা শুনে পরিষ্কার হয়ে গেল রহস্যটা।

প্রফেসর পালাবে এই রকম একটা সন্দেহ ডি. কস্টা আগেই করেছিল। কুয়াশা যখন তাকে নির্দেশ দেয় প্রফেসরের মুকুটে মিনি ট্র্যান্সমিটার যন্ত্রটা রেখে আসার জন্য তখনই সন্দেহটা জাগে তার মনে। তারপর থেকে সে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে শুরু করে প্রফেসর আর তার অনুচরদের উপর। প্রফেসরের একজন অনুচরের কাছাকাছি ছিল সে সব সময়। ধোঁয়ায় যখন বন্দীখানাটা ঢাকা পড়ে গেল তখন ডি. কস্টা সেই অনুচরটির শার্টের একটা কোনা ধরে ফেলে। কয়েক মুহূর্ত পরই অনুচরটি পা বাড়ায়। ডি. কস্টাও আলতোভাবে তার শার্টের প্রান্ত ধরে রেখে তার পিছু নেয়।

বন্দীখানা থেকে বেরিয়ে ডি. কস্টা অবশ্য আত্মগোপন করে ওদেরকে অনুসরণ করতে শুরু করে। প্রফেসর এবং তার অনুচরবৃন্দ আগে আগে যাচ্ছিল। পিছনে ছিল ম্যাটাবর।

একটার পর একটা করিডর অতিক্রম করে প্রফেসর দলবল নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে দেখে ডি. কস্টা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। খানিক পরেই সে দেখতে পায় প্রফেসর এবং তার দলবল অনেক আগে এগিয়ে গেছে, দেখাই যাচ্ছে না তাদের কাউকে, পিছনে রয়েছে শুধু ম্যাটাবর।

ম্যাটাবরের পিছিয়ে পড়ার কারণ ছিল। তার সারা শরীরে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন। একটা পায়ের হাঁটুর উপরের মাংস নেই পোয়াটেক। হাঁটতে বড় কষ্ট হচ্ছিল তার।

ম্যাটাবরের দুর্বলতার সুযোগটা গ্রহণ করে ডি. কস্টা। পিছন থেকে লাফিয়ে

পড়ে সে ম্যাটাবরের বাঁ হাতটা ধরে ফেলে। হাতটা মুচড়ে ধরে সে চলে আসে ম্যাটাবরের পিছনে।

ম্যাটাবর প্রাণপণ চেষ্টা করছিল ডি. কস্টার হাত থেকে মুক্তি পাবার। ডি. কস্টার চেয়ে চারগুণ বেশি শক্তি তার শরীরে। ভয়ানক ভাবে আহত হলেও ডি. কস্টার মত দু'চারজন লোককে এখনও সে একা ধরাশায়ী করার ক্ষমতা রাখে।

কিন্তু ডি. কস্টা কৌশলে বাজীমাত করে। ম্যাটাবরের হাতটা এমন কায়দায় মুচড়ে ধরে সে যে প্রচণ্ড ব্যথায় জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা দাঁড়ায় তার।

তীব্র যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেছে ম্যাটাবরের ফর্সা মুখটা।

'আহ! ছেড়ে দিন ওকে!'

কামাল বলে উঠল, 'প্রফেসর দলবল নিয়ে কোন্ দিকে গেছেন বলুন তো?'

শহীদ বলল, 'আমার সাথে এসো সবাই। কামাল, ডি. কস্টার সাহায্যে তুই ম্যাটাবরকে বেঁধে নিয়ে আয়।'

'কুয়াশা কোথায়!' এদিক ওদিক তাকিয়ে জানতে চাইল কামাল। পকেট থেকে একটা নাইলনের কর্ড বের করল সে।

শহীদ বলল, 'কুয়াশা করিডর ধরে সোজা চলে গেছে ওদিকে। আমিও যাচ্ছি। তোরা আয় ম্যাটাবরকে নিয়ে।'

বাধা দিল শহীদকে ওমেনা, 'মি. শহীদ, যাবেন না ওদিকে। মি. কুয়াশা বিপদে পড়তে যাচ্ছেন, পরিষ্কার বুঝতে পারছি আমি। ওদিকে এখন যে যাবে সে-ই বিপদে পড়বে।'

'কি ধরনের বিপদের কথা বলছ তুমি?'

'তা ঠিক জানি না। হয়তো কেউ ফাঁদ পেতে রেখেছে।'

কামাল বলল, 'অসম্ভব নয়। প্রফেসরের কাছে ভ্যানিশিং রে যন্ত্রটা আছে। কথাটা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়।'

'কিন্তু কুয়াশা বিপদে পড়বে জানতে পেরেও আমরা নিষ্ক্রিয় থাকব বলতে চাস? অসম্ভব।'

শহীদ দ্রুত পা বাড়াল।

ওমেনা তার পিছু নিল সাথে সাথে। বলল, 'ভেবে দেখুন আর একবার, মি. শহীদ। মি. কুয়াশা বিপদে পড়েছে বলে তার সাথে সবাইকে বিপদে পড়তে হবে, এরকম ভাবা উচিত নয়। আমরা বিপদের বাইরে থাকলে বরং মি. কুয়াশারই উপকার হবে। তাকে বিপদ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করতে পারব।'

শহীদ বলল, 'তোমার যুক্তিটাও অগ্রাহ্য করার মত নয়। কিন্তু কুয়াশা কি ধরনের বিপদে পড়তে পারে তা তো তুমি বলতে পারছ না। ধরো, প্রফেসর ওয়াই বা আর কেউ যদি তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে? অঘটন একটা ঘটে গেলে কি করব তখন আমরা?'

ওমেনা আর কথা বাড়াল না।

করিডর ধরে ছুটছে ওরা। সকলের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। কয়েকবার বাঁক ঘুরে সরু একটা প্যাসেজে পৌঁছুল ওরা। শেষ প্রান্তে একটা দরজা। দরজা অতিক্রম

করে প্রশস্ত একটা করিডর আবার। করিডরের দুই পাশে কয়েক হাত পর পর বড় বড় দরজা।

সবগুলো দরজাই বন্ধ মনে হচ্ছে।

করিডরের মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে প্রফেসর ওয়াই এবং তার অনুচরবৃন্দ।

কুয়াশাকে দেখা যাচ্ছে। প্রফেসরের শরীর হাতড়ে ব্যর্থ হয়েছে সে। পায়নি ভ্যানিশিং রে যন্ত্রটা। অনুচরদের প্যান্ট-শার্টের পকেটগুলো পরীক্ষা করছে সে ব্যস্ততার সাথে।

'এদের এ অবস্থা হলো কিভাবে?'

শহীদের প্রশ্ন শুনে মুখ না তুলেই কুয়াশা উত্তর দিল, 'যে মুখোশগুলো প্রফেসর এবং তার দলের লোকদের দিয়েছিলাম সেগুলো বিশেষভাবে তৈরি। শত্রুদের উদ্দেশ্যেই তৈরি করা ওগুলো। অক্সিজেন তৈরি করার যে যন্ত্রটা মুখোশের সাথে ফিট করা আছে সেটা নির্দিষ্ট কিছু সময় পর অক্সিজেনের বদলে এক ধরনের বিষাক্ত গ্যাস তৈরি করতে শুরু করে। এই গ্যাস ফুসফুসে প্রবেশ করলেই জ্ঞান লোপ পায়। প্রফেসর এবং তার দলের লোকেরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু শহীদ, ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রটা ম্যাটাবরের কাছে পাওনি, তাই না? প্রফেসরের কাছেও নেই। গেল কোথায় সেটা?' সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। হঠাৎ কঠিন আকার ধারণ করল তার মুখের চেহারা।

'বুঝেছি। শহীদ, আমি এখানে পৌঁছবার আগেই কেউ এসেছিল। নিশ্চয়ই এই রহস্যপুরীর শয়তানের দলের কাণ্ড! তারাই ভ্যানিশিং রে-র যন্ত্রটা সরিয়ে ফেলেছে।'

'সর্বনাশ!' ওমেনা সভয়ে বলে উঠল।

শহীদ বলল, 'নিশ্চয়ই তারা লক্ষ্য রাখছে আমাদের ওপর।

ওমেনা বলল, 'শুধু লক্ষ্যই রাখছে না। আমার ধারণা তারা ঘিরে রেখেছে চারদিক থেকে আমাদেরকে।'

কামাল এবং ডি. কস্টাকে দেখা গেল এগিয়ে আসছে। তাদের সাথে হাত বাঁধা অবস্থায় ম্যাটাবরকে দেখা যাচ্ছে।

এমন সময় একটি বন্ধ দরজার ভিতর থেকে বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠল একজন লোক, 'ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রটা এখন আমাদের দখলে। এটা একটা যুগান্তকারী অস্ত্র। আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সব অস্ত্রই এর কাছে খেলনা বিশেষ। বুঝতেই পারছ তোমরা, যে কোন মুহূর্তে তোমাদের সবাইকে খতম করে দিতে পারি। কিন্তু সে রকম ইচ্ছা আমাদের নেই। আমরা সবাই নিয়ম-কানুনের পূজারী। তোমাদের কপালে যাই ঘটুক, আমাদের রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী ঘটবে। তবে, তোমরা যদি কোন রকম কৌশল খাটাবার চেষ্টা করো তাহলে আলাদা কথা। টের পাওয়া মাত্র সবাইকে হত্যা করব আমরা। ভালয় ভালয় হাতের খেলনা অস্ত্রগুলো ফেলে দাও ছুঁড়ে। তারপর মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও। তোমরা আমাদের বন্দী, এটা স্বীকার করে নাও। তাতে তোমাদের ভালই হবে।'

কুয়াশার দিকে তাকাল শহীদ ও কামাল।

মি. সিম্পসন রিভলভার তুললেন দরজার দিকে। ওই দরজার ভিতর থেকেই ভেসে আসছিল শত্রুর কণ্ঠস্বর।

'না!'

কুয়াশা বলে উঠল, 'গুলি করে নিজেদের বিপদ বাড়িয়ে লাভ কি? আত্মসমর্পণ করাই আপাতত বুদ্ধিমানের কাজ হবে. মি. সিম্পসন।'

ফেলে দিল ওরা যে-যার হাতের অস্ত্র। তারপর মাথার উপর হাত তুলে দিল নিঃশব্দে।

ওমেনার অনুমান মিথ্যে নয়। শত্রুরা আসলেই ওদেরকে ঘিরে রেখেছিল চারদিক থেকে।

করিডরের দুই দিকের দুই বাঁক থেকে এগিয়ে এল স্টেনগানধারী একজন সেন্ট্রি।

করিডরের দুই পাশের চারটে দরজা খুলে গেল একযোগে। বেরিয়ে এল দু'জন করে সশস্ত্র লোক। তাদের একজনের হাতে দেখা যাচ্ছে ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রটা।

লোকটা বলে উঠল, 'আমার নাম অ্যাংগেলা। জংলীদের কাছে আমি একজন দেবতা হিসেবে পরিচিত। আসলে আমি দেবতা নই। দেবতা রোটেনহেপো হেমনোসান ক্যান ক্যান-এর নগণ্য সেবক আমি।'

কুয়াশা কঠোর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অ্যাংগেলার দিকে। গর্জে উঠল সে, 'থামাও তোমার লেকচার। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও আগে। জানতে চাই, তোমাদের নেতা কে?'

'আমাদের নেতা থাকেন আমেরিকায়। রহস্যপুরীতে যারা আছে তাদের নেতা আমিই।'

কুয়াশা আরও কঠোর হলো, 'তোমরা আমাদের বিচার করতে চাও। সে অধিকার তোমাদেরকে কে দিয়েছে?'

অ্যাংগেলা ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রটার ব্যারেল ধরে রেখেছে কুয়াশার বুক লক্ষ্য করে।

'রহস্যপুরীর সর্বময় কর্তা আমরা। এটা আমাদের সম্পত্তি। আমরা দেবতা রোটেনহেপো হেমনোসান ক্যান ক্যান-এর সেবক, পূজারী। এই রহস্যপুরীর পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের ওপর। আপনারা রহস্যপুরীর পবিত্রতা নষ্ট করেছেন। সুতরাং আমরা আপনাদের বিচার করব না তো করবে কে?'

হাঃ হাঃ করে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ল কুয়াশা। চমকে উঠল অ্যাংগেলা।

হাসি থামিয়ে কুয়াশা বলল, 'চমৎকার, চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছ। জংলীদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদের সঞ্চয় করা লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের স্বর্ণ আদায় করছ বছরের পর বছর ধরে আফ্রিকার এই দুর্গম এলাকার অভ্যন্তরে নিরাপদ রহস্যপুরীতে বসে। বিদেশে পাচার করছ সেই স্বর্ণ। পরিশ্রম নেই, চেষ্টা নেই—আপনা আপনি মণ মণ স্বর্ণ আসছে, তা বিক্রি করে কোটি কোটি ডলার রোজগার করছ—অদ্ভুত!

ভেবেছিলে চিরকাল এমনি চলবে, তাই না? হাঃ হাঃ হাঃ! বিচার করো আর যাই করো, তোমাদের দিন শেষ হয়ে এসেছে। আমার হাতেই তোমাদের ধ্বংস ঘটবে। চেনো আমাকে? আমার নাম কুয়াশা। অত্যাচারীর, মিথ্যাবাদীর, শোষকের এবং অপরাধীর যম আমি। এরা আমার আজন্মের শত্রু। শত্রুকে আমি ক্ষমা করতে জানি না। বিচার করবে? বেশ, চলো। দেখি তোমাদের বিচার আমাকে কি শাস্তি দেয়।'

অ্যাংগেলা ঢোক গিলল। সে তার সহকারীদের উদ্দেশ্যে বলল, 'বন্দীদেরকে বাঁধো। পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলো প্রত্যেকের হাত।'

এমন সময় মেঝেতে শোয়া অবস্থা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে সিঁধে হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রফেসর ওয়াই। জ্ঞান ফিরে এসেছে তার এবং তার অনুচরবৃন্দের।

'ষড়যন্ত্র! মস্ত ষড়যন্ত্র! মি. কুয়াশা, এই ষড়যন্ত্রের হোতা আপনি। মুখোশের সাথে আপনি গ্যাসের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। সেই গ্যাসের কবলে পড়ে আমরা জ্ঞান হারাই। আপনি বড় বেশি কৌশল দেখাতে শুরু করেছেন। এর শাস্তি আপনাকে পেতে হবে। আমার নাম প্রফেসর ওয়াই, আমি আপনাকে দেখে নেব!'

কুয়াশা মৃদু শব্দে হেসে উঠল। বলল, 'কিন্তু আমাদের মধ্যে মৌখিক একটা চুক্তি হয়েছিল, মনে নেই বুঝি? একদল আর এক দলকে ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করবে না এই রকম একটা শর্ত ছিল না? আপনি কি সেই শর্ত মেনে চলেছেন?'

প্রফেসর গর্জে উঠল, 'ওসব কথা আমি শুনতে চাই না। চুক্তি, শর্ত—এসব আবার কি? সুযোগ পেলে কে ছাড়ে শুনি? আমার সহকারী পালাবার রাস্তা তৈরি করল, সেই রাস্তা আপনাকে ব্যবহার করতে দেব কেন শুনি? আপনি কি আমার শত্রু নন? আপনি কি আমার আদর্শের ঘোর বিরোধী নন?'

কুয়াশা বলল, 'তোমার মত নীতিহীন শয়তান ত্রিভুবনে আর একটিও নেই, ওয়াই। যাক, এ প্রসঙ্গে আমি আর কথা বলতে চাই না।'

'তা না চাইলে কিছুই হবে না আমার। তবে মনে রাখবেন, শাস্তি আপনাকে আমি দেবই।'

কুয়াশা হাসতে হাসতে বলল, 'বেশ তো। কে কাকে শাস্তি দিতে পারে তা সময় এলেই দেখা যাবে।'

দাঁতে দাঁত চেপে প্রফেসর ওয়াই গর্জে উঠল, 'ঠিক আছে। দেখা যাবে। প্রস্তুত থাকবেন।'

*

স্টেনগানের নল চারদিকে। পিছনে অ্যাংগেলা। তার হাতে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্র। করিডরের পর করিডর ধরে হাঁটছে ওরা। কুয়াশা, প্রফেসর ওয়াই, শহীদ, মি. সিম্পসন, কামাল, ডি. কস্টা, আবিদ এবং প্রফেসর ওয়াইয়ের দলের প্রত্যেকটি লোকের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। মেয়েদের হাত বাঁধা হয়নি অজ্ঞাত কোন কারণে।

প্রশস্ত একটা জায়গায় এসে থামল সবাই। দেখা যাচ্ছে সিঁড়ির অস্বাভাবিক লম্বা ধাপ। অ্যাংগেলার নির্দেশে সেদিকে আবার পা বাড়াল সবাই।

সিঁড়ি বেয়ে প্রকাণ্ড একটা চত্বরে উঠে এল সবাই। মাঝখানে একটা কূয়া।

কূয়ার চারপাশে গোলাকার উঁচু দেয়াল। কূয়ার মুখে মস্ত একটা ঢাকনা, ঢাকনাটা ঝুলছে সিলিংয়ের সাথে আটকানো লোহার শিকলের সাহায্যে। কূয়াটা চিনতে পারল ওরা। এই কূয়ার নিচেই ধনভাণ্ডার, ওরা যে ধনভাণ্ডারে বন্দী হয়ে ছিল।

প্রকাণ্ড চত্বরের আর এক প্রান্তে বিস্ময়কর একটা মূর্তি। মূর্তিটা সম্পূর্ণ ব্রোঞ্জের। হাঁটু মুড়ে বসে আছে সর্বকালের সর্ববৃহৎ মূর্তিটা।

মূর্তিটার মুখের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল সবাই। অপূর্ব সৃষ্টি। মূর্তি বলে মনেই হয় না। চোখ দুটোর মণি নীল। সম্ভবত নীলকান্ত মণি। টিকালো নাক। চওড়া কপাল। একমাথা ঝাঁকড়া চুল। মুখটা ভয়ঙ্কর সজীব। তাকিয়ে থাকতে থাকতে সকলেরই মনে হলো, এই বুঝি মস্ত মাথাটা নেড়ে কথা বলে উঠবে মূর্তিটা বা হাসিটা আরও বিস্তৃত হয়ে উঠবে।

মূর্তির পাদদেশে জমাট বাঁধা প্রচুর রক্ত দেখা যাচ্ছে। রক্তের উপর পড়ে রয়েছে চারটি নর মুণ্ড। দৃশ্যটা বীভৎস, ভয়ঙ্কর।

মহুয়া ডকুরে কেঁদে উঠল। মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাল লিজা।

অ্যাংগেলা কথা বলে উঠল, 'এই মূর্তির সামনে আপনাদের বিচার হবে। আমি আশা করব বিচারের রায় মেনে নেবেন আপনারা। বিচার কার্য শেষ হবার আগে কেউ কোন রকম কৌশল খাটাবার চেষ্টা করবেন না। তেমন কিছু করলে আমরা খুন করার জন্য ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রের বোতামে চাপ দেব। সুতরাং, সাবধান।'

অ্যাংগেলা তার একজন সহকারীর হাতে ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রটা দিয়ে তার কানে কানে কিছু বলল। সহকারী মাথা নাড়ল ঘন ঘন।

অ্যাংগেলা বলল কুয়াশাদের উদ্দেশ্যে, 'আপনারা অপেক্ষা করুন। আমি বিচার অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য যাচ্ছি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসব।'

দ্রুত পায়ে চত্বর থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে একটি দরজা পথে অদৃশ্য হয়ে গেল অ্যাংগেলা।

ছয়

অ্যাংগেলা মিটিংরুমে প্রবেশ করে দেখল তার দেড় ডজন সহকারী স্ব স্ব আসনে অধীর অপেক্ষায় বসে আছে।

সভাপতির আসনে গিয়ে বসল অ্যাংগেলা।

'সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা জানতে চাই।'

কথা বলে উঠল রাঙাচা পাংশি।

সভাপতি অ্যাংগেলা বলল, 'আমাদের এই বৈঠক মাত্র পাঁচ মিনিট স্থায়ী হবে। আমরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন করে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। সর্বশেষ পরিস্থিতি আমার সম্পূর্ণ আয়ত্তে এবং অনুকূলে। বন্দীদেরকে জড়ো করা হয়েছে দেব-মূর্তি রোটেনহেপো হেমনোসান ক্যান ক্যান-এর সামনে। শত্রুদের বিস্ময়কর মারণাস্ত্র ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রটাও এখন আমাদের দখলে।

মোটকথা, সবই ঠিকঠাক আছে। কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি এই কথা ভেবে যে শত্রুদের দুই নায়ক প্রফেসর ওয়াই এবং কুয়াশা পারে না এমন কাজ নেই। কুয়াশা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে আমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে নিজের হাতে। আমি জানি, ফালতু কথা বলার লোক সে নয়। ভয় পাচ্ছি সেজন্যেই।'

অ্যাংগেলা থামল।

একজন প্রশ্ন করল, 'সমস্যার সমাধানের কথা কিছু ভেবেছেন কি?'

'ভেবেছি। আগে ভেবেছিলাম জংলীদের প্রতিনিধির সামনে ওদের বিচার করা হবে। কিন্তু এখন ভেবে দেখছি, তাতে সময় লাগবে আরও। আমি আর মোটেই সময় নষ্ট করতে চাই না। কুয়াশা এবং প্রফেসর ওয়াই যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ আমরা প্রকৃতপক্ষে নিরাপদ নই। আমার মতে, কালবিলম্ব না করে ওদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক। জলংলীদের মধ্যে যদি বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহলে ভেবেচিন্তে একটা উপায় বের করা যাবে। জংলীরা কোনমতেই বড় ধরনের কোন সমস্যার সৃষ্টি করবে বলে মনে হয় না। তোমরা কি মনে করো?'

'আপনার কথাই ঠিক!' সকলে সমস্বরে বলে উঠল।

'বন্দীদেরকে হত্যা করাই হোক তাহলে?'

'হত্যা করাই হোক।'

'গুড। আজকের মত সভার কাজ শেষ হলো।'

মিটিংরুম থেকে বেরিয়ে গেল সবাই দলবদ্ধ ভাবে।

দেবমূর্তি রোটেনহেপো হেমনোসান ক্যান ক্যান-এর সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা সবাই নিশ্চল পাথরের মত। প্রফেসর ওয়াই চেয়ে আছে দেব-মূর্তির চোখ দুটোর দিকে নিষ্পলক নেত্রে। রহস্যময় একটুকরো হাসি তার ঠোঁটে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

দেব-মূর্তির চোখ দুটো নীল। মহা মূল্যবান নীলকান্ত মণি ও দুটো। কয়েক কোটি টাকার জিনিস, সাত রাজার ধন।

'মি. কুয়াশা!'

প্রফেসর ওয়াই কুয়াশার দিকে ফিরল।

কুয়াশা নিচু স্বরে কথা বলছিল শহীদের সাথে। প্রফেসরের দিকে ফিরল সে।

'বলো।'

প্রফেসর হাসছে। বন্ধুত্বের হাসি। বলল, 'যা হবার হয়ে গেছে। আসুন সব কথা ভুলে যাই আমরা।'

কুয়াশা কথা বলল না।

রাজকুমারী চট্ করে বলে বসল, 'কিন্তু আপনার মনের কথা তো ওটা নয়। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, আপনি মিথ্যে কথা বলতে চাইছেন। আপনার উদ্দেশ্য বন্ধুত্বের অভিনয় করে সুযোগ মত বেঈমানি করা।'

প্রফেসর ওয়াই চটল না। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল সে রাজকুমারীর দিকে। সে জানে, মানুষের মনের খবর চেষ্টা করলে বলে দিতে পারে রাজকুমারী।

'রাজকুমারী, তোমার গুণের তুলনা হয় না, জানি আমি। কিন্তু তোমার গুণ

আছে বলেই তার অপব্যবহার করবে নাকি? বাজে কথা বোলো না, সাবধান করে দিচ্ছি, বুঝলে! তুমি খুব ভাল করেই জানো আমি আমার অন্তর থেকে চাইছি মি. কুয়াশার বন্ধুত্ব। শুধু তাই নয়, আমি মি. কুয়াশাকে সাথে নিয়ে কাজও করতে চাই। অসাধারণ ব্রেন ওঁর। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমরা দুজন একসাথে কাজ করলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যাবে।'

কুয়াশা বলে উঠল, 'থাক ওসব কথা। তুমি তো জানোই, তোমার নীতিহীনতার জন্যই আমি তোমাকে ভাল চোখে দেখি না। তোমার মধ্যে সব গুণ আছে, গুণের চেয়ে বেশি আছে অসাধারণ বুদ্ধি এবং ক্ষমতা—কিন্তু সবচেয়ে যেটা বেশি প্রয়োজন সেটা তোমার মধ্যে এক বিন্দুও নেই। মানবতা নেই যার সে আমার শত্রু। তোমার মধ্যে মানবতা নেই।'

'এ আপনার অযৌক্তিক কথা। মানবতা নেই একথা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন? স্বীকার করি, মানুষকে খুন করতে হয় আমাকে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন খুন করি? খুন করি বিজ্ঞানের সাধনা করার জন্য। এই পৃথিবীর মানুষকে আমি নিখুঁত দেখতে চাই। যে মানুষ মরবে না, যার দুঃখবোধ থাকবে না, যার রাগ-শোকের বালাই থাকবে না, যার মধ্যে হিংসা, ক্রোধ, লোভ, খারাপ গুণ কিছুই থাকবে না। মানুষের সমাজ হবে শান্ত, নিরুপদ্রব, উন্নত। আপনি কি চান না এই রকম একটা সমাজ? আপনি কি স্বীকার করেন না আমি মানুষকে ভালবাসি বলেই এই রকম একটা সমাজ গঠনের জন্য কাজ করছি?'

কুয়াশাকে গম্ভীর দেখাচ্ছে। 'মানুষকে তুমি যেমন দেখতে চাও, তুমি নিজে কি ঠিক সেই রকম হতে পেরেছ?'

'পারিনি।'

কুয়াশা বলল, 'আর পারবেও না। ভারসাম্যের অভাব আছে তোমার মধ্যে। নিজেকে না শুধরে বড় বড় কথা চিন্তা করার কোন অর্থ হয় না। তোমার প্রত্যেকটা কাজ পরস্পরবিরোধী।'

প্রফেসর ওয়াই হঠাৎ হেসে উঠল। বলল, 'ঠিক আছে, আমি কথা দিচ্ছি, ভেবে দেখব নিজেকে শুধরে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব কিনা। যদিও জানি নীতি মেনে চলা বড় কঠিন কাজ। তাই এখনই আমি কোন কথা দিচ্ছি না। এখন আমাদের সামনে বিপদ। জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে গেছে। আসুন, আমরা বন্ধুর মত একত্রিত হই, আঘাত হানি শত্রুর উপর। শত্রুদেরকে ধ্বংস করে…'

কুয়াশা বলল, 'তোমার বন্ধুত্ব ছাড়াই আমরা শত্রুদেরকে ধ্বংস করব। ওদের হাতে বন্দী হয়েছি তোমারই দোষে। ভ্যানিশিং-রে এখন ওদের হাতে। খুবই জটিল হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। তবু, শেষ পর্যন্ত বিজয় আমাদের হবেই। হয়তো, আমাদের দুএকজন নিহত হবে শত্রুদের সাথে যুদ্ধে…।'

'আপনি কি আমার সহযোগিতা গ্রহণ করতে রাজি নন?'

কুয়াশা হাসল, 'রাজি নই বলা ঠিক হবে না। আমার কথা হলো, সত্যিই যদি বন্ধুত্ব চাও তাহলে এসো, শত্রুর বিরুদ্ধে একসাথে লড়ি। কিন্তু বন্ধুত্বের সুযোগে যদি বেঈমানি করার ইচ্ছা থাকে তাহলে…।'

'বিশ্বাস করুন, কোন বদ উদ্দেশ্য আমার মধ্যে নেই।'

'বেশ। কাছে এসো, পরামর্শ দিই কিছু।'

প্রফেসর ওয়াই কুয়াশার কাছে এসে দাঁড়াল। কুয়াশা নিচুস্বরে কথা বলতে লাগল।

একটু পরই চত্বরে উঠে এল অ্যাংগেলা। তার সাথে দেড় ডজন সহকারী। প্রত্যেকে মুখোশ পরিহিত। প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র।

'এত জানোয়ার বাস করে এখানে!' সকৌতুকে বলে উঠল শহীদ।

অ্যাংগেলা কুয়াশা এবং প্রফেসর ওয়াইয়ের দিকে তাকাল পালাবদল করে। তারপর বিশাল দেব-মূর্তির দিকে এগোল দৃঢ় পায়ে। তার পিছু পিছু চলল সহকারীরা।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল অ্যাংগেলা। সহকারীকে দিয়ে যাওয়া ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রটা হাত বাড়িয়ে নিল। দেব-মূর্তির কোলের কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে।

শহীদ ফিসফিস করে কথা বলে উঠল, 'কুয়াশা! ওরা আমাদেরকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওদের হাবভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা!'

রাজকুমারী নিচু গলায় বলল, 'হ্যাঁ। আমিও বুঝতে পারছি।'

অ্যাংগেলার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আমরা কোন রকম ঝুঁকি নিতে চাই না। সবাই পিছন ফিরে দাঁড়াও!'

ঠিক সেই সময় ঘটনাটা ঘটল।

প্রফেসর ওয়াই হঠাৎ চিৎকার করে উঠল। পর মুহূর্তে পড়ে গেল মেঝেতে। মেঝেতে পড়ে কৈ মাছের মত লাফাতে লাগল। 'কি হলো' 'কি হলো' বলে কামাল লাফ দিয়ে কাছে গিয়ে প্রফেসরের কাছে বসে পড়ল। এবং একই সময় চিৎকার করে উঠল শহীদ।

প্রফেসরের কাণ্ড দেখে শত্রুরা বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। ব্যাপারটা কি তা টের পাবার আগেই শহীদের চিৎকার শোনা গেল।

'অ্যাকশন!'

সেই একই সময় বিদ্যুৎ খেলে গেল কুয়াশার শরীরে। ডাইভ দিল কামাল। রাজকুমারী চোখ বুজে নিজের দেহের চারদিকে সাব সোনিক র‍্যাডিয়েশন আমদানী করার জন্য ধ্যানমগ্ন হলো। মহুয়া একজন শত্রুর ঘাড়ে কারাতের কোপ বসিয়ে দিল প্রাণপণ শক্তিতে। আবিদ এবং লিজা লাফিয়ে পড়ল নিকটস্থ শত্রুর উপর।

এবং শহীদ পকেট থেকে একটা গ্রেনেড বের করে দাঁত দিয়ে খুলল পিনটা, তারপর ছুঁড়ে দিল এক প্রান্তে। একই সাথে ছোঁ মেরে কেড়ে নিল একজন শত্রুর একটি রিভলভার।

শত্রুপক্ষও কম যায় না।

অ্যাংগেলা সতর্কই ছিল। কুয়াশাকে বিদ্যুৎবেগে নড়ে উঠতে দেখেই পলকে সরে গেল সে, চেপে ধরল ভ্যানিশিং রে-এর বোতাম।

অদৃশ্য হয়ে গেল কুয়াশার পিছনে দাঁড়ানো ডি. কস্টার টুপিটা। লক্ষ্য ব্যর্থ হয়েছে অ্যাংগেলার। কুয়াশার গায়ে লাগেনি রে।

কিন্তু ডি. কস্টা সটান পড়ে গেল মেঝেতে। নিঃসাড় পড়ে রইল তার দেহ।

অ্যাংগেলা ব্যর্থ হলেও, তার সহকারীরা ব্যর্থ হয়নি। তিনচারজনের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল একযোগে। কুয়াশার শরীরে গিয়ে লাগল বুলেট। বুকে, পাঁজরে, হাঁটুতে বুলেট খেয়েও কুয়াশা থামল না। যেন কিছুই হয়নি, এগিয়ে গেল সে ঝড়ের বেগে।

অ্যাংগেলা লাফ দিয়ে সরে গিয়ে একটি বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তাল সামলাবার চেষ্টা করলে কুয়াশা তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। চোখের পলকে দেখা গেল অ্যাংগেলা শূন্যে উঠে গেছে, ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রটা কুয়াশার হাতে রয়েছে।

সশব্দে শূন্য থেকে মেঝেতে পড়ল অ্যাংগেলা। ব্যথায় ককাচ্ছে সে।

গর্জে উঠল কুয়াশা, 'সাবধান! ভ্যানিশিং রে এখন আমাদের দখলে।'

থেমে গেল খণ্ড যুদ্ধ। ধীরে ধীরে নামল কামাল একজন শত্রুর বুকের উপর থেকে। শহীদ মাথার উপর তুলে ফেলেছিল আর একজন শত্রুকে, নামিয়ে দিল তাকে মেঝেতে! মি. সিম্পসনের হাতে দেখা গেল দুটো রিভলভার, দুইদিকে ধরে দুই শত্রুর বুক লক্ষ্য করে ট্রিগারে চাপ দিতে যাচ্ছিলেন তিনি, ক্ষান্ত হলেন। তাঁর পায়ের কাছে দুটো নিঃসাড় দেহ পড়ে রয়েছে, দুই শত্রুর মাথা ঠুকে দিয়ে অচল করে ফেলেছেন তিনি। রাজকুমারী চোখ মেলে বলল, 'সাবসোনিক র‍্যাডিয়েশন আমদানী করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।'

প্রফেসর ওয়াই পেটে হাত দিয়ে অসুস্থতার ভান করে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল, উঠে দাঁড়িয়েছে সে ইতিমধ্যেই। তার হাতে শোভা পাচ্ছে অদ্ভুত আকৃতির একটি পিস্তল। সেটা থেকে তরল অ্যাসিড নিক্ষিপ্ত হয়। পিস্তলটা ব্যবহার করার দরকার পড়ল না আর।

বিকট শব্দে গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো!

এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল এক সেকেণ্ড বা তার কিছু বেশি সময়ের মধ্যে।

'শহীদ, বেঁধে ফেলো সবাইকে,' কুয়াশা শান্ত অথচ দ্রুত গলায় বলল।

তীব্র ব্যথায় গোঙাচ্ছে শত্রুদের কয়েকজন। অ্যাংগেলার মুখোশ খসে পড়েছে মুখ থেকে। কুৎসিত কদাকার ক্ষত-বিক্ষত মুখ তার। তাকানো যায় না, ভয় করে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে। মাথার উপর হাত তুলল ধীরে ধীরে। শত্রুরা সবাই তার দেখাদেখি হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে মাথার উপর হাত তুলল।

প্রফেসর ওয়াইকে বিরূপ মনে হচ্ছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সে। তার অনুচরবৃন্দ তাকিয়ে আছে তারই দিকে।

ডি. কস্টা ছাড়া সবাই অক্ষত। শহীদ ও কামাল নায়লনের কর্ড দিয়ে শত্রুদের দিকে এগিয়ে গেল। সবাই জয়ের আনন্দে আনন্দিত। কিন্তু ডি. কস্টার কি হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না কিছু। পড়ে আছে সে নিঃসাড়। কোন শব্দ হলো না, কুয়াশার পিছনের দরজাটা খুলে গেল। কুয়াশার মাথার পিছনে শীতল ধাতব পদার্থের স্পর্শ লাগল।

'নড়েছ কি মরেছ!' গর্জে উঠল একটি কর্কশ কণ্ঠস্বর। চমকে উঠল সবাই। কুয়াশার পিছনের দরজা থেকে বেরিয়ে এসেছে বিড়ালের মুখোশধারী একজন শত্রু।

হাতের রিভলভার চেপে ধরেছে কুয়াশার মাথায়। কুয়াশার শরীরে বুলেট প্রুফ এক বর্ম আছে টের পেয়েছে শত্রুরা আগেই। একমাত্র মাথায় গুলি করলে মরবে সে।

'সবাই যে-যার হাতের অস্ত্র ফেলে দাও! পাঁচ পর্যন্ত গুণব—এক, দুই…।'

হুকুম করল অ্যাংগেলা। কাঁপছে সে। কুৎসিত মুখটা হিংস্র হয়ে উঠেছে।

নড়ছে না কুয়াশা। ভয় হচ্ছে তার, পিছনের শত্রু তাকে একচুল নড়তে দেখলেই রিভলভারের ট্রিগার টেনে দেবে।

শহীদ ফেলে দিল ওর হাতের অস্ত্র। দেখাদেখি সবাই তাই করল। টলতে টলতে দেয়ালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অ্যাংগেলা।

দেয়ালের গায়ে ধূসর রঙের বোতাম দেখা যাচ্ছে। সেটা আঙুল দিয়ে চেপে ধরে ঘুরে দাঁড়াল সে। তাকাল সিলিংয়ের দিকে।

সিলিং থেকে দ্রুত নেমে আসছে একটি দড়ির ফাঁস।

অ্যাংগেলা চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে উঠল, 'অনেক খেলা দেখিয়েছ তুমি কুয়াশা। আর নয়! কোনরকম চালাকি করো না, মাথা ফুটো হয়ে যাবে! তোমাকেই আমাদের যত ভয়, দাঁড়াও, তোমার ব্যবস্থাই আগে করি।'

নেমে এসেছে মোটা দড়ির ফাঁস। কুয়াশাকে ঘিরে দাঁড়াল চারজন শত্রু। কুয়াশার মাথার দিকে তুলে ধরেছে সবাই আগ্নেয়াস্ত্র। অ্যাংগেলা ইঙ্গিত করতেই একজন এগিয়ে গেল। দড়ির ফাঁসটা পরিয়ে দিল সে কুয়াশার গলায়।

নিঃসাড় দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা। একজন শত্রু ইতিমধ্যেই ছিনিয়ে নিয়েছে তার হাত থেকে ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রটা। অ্যাংগেলা আবার হাত দিল দেয়ালে। চেপে ধরল হালকা নীল রঙের অপর একটি বোতাম।

ফাঁস চেপে বসল কুয়াশার গলায়।

অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। এত বড় বিপদ চোখের সামনে দেখেও কারও কিছু করার নেই।

অ্যাংগেলা এগিয়ে আসছে। সহকারীর হাত থেকে ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রটা নিল সে।

ফাঁসটা চেপে বসছে কুয়াশার গলায়। কুয়াশা হাত দিয়ে চেষ্টা করছে ফাঁসটা আলগা করার। এমন সময় দেখা গেল কুয়াশার পা দুটো মেঝে থেকে শূন্যে উঠে গেছে।

ফাঁসসহ মোটা দড়িটায় টান পড়েছে। ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে কুয়াশা উপর দিকে।

দম বন্ধ হয়ে আসছে কুয়াশার। পা ছুঁড়ছে সে শূন্যে।

'এইবার! সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়াও।'

অ্যাংগেলা কুৎসিত ভঙ্গিতে হাসছে।

পিছন থেকে রিভলভার, পিস্তলের খোঁচা খেয়ে প্রফেসর ওয়াই সহ সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়াল। ওদের চার হাত সামনে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাংগেলা। ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রটা ওদের দিকে ধরা। বোতামে চাপ দিতে যাচ্ছে সে। দেখে নিচ্ছে কুয়াশার এবং প্রফেসর ওয়াইয়ের দলবলকে গায়েব করে দেবার সাথে সাথে আর কেউ বা

আর কিছু তাদের লাইনে পড়ে যাবার ভয় আছে কিনা।

কুয়াশা মারা যাচ্ছে। নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না সে। পা দুটো এখন আর তেমনভাবে নড়ছে না। অবশ হয়ে আসছে দেহ।

এমন সময় টাশ্ করে একটা শব্দ হলো। মুখটা হাঁ হয়ে গেল অ্যাংগেলার। বুকের কাছে শার্ট ফুটো হলো, লাল তাজা রক্ত বেরিয়ে আসছে দেখা গেল কলকল শব্দে। চোখ দুটো আতঙ্ক আর মৃত্যু যন্ত্রণায় বিস্ফারিত।

ডি. কস্টা শুয়েই আছে। কিন্তু মাথাটা তুলে চেয়ে আছে সে অ্যাংগেলার দিকে। তার হাতে ছোট্ট একটা পিস্তল।

শহীদ একমুহূর্ত দেরি করেনি। ডি. কস্টার হাতের পিস্তল গর্জে ওঠার সাথে সাথে শহীদের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল। প্রফেসর ওয়াই পকেট থেকে অ্যাসিড পিস্তলটা বের করে শত্রুদের দিকে উঁচিয়ে ধরেছিল, শহীদ সেটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিল। অ্যাসিড পিস্তল সিলিংয়ের দিকে তুলে ধরে ট্রিগারে টান মারল ও। ছিঁড়ে গেল সিলিং থেকে ঝুলন্ত দড়িটা।

ঝুপ করে পড়ে গেল কুয়াশা। বসে পড়ল সে। তারপর ঢলে পড়ল তার দেহ। মনে হলো, জ্ঞান নেই।

এদিকে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে গেছে। শহীদ, কামাল, ডি. কস্টা এবং প্রফেসর ওয়াই গুলি করছে, অ্যাসিড নিক্ষেপ করছে। প্রফেসর ওয়াইয়ের হাতে এখন ভ্যানিশিং রে-র ভারি যন্ত্রটা।

শত্রুদের যন্ত্রণাকাতর চিৎকারে কান পাতা দায়।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটল। শত্রুপক্ষ পরাজিত। বেশির ভাগই গুরুতর আহত। অ্যাংগেলাসহ মোট পাঁচজন নিহত। শুধু নিহতই নয়, তারা ভ্যানিশিং রে-এর যাদুমন্ত্রে গায়েব হয়ে গেছে, বাতাসের সাথে মিশে গেছে সম্পূর্ণ।

শহীদ, কামাল এবং রাজকুমারী দ্রুত কাজ করছে। শত্রুদেরকে বেঁধে ফেলছে ওরা! প্রফেসর ওয়াই খেপে গেছে ভীষণ। তার অনুচর মারা গেছে চারজন। দুজন গুরুতর আহত।

'মি. কুয়াশা! আমি এর প্রতিশোধ নেব। আমার দলের লোকদের এভাবে খুন করেছে যারা, তাদেরকে আমি নিজে খুন করব…!'

হঠাৎ চুপ করল প্রফেসর ওয়াই। কোথায় কুয়াশা! তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না!

সাত

কুয়াশাকে দেখা গেল কয়েক মুহূর্ত পরই। দেব-মূর্তি রোটেনহেপো হেমনোসান ক্যান ক্যান-এর পিছন থেকে বেরিয়ে এল সে।

প্রফেসর ওয়াই ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল দেব-মূর্তির দিকে। দেব-মূর্তির চোখের নীল মণি দুটো নেই, সেখানে দুটো বড় আকারের গহ্বর দেখা যাচ্ছে।

'নীলকান্ত মণি দুটো কি হলো!'

প্রফেসর ওয়াই প্রায় মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠল।

কুয়াশা হাসল। বলল, 'আমি খুলে নিয়েছি। ভয় নেই, আর সবের মত এরও অর্ধেক ভাগ পাবে তুমি, অর্থাৎ একটা নীলকান্ত মণি তোমার···।'

প্রফেসর ওয়াই হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল। আচমকা হাসি থামিয়ে বলে উঠল সে উত্তপ্ত কণ্ঠে, 'ভাগ? ভাগবাঁটোয়ারায় আমি বিশ্বাসী নই! মি. কুয়াশা, আপনি একটা আস্ত বোকা! ভাগ করে কারা? দুর্বলরাই ভাগাভাগি করে। আমি কি দুর্বল? আমার কি শক্তির অভাব ঘটেছে? আমি ভাগাভাগিতে রাজি নই। এই রহস্যপুরীর সব ধন-সম্পদ আমি একা নেব!'

কুয়াশার মুখের চেহারা এতটুকু বদলাল না। আগের মতই হাসছে সে। বলল, 'তোমার কথা শুনে আশ্চর্য হচ্ছি না। এইরকম ব্যবহারই তোমার কাছ থেকে আশা করেছিলাম আমি।'

'সাবধান! কেউ নড়বে না! দেখছ তো, ভ্যানিশিং রে-র যন্ত্র আমার হাতে! কোনরকম চালাকি করতে দেখলেই গায়েব করে দেব! মাথার ওপর হাত তোলো সবাই।'

সবাই চেয়ে আছে প্রফেসর ওয়াইয়ের দিকে। মি. সিম্পসন দাঁতে দাঁত চাপছে। শহীদকে দেখে মনে হচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে প্রফেসরের দিকে লাফিয়ে পড়বে সে। কামাল রাগে কাঁপছে মৃদু মৃদু।

মহুয়া আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ভ্যানিশিং রে-র যন্ত্রটার দিকে।

ডি. কস্টা চেয়ে আছে কুয়াশার দিকে। চেয়ে আছে রাজকুমারীও।

কোথাও কোন শব্দ নেই। থমথমে পরিবেশ। যেন ঝড় উঠবে, চারদিকে তারই পূর্বাভাষ।

'কাউকে আমি কিছু বলব না। সবাইকে বেঁধে রেখে যাব আমি। ফিরে আসব খানিক পর। ঘন্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাবে আমার স্বয়ংক্রিয় প্লেন। সেই প্লেনে আমার অনুচরেরা তুলবে পঞ্চাশ মণ সোনা এবং বাইশ মণ হীরা-জহরত-মুক্তো; এই রহস্যপুরীতে বন্দী থাকবেন আপনারা। পারলে নিজেদেরকে মুক্ত করবেন, না পারলে না খেয়ে মরবেন। তবে আপনাদের একজনকে আমি সাথে করে নিয়ে যাব।'

রাজকুমারীর দিকে তাকাল প্রফেসর ওয়াই। বলতে শুরু করল আবার, 'রাজকুমারী ওমেনা, তুমি একটা জিনিয়াস। তোমার ব্রেনের তুলনা হয় না। তুমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাও। এই গুণটা তুমি আমার স্বার্থে ব্যবহার করবে। তাছাড়া, তোমার সাবসোনিক র‍্যাডিয়েশনটাও খুব কাজের জিনিস! ওটা নিয়ে পরীক্ষা চালাব আমি। তোমাকে আমার দরকার। নিয়ে যাব সঙ্গে করে তোমাকে···।'

রাজকুমারী চোখ বুজে ফেলল। সাবসোনিক র‍্যাডিয়েশন আমদানী করার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু প্রফেসর ওয়াই হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে ভারি ভ্যানিশিং রে-র যন্ত্রটা সজোরে বসিয়ে দিল রাজকুমারীর মাথায়।

সেই মুহূর্তে গুলি বর্ষণের শব্দ হলো। একযোগে গর্জে উঠল পাঁচছয়টা পিস্তল ও

রিভলভার।

ডান হাতের কনুইয়ের উপর বুলেট খেয়ে বসে পড়ল শহীদ। কামালের কোথায় গুলি লাগল বোঝা গেল না। পড়ে গেল সে গুলি খেয়ে। ডি. কস্টা শুয়ে পড়েছে, মাথা উঁচু করে দেখছে সে পরিস্থিতিটা। মি. সিম্পসন এখনও অক্ষত, শুয়ে পড়েছেন তিনিও। ক্রল করে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছেন প্রফেসর ওয়াইয়ের দিকে।

প্রফেসর ওয়াইয়ের অনুচরেরা বিরতি দিচ্ছে না, তাদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে চলেছে প্রতি মুহূর্তে।

প্রথম গুলির শব্দ হবার সাথে সাথে দেবমূর্তি রোটেনহেপো হেমনোসান ক্যান ক্যান-এর পিছনে গা ঢাকা দিয়েছে কুয়াশা।

খানিকপর দেখা গেল দেবমূর্তির চোখ দুটোর জায়গায় যে গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে, দেখা যাচ্ছে দুটো রিভলভারের নল। গর্জে উঠল রিভলভার দুটো।

প্রফেসর ওয়াইয়ের দুজন অনুচর লুটিয়ে পড়ল রক্তাক্ত অবস্থায়। ক্রল করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন মি. সিম্পসন। শহীদ তাঁকে ছাড়িয়ে সামনে চলে গেল।

মি. সিম্পসন দিক পরিবর্তন করলেন।

কুয়াশার রিভলভার গর্জে উঠল আবার দেব-মূর্তির চোখের পিছন থেকে।

প্রফেসর ওয়াইয়ের অনুচরদের যন্ত্রণাক্ত চিৎকারে কান পাতা দায়। শহীদ প্রফেসর ওয়াইয়ের পিছনে গিয়ে পৌঁছেছে। প্রফেসরের শক্ত পাথরের মত পা ধরে হেঁচকা টান মারল ও।

পড়ে গেল প্রফেসর। এক লাফে শহীদ প্রফেসরের বুকের উপর চেপে বসল।

প্রফেসরের মুখে অদ্ভুত একটা হাসি খেলে গেল। হাতের ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রটা ছাড়েনি। অপর হাত দিয়ে শহীদের বুকে ধাক্কা মারল সে। ছিটকে পড়ে গেল শহীদের দেহ পাঁচ হাত দূরে। তড়াক করে স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল প্রফেসর ওয়াই।

কুয়াশাকে দেখা গেল এই সময়।

মি. সিম্পসনকে দেখা গেল একজন শত্রুর বুকে উঠে বসে তার গলা চেপে ধরেছেন শক্ত হাতে।

প্রফেসর ওয়াইয়ের অনুচরেরা সবাই কাবু—কেউ নিহত, কেউ আহত।

প্রফেসর ওয়াই একা! চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল সে পরিস্থিতিটা। তারপর মেঝে থেকে এক হাত দিয়েই টেনে তুলল রাজকুমারীর অজ্ঞান দেহটা। অনায়াস ভঙ্গিতে দেহটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠল সে, 'কেউ বাধা দিতে এসো না। আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছে—খুন করে ফেলব!'

ঘুরে দাঁড়াল প্রফেসর ওয়াই।

গম্ভীর কণ্ঠে কথা বলে উঠল কুয়াশা, 'ওয়াই, দাঁড়াও!'

প্রফেসর দাঁড়াল না, ফিরেও তাকাল না সে।

'ওয়াই, দাঁড়াও।' গর্জে উঠল কুয়াশা বাঘের মত।

কিন্তু মি. সিম্পসন বাক্যব্যয় না করে কাজে নেমে পড়লেন। হাতের চকচকে

রিভলভারটা তুললেন তিনি।

বেরিয়ে যাচ্ছে প্রফেসর ওয়াই। আর মাত্র কয়েক হাত সামনেই একটি দরজা, দরজা পেরিয়ে গেলেই সব শেষ হয়ে যাবে।

গর্জে উঠল মি. সিম্পসনের হাতের রিভলভার।

একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার···

অব্যর্থ লক্ষ্য। ছয়টা গুলিই লাগল প্রফেসরের শরীরে। তাজা লাল রক্ত বেরিয়ে আসছে তার হাঁটু, কোমর, পিঠ এবং ঘাড় থেকে।

দাঁড়ায়নি প্রফেসর ওয়াই। যন্ত্রণা বা ব্যথার কোন চিহ্ন নেই তার হাঁটার ভঙ্গিতে। যেন কিছুই হয়নি। তেমনি দৃঢ় পায়ে হেঁটে চলেছে সে।

আবার ট্রিগারে চাপ দিলেন মি. সিম্পসন। ক্লিক করে শব্দ হলো, বুলেট বের হলো না।

মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল প্রফেসর ওয়াই। মুচকি হাসল একটু, তারপর পা বাড়াল দরজার দিকে। চৌকাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সে, নাগালের বাইরে।

'এই শেষবার বলছি, ওয়াই, দাঁড়াও!'

কুয়াশার গমগমে কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোন শব্দ হলো না। ঠিক সেই সময় প্রফেসর ওয়াই কাঁধ থেকে রাজকুমারীকে সামনে ফেলে দিয়ে লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল তিন হাত।

রাজকুমারী ওমেনা উঠে দাঁড়াল। জ্ঞান খানিক আগেই ফিরেছে ওর। সাবসোনিক র‍্যাডিয়েশন আমদানী করেছে সে নিজের দেহের চারদিকে। সেই র‍্যাডিয়েশনের শক খেয়েছে প্রফেসর। প্রফেসর বলে এ যাত্রা রক্ষা পেল, অন্য কেউ হলে ঘণ্টাখানেকের জন্য সম্পূর্ণ প্যারালাইজড হয়ে মড়ার মত পড়ে থাকত।

ঠক ঠক করে কাঁপছে প্রফেসর ওয়াই। রাজকুমারীর দিকে চেয়ে আছে সে। রাজকুমারী এগিয়ে আসছে স্বপ্নাচ্ছন্ন, ঘুমন্ত মানুষের মত তার দিকে।

প্রফেসর ওয়াই শক্ত হাতে ধরে আছে ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রটা। ইচ্ছা করলেই সে ওমেনাকে গায়েব করে দিতে পারে। কিন্তু তা সে করবে না। ওমেনাকে তার দরকার, আজ হোক কাল হোক সে ওকে বন্দী করে নিয়ে যাবেই···।

পিছিয়ে যাচ্ছে প্রফেসর ওয়াই। এক পা এক পা করে পিছিয়ে যাচ্ছে।

সবাই দেখছে কাণ্ডটা। নীরবতা ভাঙছে না কেউ।

পিছিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ লাফ দিয়ে একেবারে মহুয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াল প্রফেসর ওয়াই, ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রটা চেপে ধরল মহুয়ার বুকের উপর নির্মমভাবে, সেই সাথে বিকট কণ্ঠে গর্জন করে উঠল, 'মি. কুয়াশা! ওমেনাকে থামতে বলুন।'

বলতে হলো না, মহুয়ার বিপদ দেখে রাজকুমারী দাঁড়িয়ে পড়ল।

কর্কশ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল প্রফেসর ওয়াই। তারপর, একসময় থামল সে। বলল, 'আমি ভেবেছিলাম নিষ্ঠুরতা না দেখালেও আপনারা আমার প্রতিহিংসা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। কিন্তু আসলে দেখছি তা নয়। আমার হিংস্রতা সম্পর্কে

আপনারা কিছু জানেন না। মি. কুয়াশা, বারবার আপনাকে আমি সাবধান করে দিয়েছি, বলেছি, আমার কাজে বাধা দেবেন না। কিন্তু এখন দেখছি আপনার শিক্ষা হয়নি, হবেও না। যাতে শিক্ষা হয় তার ব্যবস্থা করব এখন আমি। আপনি সবচেয়ে বেশি যাকে ভালবাসেন তাকে আমি শেষ করে দিয়ে যাব এখন। সবচেয়ে প্রিয়জনকে হারিয়ে আপনি হয়তো প্রতিজ্ঞা করবেন, প্রফেসর ওয়াইয়ের বিরুদ্ধে আর কোন কাজ করব না। মি. কুয়াশা, চেয়ে দেখুন, আপনার সবচেয়ে প্রিয়পাত্রী, আপনার নিজের বোন মহুয়াকে আমি কি রকম শান্তভাবে ভ্যানিশিং রে-এর সাহায্যে এই পৃথিবী থেকে গায়েব করে দিচ্ছি…।'

'বাঁচাও! দাদা…শহীদ…' আর্তনাদ করে উঠল মহুয়া।

'ওয়াই, থামো।'

গর্জে উঠল কামাল।

শহীদ কথা বলল না। চেয়ে আছে। লাফিয়ে পড়ার জন্য তৈরি ও। কুয়াশা ইঙ্গিত করল, নিষেধ করছে সে শহীদকে প্রফেসরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে।

প্রফেসর ওয়াই সময় নষ্ট করতে রাজি নয়। ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রের বোতামে চেপে বসল তার আঙুল…

কিন্তু হঠাৎ, অপ্রত্যাশিতভাবে অবশ হয়ে গেল প্রফেসর ওয়াইয়ের হাতের আঙুলগুলো। বিদ্যুৎবেগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে কুয়াশার দিকে।

'আ…আপনি!' হাঁ হয়ে গেছে প্রফেসর ওয়াই-এর মুখটা, বিস্ফারিত চোখে গিলছে যেন কুয়াশাকে।

একটা পকেটঘড়ির মত গোলাকার ছোট্ট যন্ত্র দেখা যাচ্ছে কুয়াশার হাতে। যন্ত্রের গায়ে অনেকগুলো বোতাম। কুয়াশা একটি বোতাম আঙুল দিয়ে চেপে ধরে রেখেছে। হাসছে সে মিটিমিটি।

প্রফেসর ওয়াইয়ের দিকে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসছে কুয়াশা। প্রফেসরের কাছে এসে দাঁড়াল সে। হাত বাড়িয়ে আস্তে করে ভ্যানিশিং রে-এর যন্ত্রটা তুলে নিল প্রফেসরের হাত থেকে।

'আ…আপনি!'

বিশ্বাস করতে পারছে না যেন প্রফেসর ওয়াই।

কুয়াশা হাসতে হাসতে বলল, 'হ্যাঁ, আমি তোমাকে পরিচালনা করার যন্ত্রটা আবার তৈরি করে ফেলেছি!'

কুয়াশার কথাটা শেষ হওয়া মাত্র দুই হাত উপর দিকে তুলে প্রফেসর ওয়াই লাফাতে লাফাতে হাহাকার করে উঠল।

'সব শেষ হয়ে গেল! সব শেষ হয়ে গেল আমার! মি. কুয়াশা, এ আপনি কি সর্বনাশ করলেন! কি হবে, কি লাভ হবে, কি লাভ হবে আর আমার বেঁচে! মেরে ফেলুন, মেরে ফেলুন আমাকে। ধ্বংস করে ফেলুন আপনি আপনার সৃষ্টিকে! একটা যান্ত্রিক পুতুল হিসেবে আমি বাঁচতে চাই না…চাই না!'

টলতে টলতে, চিৎকার করতে করতে উন্মাদের মত এগিয়ে যাচ্ছে প্রফেসর ওয়াই। বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছে যেন সে।

মি. সিম্পসন ব্যঙ্গভরে বলে উঠলেন, 'ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না। শয়তান প্রফেসর হঠাৎ এমন প্রলাপ বকতে শুরু করল কি মনে করে? নতুন কোন অভিনয় নাকি? আমাদেরকে অন্যমনস্ক করে…।'

শহীদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'না। প্রফেসর ওয়াই প্রলাপ বকছে না।'

কামাল উত্তেজিতভাবে এক পা সামনে বাড়াল, 'তারমানে! কি বলতে চাইছিস তুই, শহীদ?'

শহীদ একটু হাসল। বলল, 'তোরা কেউ জানিস না। কিন্তু আমি অনেকদিন আগে থেকেই জানি। প্রফেসর ওয়াই মানুষ নয়।'

মি. সিম্পসন, কামাল, ডি. কস্টা, রাজকুমারী—সকলে একযোগে সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'মানুষ নয়?'

শহীদ বলল, 'না। প্রফেসর ওয়াই একটা যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়। ওর শরীরটা তৈরি হয়েছে কৃত্রিম মাংস দিয়ে। ব্রেনটা কম্পিউটারের উন্নত সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রফেসর ওয়াইকে ঠিক রোবটও বলা চলে না। রোবটের চেয়ে অনেক বেশি নিখুঁত এবং উন্নত করে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রফেসর ওয়াইকে। মানুষের হুবহু মেকানিক্যাল সংস্করণ বলা যেতে পারে ওকে। পরিচালিত হয় স্বয়ংক্রিয় ভাবে। নিজের বোধ, অনুভূতি, বুদ্ধি, সৃজনীশক্তি—সবই ওর আছে। ওর স্রষ্টা ওকে নিজের বিজ্ঞান সাধনার কাজে ব্যবহার করার জন্যে একটা রেডিও আবিষ্কার করেছিল। রেডিও ওয়েভ-এর সাহায্যে সে ওকে নিজের খুশিমত পরিচালিত করতে পারত। কিন্তু প্রফেসর ওয়াই তার স্রষ্টার দান করা জ্ঞান ও বুদ্ধির চেয়ে বেশি জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হয়ে দাঁড়ায়। সে নিজের পদ্ধতি অনুযায়ী বিজ্ঞানের সাধনা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে তার স্রষ্টার সাথে বিরোধ দেখা দেয়। তারপর প্রফেসর ওয়াই সেই রেডিওটা চুরি করে নষ্ট করে ফেলে। এবং সে নিজের শরীরের যন্ত্রপাতিতে এমন কিছু পরিবর্তন ঘটায় যে তার স্রষ্টার আর সাধ্য থাকে না তাকে বশ করার।'

'প্রফেসর ওয়াইয়ের স্রষ্টা—কে সে!'

শহীদ বলল, 'প্রফেসর ওয়াই কুয়াশাকে কি বলল শুনলি না? কুয়াশাই প্রফেসর ওয়াইকে তৈরি করেছিল।'

কুয়াশার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'থামো, ওয়াই!'

প্রফেসর থামল না। নিজের বুকে চাপড় মেরে প্রচণ্ড শব্দ তুলে এগিয়ে যাচ্ছে সে। পাগলের মত চেঁচাচ্ছে, 'মেরে ফেলুন! শেষ করুন এই যান্ত্রিক পুতুলের জীবন! আপনি সৃষ্টি করেছেন আমাকে —কিন্তু স্বাধীনতা দেননি। নিজের ইচ্ছা মত কাজ করার সুযোগ দেননি। অনেক কষ্টে আপনার প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত করেছিলাম। আজ আবার বন্দী হলাম আপনার হাতের মুঠোয়! এই বন্দী জীবন দরকার নেই আমার—যবনিকা টানুন এই নাটকের!'

কুয়াশা তার হাতের গোলাকার যন্ত্রের গায়ে বসানো অনেকগুলো বোতামের একটিতে চাপ দিল।

মাথার উপর থেকে প্রফেসরের হাত দুটো দুপাশে ঝুলে পড়ল। স্থির হয়ে গেল তার দেহটা। নড়াচড়ার শক্তি হঠাৎ যেন সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে সে।

কুয়াশাকে গম্ভীর দেখাচ্ছে।

কথা বলল সে ভারী গলায়, 'নিজের সৃষ্টিকে কে-ই বা ধ্বংস করতে চায়, ওয়াই? তোমার অনেক অত্যাচার আমি সহ্য করেছি। তুমি কত যে ক্ষতির কারণ হয়েছ আমার তা বলে শেষ করা যায় না। তবু তোমাকে ধ্বংস করে ফেলতে পারিনি। তোমাকে আমি তৈরি করেছিলাম অনেক পরিশ্রম, অনেক ত্যাগ স্বীকার করে। তোমাকে নিয়ে অনেক বড় স্বপ্ন দেখতাম আমি। বিজ্ঞানের সাধনায় তোমার ব্রেনকে কাজে লাগিয়ে এমন সব আবিষ্কার একটার পরে একটা করব যা দেখে পৃথিবীর মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যাবে। কিন্তু ভুল করে ফেলেছি আমি গোড়াতেই। তোমাকে আমি অনেক বেশি বুদ্ধি দিয়ে ফেলেছিলাম! তুমি আমাকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে সবদিক থেকে তা আমি দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি।'

'ধ্বংস করে ফেলুন! আমি আর বাঁচতে চাই না···।' বিড় বিড় করে বলল প্রফেসর ওয়াই।

কুয়াশা হঠাৎ কঠোর হয়ে উঠল, 'না! ধ্বংস তোমাকে আমি করব না। তা আমি পারি না। আমি এখনও সম্পূর্ণ নিরাশ হইনি। আমি চেষ্টা করব তোমার ত্রুটি সারিয়ে আবার নিজের অধীনে নিয়ে আসতে। যাও, ওয়াই, নিঃস্ব হয়ে বেরিয়ে যাও! তোমাকে আমি বন্দী করেও রাখব না। স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াও তুমি পৃথিবীর বুকে। কিন্তু সাবধান, কারও কোন ক্ষতি করার চেষ্টা কোরো না। সেক্ষেত্রে আমি তোমাকে বন্দী করে রাখব। যাও, খালি হাতে বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আমি তোমার সব ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দখল করে নিচ্ছি তোমার সব আস্তানা। ক্ষমতাহীন একা তুমি। তোমার জীবন-মৃত্যু এখন আমার হাতে।'

বিরতি নিল কুয়াশা। তারপর কঠিন কণ্ঠে দুটো শব্দ উচ্চারণ করল, 'গেট আউট!'

টলতে টলতে ঘুরে দাঁড়াল মেকানিকাল প্রফেসর ওয়াই। টলতে টলতে হাঁটছে সে। মনে হচ্ছে পড়ে যাবে। কিন্তু পড়ল না। ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল সে দরজা দিয়ে।

আধঘণ্টা পর প্রফেসর ওয়াইয়ের স্বয়ংক্রিয় পাইলটহীন অ্যারোপ্লেন ল্যাণ্ড করল রহস্যপুরীর প্রকাণ্ড পাকা উঠানে।

অপেক্ষা করছিল ওরা। পঞ্চাশ মণ স্বর্ণ, বাইশ মণ মহামূল্যবান হীরে, মুক্তো, জহরত তোলা হলো প্লেনে।

নিজের হাতে শহীদ, কামাল এবং ডি. কস্টার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে কুয়াশা। বিদেশী আহত শত্রুদের চিকিৎসার দায়িত্ব পালন করছে রাজকুমারী ওমেনা।

প্লেনে তোলা হলো বন্দীদেরকে। তারপর নিজেরা চড়ল ওরা।

ঘণ্টা দুয়েক পর আবার আকাশে উড়ল প্লেন।

অভিযান সফল হয়েছে। রহস্যপুরীর রহস্য হয়েছে উন্মোচিত।

'আমার জীবনের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ঘটনা হলো প্রফেসর ওয়াইয়ের প্রকৃত

পরিচয় জানা। কুয়াশা, তোমাকে শ্রদ্ধা জানাই!' মি. সিম্পসন কথাগুলো বললেন।

কি যেন ভাবছে কুয়াশা। অন্যমনস্ক, বিষণ্ণ দেখাচ্ছে তাকে। মি. সিম্পসন ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন। আর কোন কথা বললেন না তিনি।

হঠাৎ সকলের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কুয়াশা। চোখ দুটো যেন ভিজে ভিজে বলে মনে হলো।

স্তম্ভিত সবাই।

আবেগে আপ্লুত কণ্ঠে কুয়াশা শুধু জানতে চাইল, 'তোমাদের কি মনে হয় বলো তো? ওয়াই কি নিজের ভুল বুঝতে পারবে! সে কি সংশোধন করবে নিজেকে? তার কি সুমতি ফিরে আসবে আবার?'

মুখ ফিরিয়ে নিল কুয়াশা। আবার আনমনা হয়ে পড়ল সে।

প্লেন ছুটে চলেছে আরব সাগরের উপর দিয়ে। বাংলাদেশ অভিমুখে।

কুয়াশা ৫১

প্রথম প্রকাশ : মে, ১৯৭৬

এক

সেই রহস্যময় মৃত্যুর প্রথম শিকার মনির। মনিরের সাথে জঙ্গলে তার দুই বন্ধু ছিল। ব্যাপারটা তারাও লক্ষ্য করে। কিন্তু তাদের কাছে ওটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। মনিরের মৃত্যুর আসল কারণ নিয়ে তারা মাথাই ঘামাল না।

ওরা তিনজন শহরের বাইরে, একটা জঙ্গলে ঢুকে আমোদ-ফুর্তি করছিল। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মদ খাওয়া, নিরালায় নেশা করে মাতলামি করা। তিনজনই অবৈধ উপায়ে টাকা পয়সা রোজগার করে জীবন যাপন করে। তাতে বেশ কিছু পয়সা এলেই মদ খেয়ে তা ওড়ায়। বাকি দু'জনের মতই, সিনেমার টিকেট ব্ল্যাকে বিক্রি করত মনির।

বেশ নেশা হয়েছিল ওদের। টলছিল তিনজনই। নেশা হয়েছিল বলেই চোখের সামনে যা দেখল তা চোখের ভুল বলে ধরে নিল, কোন গুরুত্ব দিল না। নেশা করলে, সামনের দৃশ্য বিদঘুটে ভাবে বদলে যায়, যা নয় তাই দেখে, সে অভিজ্ঞতা ওদের ছিল। ব্যাপারটাকে ওরা তার বেশি কিছু মনে করল না।

ঘটনাটা ঘটল ঠিক সন্ধ্যার সময়। মনির হাঁটছিল সকলের আগে আগে। বহু পুরাতন একটি হিন্দি ছবির গান থেমে থেমে আওড়াবার চেষ্টা করছিল সে। পা টলছিল। মনিরের দুই বন্ধু ছিল একটু পিছনে।

হঠাৎ মনিরের লম্বা দেহটা বেঁকে গেল। চোখ দুটো হয়ে উঠল বিস্ফারিত। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে সে। তার হাত দুটো সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে মাথার উপরে ঘুরল দু'একবার, তারপর দৌড়ুবার চেষ্টা করল সে।

মনিরের পিছনে বাকি দু'জনও দাঁড়িয়ে পড়েছে, হাঁ হয়ে গেছে তাদের মুখ। অল্প অল্প পোড়া গন্ধ ছিল তখন বাতাসে। এবং সামনের দৃশ্য এমন অদ্ভুত হয়ে উঠেছিল যে তেমন দৃশ্য তারা তাদের জীবনে আর কখনও দেখেনি। মনে হচ্ছিল, বাতাসকে দেখতে পাচ্ছে তারা, ঢেউ খেলানো বাতাসের পর্দা তাদের চোখের সামনে আলোড়িত হচ্ছে।

মনির আর্তনাদ করে উঠল। আর্ত চিৎকারের শব্দটা উচ্চকিত হয়ে ওঠার আগেই, মাঝপথে, থেমে গেল। কেউ যেন গলা চেপে ধরেছে মনিরের, তাই আর চিৎকার বের হচ্ছে না।

মনিরের বন্ধুরা পিছন ফিরেই দৌড় মারল। ভয়ে আধমরা হয়ে গেছে দু'জনই।

খানিক দূরে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। মনিরকে দেখা যাচ্ছে। ঘাসের উপর পড়ে

আছে সে। নড়াচড়ার কোন লক্ষণ নেই।

আরও খানিক পর সাহস ফিরে পেয়ে মনিরের কাছে এসে হাজির হলো ওরা। কোথাও তখন আর কোন রকম ভয়ের কিছু নেই। মনিরের দেহ পোড়েওনি, হাড়-পাঁজরাও সব ঠিক আছে, এক ফোঁটা রক্তও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। কিন্তু তবু, মনির বেঁচে নেই। নিঃশ্বাস পড়ছে না তার, পালসও নেই।

রাতে মনিরের লাশ উদ্ধার করা হলো। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ভদ্রলোক মনিরকে চিনতেন। তিনি জানতেন মনির ইদানীং পকেট মারার কাজ ছেড়ে দিয়ে সিনেমার টিকেট ব্ল্যাক করত। মৃতদেহ দেখে খুব একটা দুঃখ পেলেন না অফিসার। মদের গন্ধ পেলেন, পাম্প করে মদ বেরও করা হলো বেশ খানিকটা। ডেথ রিপোর্টে লেখা হলো: acute alcoholism.

পোস্ট মর্টেমের অর্ডার দিলেন না তিনি।

সুতরাং, মনিরের মৃত্যুর কারণ অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেল। রহস্যটার সমাধান হলো না।

অ্যাডভোকেট মোখলেসুর রহমানও একটা অদ্ভুত রহস্যের সন্ধান পেলেন। প্রথমে তিনি ব্যাপারটাকে মোটেই রহস্যময় বলে মনে করেননি।

অদ্ভুত একটা আলো গত কয়েকদিন থেকেই দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি। তেমন মনোযোগ দেননি। কিন্তু হঠাৎ যেদিন আবিষ্কার করলেন যে আলোটা একমাত্র তিনিই দেখতে পাচ্ছেন, আর কারও চোখে পড়ছে না, অমনি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

কৌতূহলী হয়ে উঠলেন বটে কিন্তু তিনি যে প্রকৃত পক্ষে কি আবিষ্কার করে ফেলেছেন তা জানলেন না। যদি জানতেন তাহলে ঘটনা অন্যরকম ঘটত। কয়েকশো লোকের প্রাণ অন্তত বাঁচানো যেত অনায়াসে।

টিকেট ব্ল্যাকার মনিরের মৃত্যু সম্পর্কে মোখলেসুর রহমান কিছু জানতেন না। অবশ্য জানলেও এই রহস্যময় আলোক-সঙ্কেতের সাথে তার মৃত্যুর কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে করার কোন কারণ ছিল না।

আলোটা আপাতদৃষ্টিতে তাৎপর্যহীন। দেখতে অনেকটা লম্বা সূর্যকিরণের মত। মোখলেসুর রহমান ব্যতীত অন্য কেউ হলে আলোটাকে সূর্যকিরণ বলে ভুল করত হয়তো।

মোখলেসুর রহমানের অফিসটা এক দশতলা বিল্ডিংয়ের সাততলায়। সূর্যকিরণ সেখানে প্রবেশ করার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া, মোখলেসুর রহমান তো সূর্যকিরণ দেখতেই পান না। তিনি বেশ কিছুদিন থেকে স্নো-ব্লাইণ্ড।

বড়, রঙিন কাঁচের চশমা পরে থাকেন তিনি। কিছুদিন আগে কানাডা থেকে বেড়িয়ে ফিরেছেন, সাথে করে নিয়ে এসেছেন এই অসুখ। কানাডার স্কিয়িং দেখতে গিয়ে সাবধান না হওয়ায় চোখের এই অসুখ হয় তাঁর। লিখতে পড়তে পারেন না একদম। নিজের উপর বিরক্তিতে অফিস কামরার মেঝেতে পায়চারি করেন। অ্যাডভোকেট তিনি, বেশ নামডাক আছে। লিগ্যাল ডকুমেন্ট রচনা করার জন্য, ল

বুক পড়ার জন্য দৃষ্টিশক্তি একান্ত দরকার তাঁর—কিন্তু নিজের দোষে স্নো-ব্লাইণ্ড হয়ে বসে আছেন। সুতরাং মহা খাপ্পা হয়ে আছেন নিজেরই উপর।

তবে চোখ দুটো ধীরে ধীরে ভাল হয়ে আসছে। যদিও এখনও তিনি প্রায় কিছুই দেখতে পান না খালি চোখে।

কিন্তু অদ্ভুত, রহস্যময় আলোটা তিনি ঠিকই দেখতে পাচ্ছিলেন।

গত কয়েকদিন ধরেই দেখছিলেন, সেদিন হঠাৎ ব্যাপারটা মনোযোগ আকর্ষণ করল তাঁর। চোখ থেকে চশমা খুলে জানালার বাইরে তাকালেন তিনি। না, দেখা যাচ্ছে না। আবার পরলেন চশমা। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। রহস্যময় ব্যাপার। সন্দেহ হলো। ডাকলেন জুনিয়র উকিলকে। বললেন, 'দেখো তো কোন আলো দেখতে পাও কিনা?'

জুনিয়র উকিল বলল, না, কোন বিশেষ আলো সে দেখতে পাচ্ছে না।

অবাক কাণ্ড! মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল মোখলেসুর রহমানের। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তিনি এ ব্যাপারটা নিয়ে আর বিশেষ মাথা ঘামালেন না।

মোখলেসুর রহমানকে দোষ দেয়া যায় না। কারণ তিনি নিজের পেশা সংক্রান্ত একটি ব্যাপারে গত কয়েকদিন থেকে দুশ্চিন্তায় ছিলেন। গত কয়েকদিন আগে একজন মক্কেলের আসার কথা। কিন্তু তিনি আসেননি। না আসার কোন কারণ নেই, তবু ভদ্রলোক কেন আসছেন না—এই কথা ভেবে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

পরদিন আবার সেই আলো লক্ষ্য করলেন মোখলেসুর রহমান। তিনি দেখলেন, সব সময় আলোটাকে দেখা যায় না। বিশেষ বিশেষ সময়ে দেখা যায়। আলোগুলোও বিভিন্ন রকমের। কোন কোনটা ছোট, কোনটা আবার বড়।

হঠাৎ তাঁর সন্দেহ হলো, আলোগুলো কোন সঙ্কেত নয় তো?

সন্দেহটা মনে জাগতেই সিরিয়াস হয়ে উঠলেন তিনি। কিন্তু এ ব্যাপারে সন্ধান চালাবার আগেই আলো নিক্ষেপ বন্ধ হয়ে গেল। তা হোক, মোখলেসুর রহমান ইতিমধ্যে পুরোপুরি সজাগ হয়ে উঠেছেন। কাজের কথা, মক্কেলের কথা ভুলে গেছেন তিনি। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে, আবার যদি আলোটা দেখতে পান।

একটা জিনিস আগেই লক্ষ্য করেছেন তিনি। আলোটা নিচের দিক থেকে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হয়। একটু কোণাকুণি, তির্যকভাবে। আশপাশে উঁচু উঁচু অনেক বিল্ডিং দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কোন বিল্ডিংয়ের গায়েই আলোটা লাগে না। বিল্ডিংগুলোকে পাশ কাটিয়ে আলোটা সোজা আকাশের দিকে উঠে যায়।

চিন্তা করতে করতে ভুরু জোড়া কুঁচকে ওঠে মোখলেসুর রহমানের। আলোগুলো যদি কোন ধরনের সঙ্কেত বা সিগন্যাল বলে ধরে নেয়া যায় তাহলে প্রশ্ন ওঠে কার বা কাদের উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছে এই সঙ্কেত?

রহস্যটা বুঝতে পারেন না তিনি। নিঃশব্দে, প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে, চেয়ে আছেন সামনের দিকে। রাস্তার ওপারের বিল্ডিংটার আউটলাইন কোনরকমে দেখতে পাচ্ছেন। চোখের দোষে প্রকাণ্ড বিল্ডিংটার আর কোন বৈশিষ্ট্য দেখতে

পাচ্ছেন না। কিন্তু অকস্মাৎ ঝলসে উঠল তাঁর চোখ, আবার তিনি দেখতে পেলেন সেই রহস্যময় আলো।

দ্রুত সেই আলো জ্বলছে আর নিভছে। আশ্চর্যবোধক একটা শব্দ বেরিয়ে এল মোখলেসুর রহমানের গলা থেকে। ব্যস্ততার সাথে পকেট থেকে একটা পেন্সিল বের করলেন তিনি। পরমুহূর্তে অসহায়ের মত এদিক ওদিক তাকালেন মাথা ঘুরিয়ে। তারপর চিৎকার করে ডাকলেন সহকারীকে।

জুনিয়র উকিল ছুটে এল তার রুম থেকে। কথা বলার অবসর দিলেন না মোখলেসুর রহমান তাকে। ডিকটেক করতে শুরু করলেন ঝড়ের বেগে। তিনি যা বলে গেলেন আপাতদৃষ্টিতে তার কোন অর্থই হয় না। তবু জুনিয়র উকিল হুকুম পালন করে গেল। দ্রুত লিখল সে প্রতিটি অক্ষর। তারপর অক্ষর লেখা কাগজটা বাড়িয়ে দিল বসের দিকে।

অক্ষরগুলো এইভাবে সাজানো:

QPWDZ	BRHYZ	BBOPD	WICGH
WGBUF	QXPUM	WBEIE	CHAUK
EBRQS	LTGJP	RINDU	LYLMF
QETYM	FINDP	BDTCZ	VPTQD
BMSSS			

আলোক সঙ্কেত থেমেছে।

মোখলেসুর রহমান প্রায় চিৎকার করে উঠলেন উত্তেজিত ভাবে, 'কপি করো, কপি করো। বড় বড় করে লেখো অক্ষরগুলো। তারপর একটা একটা করে পড়ে শোনাও!'

মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি রেডিও অপারেটর হিসেবে ট্রেনিং নিয়েছিলেন। ইন্টারন্যাশনাল কোডে পাঠানো মেসেজ অনায়াসেই পড়তে পারতেন তিনি। যুদ্ধের পর শখের বশবর্তী হয়ে সাইফার কোডও শিখে ফেলেছেন।

বর্তমান আলোক সঙ্কেত করা হয়েছে মাঝারি ধরনের কঠিন সাইফার কোডে। কিন্তু প্রথম দুটো শব্দ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং এ থেকেই সূত্র পেয়ে যান তিনি। শব্দ দুটো সাইফার কোডে নয়। শব্দ দুটোর অর্থ:

ডেথ টুডে।

অর্থাৎ: আজ মৃত্যু।

রাস্তার ওপারের বিল্ডিংয়ের সাততলার একটি রুমের জানালার সামনে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল একজন লম্বা, স্বাস্থ্যবান, সুবেশী লোক। ঘুরে জানালার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল সে। মুখের হাসিটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে উঠল চেহারাটা। হাতের সিগারেটটা মেঝেতে ফেলে জুতো দিয়ে চেপে ধরল। মুখ তুলে তাকাল তার সঙ্গীর দিকে। কঠিন গলায় বলে উঠল, 'কানা উকিল লোকটা সম্পর্কে তোমার ধারণাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে।'

'এখন কর্তব্য কি?' সঙ্গী লোকটা চাপা গলায় প্রশ্ন করল।

'কর্তব্য একটাই।'

লম্বা লোকটা দরজার দিকে পা বাড়াল, 'আমাদের ব্যাপারে কেউ কৌতূহল দেখালে তাকে তার পরিণাম ভোগ করতেই হবে। সে পরিণাম অবশ্যই চরম কিছু হতে বাধ্য। আমি কর্তব্যটা সেরে আসি।'

দৃঢ় পায়ে অফিস রুম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

এদিকে মোখলেসুর রহমানের সহকারী উকিল অক্ষরগুলো বড় বড় করে লিখে দিয়েছে একটা কাগজে। মোখলেসুর রহমান টেবিলে ঝুঁকে পড়ে গভীর মনোযোগের সাথে অক্ষরগুলোর অর্থ উদ্ধার করছেন। সফল হচ্ছেন তিনি। কিন্তু প্রচুর সময় খরচ হচ্ছে। আস্তে আস্তে, অক্ষরগুলোর অর্থ পাশাপাশি প্রকাণ্ড আকারে লিখে লিখে মেসেজটা আবিষ্কার করছেন তিনি।

খানিকপর মাথা তুললেন মোখলেসুর রহমান। এদিক ওদিক তাকালেন। সহকারী নেই রুমে। লাঞ্চ আওয়ার। চলে গেছে সে। আবার ঝুঁকে পড়লেন টেবিলের উপর। মেসেজটা আবিষ্কার করেছেন তিনি। বড় বড় অক্ষরে লিখেছেন। আবার পড়লেন। এবার নিয়ে পাঁচবার পড়লেন। মাথা তুলে কি যেন চিন্তা করার চেষ্টা করছেন। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে তাঁর কপালে। বিড়বিড় করে বললেন, 'অসম্ভব। এ হতে পারে না।'

মেসেজের অর্থটা যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি অবিশ্বাস্য। মোখলেসুর রহমান আবার ঝুঁকে পড়লেন টেবিলের উপর। নিশ্চয়ই কোথাও কোন মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। মেসেজের অর্থটা এমনই ভয়ঙ্কর, এমন বিভীষিকাময় যে কাউকে বললে সে ভাববে লোকটা পাগল হয়ে গেছে।

মুহূর্তের জন্য আরও একটা প্রশ্ন মাথায় এল। আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত এই আলোক সঙ্কেত কার উদ্দেশ্যে? কাকে উদ্দেশ্য করে পাঠানো হচ্ছে? এই আলো দেখতে পাবার কোন উপায় নেই, কারণ মহাশূন্যের দিকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে। আবার কাছাকাছি কারও উদ্দেশ্যে পাঠানো হচ্ছে বলেও মনে হয় না। কাছাকাছি মেসেজ পাঠাবার দরকার হলে টেলিফোন ব্যবহার করলেই তো হয়।

এ চিন্তাটা মাথা থেকে সরিয়ে ফেললেন মোখলেসুর রহমান। চিন্তা করলেন, এখন তাঁর প্রয়োজন একজন সাহায্যকারীর। তিনি পুলিসকে ডেকে ব্যাপারটা জানাতে পারেন—কিন্তু অনুসন্ধানের পর যদি প্রমাণ হয় গোটা ব্যাপারটাই একটা ভুল, একটা ভিত্তিহীন অবাস্তবতা, একটা ফল্‌স্ অ্যালার্ম তাহলে নিতান্তই হাসির খোরাক হবেন তিনি।

কিন্তু ব্যাপারটা যে ফলস অ্যালার্ম নয় তাও তিনি বুঝতে পারছেন। তবু পুলিসকে জানানোর চেয়ে আর একজনকে জানালে রহস্যটা ন্যূনতম সময়ে উন্মোচিত হবে বলে ভাবলেন তিনি।

গোটা ব্যাপারটাই নতুন করে আগাগোড়া ভাবলেন তিনি। তারপর মনস্থির করে ফেললেন।

না, আর দেরি করবার কোন মানে হয় না। কুয়াশাকে সব কথা জানাবেন, ঠিক করলেন তিনি। একমাত্র কুয়াশার উপরই এ ব্যাপারে ভরসা করতে পারা যায়। এই ধরনের রহস্যময় কাণ্ড নিয়েই কুয়াশার কারবার।

যেই ভাবা সেই কাজ। টেলিফোনের দিকে ছুটলেন তিনি। হোঁচট খেলেন টেবিলের পায়ার সাথে। কোন মতে টাল সামলে নিয়ে আবার পা বাড়ালেন, এমন সময়…।

দরজায় খুট করে শব্দ হলো একটা। কেউ যেন অফিস রুমে ঢুকল।

'কে!'

রিসিভারের দিকে হাত বাড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন মোখলেসুর রহমান। হাতটা স্থির হয়ে গেল তাঁর। পাথর হয়ে গেল দেহটা। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠল। আবছা দেখছেন, কিন্তু জিনিসটা চিনতে পারলেন ঠিকই। আগন্তুকের হাতে পিস্তল। অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মোখলেসুর রহমান…

ধুপ করে মৃদু শব্দ হলো একটা। বুকের বামদিকে ধাক্কা খেলেন মোখলেসুর রহমান। কেঁপে উঠল দেহটা। পরমুহূর্তে হুড়মুড় করে পড়ে গেলেন তিনি। সাইলেন্সার ফিট করা পিস্তলের বুলেট বুকে বিদ্ধ হবার তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করেছেন তিনি।

দুই

মোখলেসুর রহমানের সহকারীর বক্তব্য শুনে পুলিস কোন রহস্য উদ্ধার করতে পারল না। সহকারীর নোট বইটা পাওয়া যাচ্ছে না শুনে তারা যেন আরও সমস্যায় পড়ে গেল। সরকারী গোয়েন্দারা চিন্তা করেও বের করতে পারল না বড় বড় করে লেখা কয়েকটা অক্ষরের সাথে মোখলেসুর রহমানের হত্যার কি সম্পর্ক।

দোষ গোয়েন্দাদের নয়। কারণ সহকারী উকিল তাদেরকে বলতেই পারল না অক্ষরগুলো কোত্থেকে, কিভাবে পেয়েছিলেন মোখলেসুর রহমান।

সেদিনই বিকেলে আর্মি প্রুভিং গ্রাউণ্ডে যে ঘটনাটা ঘটল সেটা আরও ভয়ঙ্কর, আরও অবিশ্বাস্য। কিন্তু পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগ সেই ঘটনার সাথেও মোখলেসুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের কোন সম্পর্ক দেখল না। অথচ সম্পর্ক একটা ছিল।

সেদিন বিকেলের ঘটনা।

প্রুভিং গ্রাউণ্ড ব্যবহার করা হয় সামরিক যন্ত্রপাতি, নতুন আবিষ্কার, নতুন বিস্ফোরক পরীক্ষা করার জন্য। লোক-চক্ষুর অন্তরালে জায়গাটা। কড়া প্রহরার ব্যবস্থা, কোথাও শৈথিল্য নেই। আশপাশ থেকে প্রুভিং গ্রাউণ্ডের ভিতরটা দেখার কোন উপায় নেই।

কিন্তু দূরের একটা মাটির উঁচু ঢিবির উপর দু'জন লোক আগেই উঠে বসে আছে। তাদের দু'জনের চোখেই হাই-পাওয়ারড বিনকিউলার। ঢিবির ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে প্রুভিং গ্রাউণ্ডের দিকে চেয়ে আছে তারা।

এই লোক দু'জনই রাস্তার ওপারের বিল্ডিংয়ের পাঁচতলার একটি অফিস রুম থেকে মোখলেসুর রহমানকে লক্ষ্য করেছিল। এদের মধ্যে লম্বা লোকটাই মোখলেসুর রহমানকে খুন করেছে।

নিজের মধ্যে কথা বলছিল তারা। কি যে ঘটতে যাচ্ছে তা তারা বেশ ভাল

করেই জানে। যে বিয়োগান্ত, মর্মন্তুদ নাটক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সে নাটকের উদ্যোক্তা তারাই। বোধহয় সেই কারণেই সময় ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে তারাও উত্তেজিত হয়ে উঠছে।

দুইশো সেনা রয়েছে মাঠে। সেনারা সবাই নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষা করছে এক্সপেরিমেন্ট শুরু হবার জন্য।

সেনাদল এখনও জানে না এক্সপেরিমেন্টের বিষয়টা কি। তবে গুজব এই যে নতুন এক ধরনের স্মোক স্ক্রিন পরীক্ষা করা হবে। সকলের সাথে রয়েছে একটি করে গ্যাস-মাস্ক। নির্দেশ পাওয়া মাত্র সেগুলো পরে নেবে সবাই।

গ্যাস-মাস্কের কোন প্রয়োজন নেই, একজন অফিসার জানিয়েছেন। মাস্কের সাথে যে কাঁচের চশমাটা আছে শুধু সেটাই দরকার। যে ধোঁয়াটা পরীক্ষা করা হবে সেটা এতটুকু বিষাক্ত নয়। তবে খুবই গাঢ় এবং ঘন ধোঁয়া। সেই ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে যাবার সময় যাতে পথ দেখা যায়, সামনের দৃশ্য অবলোকন করা যায়, তারই জন্য এই বিশেষ ধরনের কাঁচের চশমা। অফিসাররা আশা করছেন ঘন ও গাঢ় ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে এই চশমা পরে স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যাওয়া সম্ভব হবে। পরীক্ষার বিষয়বস্তু এটাই।

এক্সপেরিমেন্টটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তা প্রমাণ হয় উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের উপস্থিতির হার দেখে। অফিসাররা প্রুভিং গ্রাউণ্ডের বাইরের উঁচু বিল্ডিংয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, প্রত্যেকের হাতে ফিল্ড গ্লাস।

মৃদু মন্দ বাতাস বইছে। এক্সপেরিমেন্ট শুরু করার জন্য চমৎকার আবহাওয়া। কোথাও কোন অনিয়ম নেই। সব রেডি।

প্রুভিং গ্রাউণ্ডের উপরে, অনেক উঁচুতে, যে এরোপ্লেনটা চক্কর মারছে সেটা কারও নজরে পড়ল না। অনেক বেশি উঁচুতে রয়েছে বলে প্লেনটার ইঞ্জিনের আওয়াজ নিচে আসছে না। পাতলা মেঘের পর্দা রয়েছে, তার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে সেটা—তাই কারও দেখতে পাবার কথাও নয়।

এক মিনিট পর শুরু হলো স্মোক-স্ক্রিন টেস্ট।

এক ডজন গর্ত থেকে বিপুল বেগে বেরুতে শুরু করল ধূম্রকুণ্ডলী। মৃদু বাতাস পেয়ে ঘন গাঢ় ধোঁয়ারাশি গ্রাস করতে শুরু করল ধীরে ধীরে গোটা মাঠটাকে।

অস্বাভাবিক গাঢ় ধোঁয়া। খালি চোখে এই ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে কিছুই দেখবার উপায় নেই। মাঠের এক প্রান্তে সরিয়ে নেয়া হয়েছে সেনাবাহিনীর ক্ষুদ্র দলটিকে। গ্যাস মাস্ক পরবার নির্দেশ পেয়ে সবাই পরে নিয়েছে ইতিমধ্যে। দলটির দিকে ক্রমশ এগিয়ে আসছে ধোঁয়া রাশি। মাঠের ঘাস থেকে প্রায় তিন-চার মানুষ উঁচু ধোঁয়া। অফিসাররা আর্ম সিগন্যাল দিলেন। দুইশো সেনার দলটি মার্চ করে এগিয়ে যেতে শুরু করল।

সেনাদের প্রথম সারিটা স্মোক-স্ক্রিনের ভিতর দিয়ে সফলতার সাথে মার্চ করে বেরিয়ে গেল। পর্যবেক্ষক হাই কমাণ্ড লক্ষ্য করলেন ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে মার্চ করে বেরিয়ে যেতে সৈন্যদের পনেরো মিনিট সময় লাগল। পরীক্ষা নিখুঁতভাবে সফল

হয়েছে। সেনাদের লাইন একটুও বাঁকা হয়নি। কেউ পিছিয়ে পড়েনি বা সামনে এগিয়ে যায়নি। বোঝা যাচ্ছে ধোঁয়া যত গাঢ়ই হোক, চশমাটা খুবই কাজের জিনিস হয়েছে, পরিষ্কার সবকিছু দেখা যায় ধোঁয়ার ভিতর থেকেও।

অফিসাররা দ্রুত সঙ্কেত দিলেন আবার। ঘুরে দাঁড়াল সেনাদল। আবার মার্চ করে এগিয়ে যাচ্ছে তারা। স্মোক-স্ক্রিনে প্রবেশ করার জন্য।

এরপরই ঘটল ভয়ঙ্কর ঘটনাটা।

এমন ভাবে ঘটতে শুরু করল যে তা বর্ণনা করা প্রত্যক্ষদর্শীদের পক্ষেও কঠিন। প্রথমে তাদের মনে হলো, চলমান ছবির মত সবকিছু নড়ে উঠল। স্মোক-স্ক্রিন, অমন প্রকাণ্ড প্রুভিং গ্রাউণ্ড এবং যাবতীয় সবকিছু যেন পিছন দিকে দ্রুত সরে যাচ্ছে। মনে হলো, সিনেমা দেখছে তারা, দৃশ্যটা ফেডআউট হয়ে যাচ্ছে। যেন ক্যামেরা অকস্মাৎ পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—ক্লোজআপে দৃশ্যটা দেখছিল তারা, এখন দূরবর্তী কোন দৃশ্য দেখছে যেন।

কয়েকজন অফিসার ব্যাপারটা কি বুঝতে না পেরে এক ঝটকায় নামিয়ে ফেললেন চোখ থেকে ফিল্ড-গ্লাস। কিন্তু খালি চোখেও সেই একই দৃশ্য। সব কিছু কেমন দ্রুত পিছিয়ে যাচ্ছে যেন।

পরমুহূর্তে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেলেন অফিসাররা। তাদের সামনে অপ্রত্যাশিত আতস বাজির খেলা শুরু হয়ে গেল। মাঠের প্রায় পঞ্চাশ ফুট উপরে শুরু হলো আতস বাজির সেই খেলা। মাঠের উপর সর্বত্র চলল আলোক উৎসব। অসংখ্য লক্ষ লক্ষ নীল আর লাল আলোক বিন্দু ভাসছে মাঠের উপর। স্মোক-স্ক্রিন প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে আলোক বিন্দুতে। স্মোক-স্ক্রিনের ভিতর সেনাদলটিকে দেখাই যাচ্ছে না।

অপ্রত্যাশিত এবং ব্যাখ্যার অতীত না হলে দৃশ্যটা সত্যি উপভোগ্য হতে পারত।

অদ্ভুত আলোক বিন্দুগুলো আগুনের ফুলকির মত স্মোক-স্ক্রিনকে চারদিক থেকে ঘিরে চক্কর মারছে বিদ্যুৎ বেগে। ছোট ছোট আগুনের বর্শা যেন এক একটা।

একজন জেনারেল গর্জে উঠলেন। অফিসাররা ছুটলেন যানবাহনের দিকে। যানবাহন স্টার্ট নিয়ে ছুটল প্রুভিং গ্রাউণ্ডের দিকে।

মাঠের মাঝখানে পৌঁছুতে কয়েক মিনিট লেগে গেল। আলোক বিন্দু বা আগুনের ফুলকি, যাই হোক সেগুলো ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। স্মোক-স্ক্রিন তেমনি আছে মাঠের মাঝখানে—গাঢ় এবং ঘন। যোয়ানরা এখনও তার ভিতরে। তাদের দেখা যাচ্ছে না বাইরে থেকে।

তৎপরতা শুরু হলো। অফিসাররা নির্দেশ দিতে লাগলেন। টেকনিশিয়ানরা নির্দেশ পেয়ে প্রকাণ্ড আকারের বিদ্যুৎচালিত পাখার সুইচ অন করল। গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে ঘুরতে শুরু করল পাখাগুলো।

পাখার তীব্র বাতাসে স্মোক-স্ক্রিন ভাঙতে শুরু করল। দেখতে দেখতে ধোঁয়ারাশি সরে গেল মাঠের উপর থেকে।

এতক্ষণে দেখতে পাওয়া গেল দুইশো সেনানীর দলটিকে। তারা এখন আর

মার্চ করছে না। দুইশো সেনা হাত পা ছড়িয়ে অসহায় ভঙ্গিতে পড়ে আছে ঘাসের উপর। কেউ কেউ গ্যাস-মাস্ক খুলে ফেলেছে। বেশির ভাগ সেনাকে দেখা গেল গলায় হাত দিয়ে পড়ে আছে।

খবর পেয়ে দ্রুত ছুটে এল অ্যাম্বুলেন্স গাড়িগুলো। বিমূঢ় ডাক্তাররা পরীক্ষা করতে শুরু করলেন সৈন্যদের।

মাত্র কয়েকজন সেনাকে বাঁচানো সম্ভব হলো। সর্বমোট সাতজন। একশো তিরানব্বই জনই মারা গেছে। তাদেরকে বাঁচাবার কোন রাস্তাই আর নেই।

মৃত সেনাদের কারও শরীরে কোন রকম ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গেল না। আগুনের সংস্পর্শে মারা গেছে তারা তাও প্রমাণিত হলো না। কারও জামা-কাপড় বা ত্বক পোড়েনি।

যারা বেঁচে গেছে তারাও বিশেষ কিছু বলতে পারল না। তাদের সাতজনেরই বক্তব্য এক রকম। হঠাৎ তারা টের পায়, শ্বাস নিতে পারা যাচ্ছে না, আশপাশে কোথাও বাতাস নেই যেন। এর বেশি মনে করতে পারছে না কেউ।

এর বেশি আবিষ্কার করা সম্ভব হলো না মেডিক্যাল এবং ল্যাবরেটরির কর্মীদের পক্ষেও। রাতের বেলা তাদের রিপোর্টে তারা জানাল—মৃত্যুর কারণ : অক্সিজেনের অভাব।

এক্সপেরিমেন্টে যে ধোঁয়া ব্যবহার করা হয়েছে তা পরীক্ষা করা হলো পুংখানুপুংখভাবে। রিপোর্টে দেখা গেল ধোঁয়াটা সব রকম বিষ-মুক্ত গ্যাস-মাস্ক ছাড়াও ক্ষতিকর নয়। মাস্কগুলোও পাঠানো হলো ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করার জন্য। না, মাস্কগুলোও নির্দোষ।

টেলিগ্রাম বেরুল সন্ধ্যায়। সংবাদপত্রে বড় বড় কলামে মর্মন্তুদ কাহিনীটা ছাপা হলো। হৈ-চৈ পড়ে গেল দেশময়। একটি সংবাদপত্র প্রশ্ন উত্থাপন করল এটা কি কোন রাষ্ট্রের শত্রুতামূলক আক্রমণ?

সামরিক বাহিনীর অফিসাররাও বসে নেই। তারাও সেনাদের মৃত্যুর কারণ আবিষ্কার করলেন। পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হলো সেনাদের মৃত্যুর কারণ।

কারণটা সত্যি অবিশ্বাস্য।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে গোপন বৈঠক শুরু হয়েছে। বিশেষ আমন্ত্রণ পেয়ে গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসার মি. সিম্পসনও যোগ দিয়েছেন। গভীর রাত পর্যন্ত আলোচনা চলছে সেখানে।

অফিসাররা টিকেট ব্ল্যাকার মনির বা অ্যাডভোকেট মোখলেসুর রহমানের হত্যা রহস্য সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। মোখলেসুর রহমান ভয়ঙ্কর একটা ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন, সে সম্পর্কেও তাঁরা অবগত ছিলেন না। সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে কারও কোন অজ্ঞতা নেই। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি তা সত্ত্বেও গোটা পরিস্থিতিটা বর্ণনা করলেন গোড়া থেকে।

আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, আর্মি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ এবং সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ মিলিতভাবে এই সমস্যার সমাধান বের করার জন্য কাজ

করবে। আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে সমস্যাটা যেহেতু বৈজ্ঞানিক সমস্যা, সেইহেতু একজন বিজ্ঞানীর সাহায্য নেয়া হবে।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী—কে হতে পারে সে?

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি প্রস্তাব দিলেন, 'আমার মনে হয় কুয়াশার সাহায্য চাইতে পারি আমরা। কুয়াশা শুধু বিজ্ঞানী নয়, বিশ্বের জীবিত বিজ্ঞানীদের মধ্যে অন্যতম সে। তার মত প্রতিভাবান কেমিস্ট আর দ্বিতীয়টি নেই।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব? কুয়াশা বিজ্ঞানী হলেও সে সৎ নাগরিক নয়। একজন অপরাধীর কাছে আমরা সাহায্য চাইতে পারি না।'

একজন জেনারেল জানতে চাইলেন, 'তার অপরাধটা কি?'

মি. সিম্পসন একটু আমতা আমতা করে বললেন, 'অপরাধ অনেক। তবে, আমরা আজ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ খাড়া করতে পারিনি। বড় বুদ্ধিমান সে। অপরাধ করে সে ঠিকই, কিন্তু পিছনে কোন প্রমাণ কখনও রেখে যায় না। সে যাই হোক, উপর থেকে হুকুম আছে আমার প্রতি, 'সুযোগ পেলেই তাকে বন্দী করবে। আগে বন্দী করতে হবে, প্রমাণ পরের কথা।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি বললেন, 'শুনেছি কুয়াশা শুধু বড় বিজ্ঞানীই নয়, তার মত বুদ্ধিমান, তার মত দুঃসাহসী মানুষও নাকি হয় না। আমরা যে বিপদে পড়েছি সেই বিপদ থেকে হয়তো কুয়াশাই একমাত্র আমাদের উদ্ধার করতে পারে। মি. সিম্পসন, কুয়াশার বিরুদ্ধে যখন কোন প্রমাণই নেই, তখন আর খামোকা তাকে বিরক্ত করার কোন মানে হয় না। আগে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করুন, তারপর তাকে অভিযুক্ত করুন। আমি বলি কি···।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'তার উপর থেকে গেফতারী পরোয়ানা তুলে না নিলে সে সাহায্য করতে রাজি হবে না।'

সেক্রেটারি বললেন, 'আমি আপনার বসের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলব। মি. সিম্পসন, আপনি কুয়াশার সাথে যোগাযোগ করুন। তাকে জানিয়ে দিন, পুলিস বা গোয়েন্দা বিভাগ তাকে বিরক্ত করবে না।'

মি. সিম্পসন বললেন, 'বর্তমান বিপদটা কেটে না যাওয়া পর্যন্ত। ঠিক আছে, খবরটা যাতে ওর কাছে পৌঁছোয় সে ব্যবস্থা করছি আমি। ও কখন কোথায় থাকে তা কেউ বলতে পারে না—কিন্তু ওকে সংবাদ দেয়ার একটা কৌশল জানা আছে আমার।'

খুলনা শহরের তিনতলা একটা বাড়ির ড্রয়িংরুমে ইংরেজি পত্রিকার উপর চোখ বুলাচ্ছে ডি. কস্টা। পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কুয়াশা। ঢাকা থেকে কয়েক হাত ঘুরে সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের উচ্চ পদস্থ অফিসার মি. সিম্পসন শেষ পর্যন্ত পেয়েছেন ওকে ফোনে। তার সাথে কথা বলছে সে।

মিনিট সাতেক পর ফোন ছেড়ে দিল কুয়াশা। কালো সিল্কের আলখেল্লার পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে মেঝেতে পায়চারি শুরু করল সে। কপালে চিন্তার রেখা ফুটে রয়েছে।

দীর্ঘ ঋজু, বিশাল লোকটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল ডি. কস্টা। তারপর উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখের চেহারা। বলল, 'কে ফোন করিয়াছিল টাহা আমি বলিটে না পারিলেও কেন ফোন করিয়াছিল টাহা হামি বলিয়া ডিটে পারি, বস্। আজকে আফটারনুনের সময় হামাডের সোলজাররা মারা গিয়াছে, ওয়ান হানড্রেড অ্যাণ্ড নাইনটি থ্রী মেন···।'

পায়চারি থামিয়ে সবেগে ঘুরে দাঁড়াল কুয়াশা। বলল, 'সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞরা সৈন্যদের মৃত্যুর কারণ জানতে পেরেছে, মি. ডি. কস্টা।'

'ভেরি গুড। কারণটা কি?'

'লোকগুলো মারা গেছে—কিন্তু গ্যাস, আগুন, বিষ বা অন্য কোন পরিচিত অস্ত্রের আক্রমণে নিহত হয়নি তারা। বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিত যে ব্যাপারটা দুর্ঘটনা নয়। সম্পূর্ণটাই আসলে পূর্ব পরিকল্পিত। একটা ষড়যন্ত্র।'

অস্থিরভাবে আবার পায়চারি করতে শুরু করল কুয়াশা।

তিন

সেনাদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সামরিক দফতরের মতামত পরদিন সকালের খবরের কাগজে ছাপা হলো। সাংবাদিকরা ছুটল বিজ্ঞানীদের কাছে। বিজ্ঞানীরা তাদের যে যার নিজস্ব মতামত দান করলেন। অধিকাংশই বললেন যা ঘটেছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব, সেনারা মারা গেছে কিভাবে তা তাঁরা বুঝতে অক্ষম।

সামরিক হাই কমাণ্ড থেকে নির্দেশ দেয়া হলো দেশের সবগুলো আর্মি পোস্টে, অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বনের জন্য। বলা যায় না, যে কোন সময় যে কোন স্থানে পরবর্তী আক্রমণ হতে পারে।

প্রতিবেশি এবং এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রেও খবরটা তুমুল হৈ-চৈ-এর সৃষ্টি করল। বহু রাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চকে নির্দেশ দেয়া হলো বাংলাদেশে গুপ্তচর পাঠিয়ে রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করার জন্য।

সারা পৃথিবীতে কুয়াশার সুনাম ছড়িয়ে আছে। বহু ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের বাংলাদেশস্থ স্পাইকে নির্দেশ দেয়া হলো কুয়াশা এবং তার সহকারী ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে।

নির্দেশ পেয়ে বিদেশী স্পাইরা ছুটল। কিন্তু হা হতোস্মি। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী কুয়াশা খুলনায় ছিল। স্পাইরা তার আস্তানায় সন্ধান নিতে গিয়ে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে গেল। আস্তানা শূন্য, কুয়াশা বা তার সহকারীরা সেখানে নেই।

এদিকে মি. সিম্পসন খবর পেলেন কুয়াশার কাছ থেকে। কুয়াশা হোটেলের নাম বলে সেখানে ছদ্মবেশে পৌঁছুতে বলল তাঁকে। পথে তিনি রাসেলকে গাড়িতে তুলে নেবেন। কুয়াশা রাসেলকেও ফোন করে খবরটা জানিয়ে দিয়েছে।

মি. সিম্পসন যখন রাসেলের বাড়িতে পৌঁছুলেন তখন সকাল সাড়ে নয়টা। মি. সিম্পসন দাড়িওয়ালা বোম্বাইয়া ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশ নিয়েছেন।

কলিংবেল টিপতে দরজা খুলে দিল এক যুবতী মেয়ে।

'রাসেলকে গিয়ে বলো মি. সিম্পসন এসেছেন।'

মেয়েটি সুন্দরী। মি. সিম্পসনের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল সে। বলল, 'ড্রয়িংরুমে এসে বসুন।'

ড্রয়িংরুমে ঢুকলেন মি. সিম্পসন। বসলেন সোফায়। মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে তিনি বললেন, 'রাসেল কি…?'

মেয়েটি হেসে উঠল। বলল, 'চিনতে পারছেন না আমাকে তাহলে? সত্যি কি এতই নিখুঁত হয়েছে ছদ্মবেশটা?'

'মাই গড, তুমি রাসেল!'

রাসেল বলল, 'কুয়াশার ফোন না পেলে আমিও কিন্তু বুঝতে পারতাম না আপনিই মি. সিম্পসন। চেনাই যাচ্ছে না আপনাকে।'

মি. সিম্পসন ঘড়ি দেখলেন। বললেন, 'চলো, দেরি করে লাভ কি?'

রাসেল বলল, 'চলুন। ভাল কথা, শহীদ আর কামাল ভাইয়ের খবর কি? ওঁরা কি নেপাল থেকে ফিরেছেন?'

মি. সিম্পসন সোফা ত্যাগ করতে করতে বললেন, 'কুয়াশা ওদেরকে ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়েছে কাল রাতেই। আজকের ফার্স্ট ফ্লাইটেই ঢাকা এয়ারপোর্টে নামবে ওরা।'

গাড়িতে এসে উঠল দু'জন।

রাসেল বলল, 'এবারের বিপদটা খুবই ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে। কুয়াশাদা সবাইকে নিয়ে এই বিপদের মোকাবিলা করার কথা ভাবছেন। এর আগে এমন হয়নি কিন্তু।'

হোটেলের সামনে গাড়ি থেকে নামল ওরা।

'কেউ ফলো করেনি,' রাসেল বলল।

না, ফলো করেনি। কিন্তু হোটেলের লবিতে বেঁটে একজন লোক বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল, সে কাগজের আড়াল থেকে ঠিকই লক্ষ্য করল মি. সিম্পসন ও রাসেলকে। মুচকি হাসল লোকটা।

লোকটার চেহারার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নেই। পোশাকও সাধারণ লোকের মত। উল্লেখযোগ্য বিষয় শুধু একটিই, লোকটার কব্জিতে বেল্ট দিয়ে আটকানো হাতঘড়িটা অস্বাভাবিক বড়। মি. সিম্পসন এবং রাসেল হোটেলের এলিভেটরে ঢুকতেই সে তার হাতঘড়ির দম দেবার বোতামটা দ্রুত ঘোরাতে শুরু করল।

কয়েক মিনিট পর হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল প্রকাণ্ড একটা কালো অক্সফোর্ড মরিস। ডোরম্যান ছুটে এল। কোন সম্মানীয় অতিথি এসেছেন নিশ্চয়ই। ডোরম্যান গাড়ির দরজা খুলে ধরে নিখুঁত ভঙ্গিতে স্যালুট মারল। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একজন নিগ্রো। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ, পরনে সাদা গ্যাবার্ডিনের স্যুট, হাতে ওয়াকিং স্টিক। দেখে মনে হয় আফ্রিকান কোন রাষ্ট্রের অ্যামব্যাসাডর বা প্রিন্স।

দৃঢ় পা ফেলে সুইং ডোর ঠেলে হোটেলে প্রবেশ করল নিগ্রো লোকটা।

লবিতে তখনও বসে আছে সেই বেঁটে লোকটা। তখনও সে খবরের কাগজ

পড়ার ভান করছে। খবরের কাগজের আড়ালে মুখ লুকিয়ে আসলে সে লক্ষ করছে হোটেলে কে ঢুকছে, কে বেরিয়ে যাচ্ছে।

নিগ্রো লোকটা লবিতে ঢুকতেই বেঁটে লোকটার চোখ দুটো কুঁচকে উঠল। পরমুহূর্তে সবজান্তার মত হাসল সে। নিগ্রো ইতিমধ্যে এলিভেটরে উঠে গেছে।

বেঁটে লোকটা আবার তার কব্জিতে বাঁধা অস্বাভাবিক বড় আকারের হাতঘড়ির দম দেবার বোতামটা ঘোরাতে শুরু করল। ধীরে ধীরে চেহারাটা গম্ভীর হয়ে উঠছে তার।

নিগ্রো লোকটার ছদ্মবেশ ধরতে অসুবিধে হয়নি তার। কুয়াশার বিশিষ্ট সহকারী স্যানন ডি. কস্টা কালো ভূত সেজে এলে কি হবে, তার রোগা পাতলা শরীর এবং হাঁটার ভঙ্গি দেখেই সে তাকে চিনে ফেলেছে।

প্রখ্যাত ডিটেকটিভ শহীদ খান এবং তার সহকারী কামাল গত হপ্তায় নেপালে গেছে, রাজ পরিবারের একটি গুপ্তধনের নকশা উদ্ধার করে দেবার অনুরোধ পেয়ে। নকশাটার মূল্য কয়েক কোটি টাকা, সেটা চুরি গেছে দিন পনেরো আগে।

নকশা উদ্ধারের কাজ শেষ করে অর্থাৎ নকশাটা উদ্ধার করে রাজার হাতে সেটা তুলে দিয়ে ওরা নেপালে ভূ-সৌন্দর্য অবলোকনের জন্য আরও কটা দিন কাঠমুণ্ডুতে থাকার কথা ভাবছিল। রাজ পরিবারের সদস্যরাও ওদেরকে ছাড়তে চাইছিল না। তাঁদের অতিথি হয়ে আরও বেশ কিছুদিন থেকে যাবার জন্য অনুরোধ করছিল ওদেরকে। এমন সময় কুয়াশার মেসেজ পেল শহীদ।

কুয়াশা ডাকছে, সুতরাং সবকিছু ভুলে ছুটতে হয়। সকালের ফ্লাইটেই রওনা হলো ওরা ঢাকার উদ্দেশে।

কুয়াশা মেসেজে জানিয়েছিল ওদেরকে খুব সাবধানে ঢাকায় নামতে হবে, যাতে কেউ ওদেরকে চিনতে না পারে।

ছদ্মবেশ নিতে ভুল করেনি ওরা। কিন্তু শুধু ছদ্মবেশ নিয়ে ওরা নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না।

ঢাকার উদ্দেশে প্লেন কাঠমুণ্ডু এয়ারপোর্ট থেকে আকাশে ওড়ার বিশ মিনিট পর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিল ওরা।

শহীদ এবং কামাল, দুজনেই, গুরুতর রকম অসুস্থ হয়ে পড়ল। ছুটে এল দু'জন স্টুয়ার্ড। একজন একটু পরই ক্যাপ্টেনকে গিয়ে খবর দিল দু'জন প্রৌঢ় নেপালী ব্যবসায়ী ফুড পয়জনিংয়ের শিকার হয়ে পড়েছেন। একজনের জ্ঞান নেই, আর একজন কোনমতে কথা বলতে পারছেন।

ছুটে এলেন স্বয়ং ক্যাপ্টেন। স্টুয়ার্ডদের নির্দেশ দিলেন রোগীদেরকে বমি করাবার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু বয়স্ক নেপালী ব্যবসায়ী, যে তখনও জ্ঞান হারায়নি, বলল, 'বমি তো আমরা আগেই করেছি। আমার বমি হবেও না, সে চেষ্টা করে লাভ নেই। আপনি ঢাকা এয়ারপোর্টে ওয়্যারলেসে খবর পাঠান, যেন অ্যাম্বুলেন্স তৈরি থাকে। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে। পাম্প করে পেটের ভেতর যা কিছু আছে সব বের করতে পারলেই বাঁচব, নয়ত...।'

ক্যাপ্টেন তৎক্ষণাৎ ছুটলেন ওয়্যারলেসে ঢাকা এয়ারপোর্টকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে।

কয়েক মিনিট পর প্লেন নামল ঢাকা এয়ারপোর্টে। অ্যাম্বুলেন্স তৈরিই ছিল। স্ট্রেচারে করে নামানো হলো নেপালী ব্যবসায়ী দু'জনকে প্লেন থেকে। অ্যাম্বুলেন্সে শুইয়ে দেয়া হলো দু'জনকে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় নেপালীও জ্ঞান হারিয়েছে।

অ্যাম্বুলেন্স তীরবেগে ছুটে চলল হাসপাতালের দিকে। অ্যাম্বুলেন্সটা দুই ভাগে বিভক্ত। সামনের দিকে ড্রাইভিং সীট। যেখানে বসেছে ড্রাইভার এবং একজন মেল নার্স। ওদের পিঠের কাছেই পার্টেক্সের দেয়াল। ওদিকে দুটো বেডে শুয়ে আছে দুই নেপালী ব্যবসায়ী। ওদের সাথে রয়েছে একজন ফিমেল নার্স।

ফিমেল নার্স ঘুমিয়ে পড়ল। কেন, কিভাবে ঘুম পেল তার, তা সে পরে ব্যাখ্যা করে বলতে পারেনি। নেপালী ব্যবসায়ীদ্বয় অর্থাৎ শহীদ ও কামাল অবশ্য বলতে পারত, কিন্তু ফিমেল নার্সের ঘুম যখন ভাঙল তখন অ্যাম্বুলেন্সের ভিতর দু'জনের একজনও নেই। চলন্ত গাড়ি থেকে কখন যে ওরা নেমে গেছে তা কেউ টেরই পায়নি।

ছোট্ট একটা ক্যাপসুল পকেট থেকে বের করে ফাটিয়ে দিয়েছিল শহীদ। ক্যাপসুল থেকে অদৃশ্য গ্যাস বের হওয়ায় সেই গ্যাস নার্সের শ্বাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করে। গ্যাসটা ছিল ঘুমপাড়ানিয়া। ফলে সাথে সাথে গভীর ঘুমে ডুবে যায় নার্স। শহীদ ও কামাল দম বন্ধ করে রেখেছিল, তাই ওরা ঘুম পাড়ানিয়া গ্যাসে আক্রান্ত হয়নি।

অ্যাম্বুলেন্স ট্রাফিক জ্যামের জন্য পথিমধ্যে একবার থামতেই নিঃশব্দে দরজা খুলে নেমে পড়ল ওরা। কাছেই পাওয়া গেল একটা ট্যাক্সি, সেটায় চড়ে বসল দু'জন। ট্যাক্সি ছুটে চলল শহরের প্রথম শ্রেণীর একটি হোটেল অভিমুখে।

সবাই একত্রিত হয়েছে ওরা। নেপালী ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে শহীদ ও কামাল, সুন্দরী যুবতীর ছদ্মবেশে রাসেল, দাড়িওয়ালা বোম্বাইয়া ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে মি. সিম্পসন, নিগ্রোর ছদ্মবেশে ডি. কস্টা।

হোটেলের রুম কুয়াশা আগেই ওদের জন্য রিজার্ভ করে রেখেছিল ফোনে। সবাই এখন অপেক্ষা করছে। কুয়াশা যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে। রাজকুমারী ওমেনাও সম্ভবত তার সাথেই আসবে।

মি. সিম্পসন বর্ণনা করছিলেন গত বিকেলে প্রুভিং গ্রাউণ্ডের মর্মান্তিক ঘটনার কথা। এমন সময় নক হলো দরজায়।

দরজা খুলে দিল নিগ্রো—অর্থাৎ ডি. কস্টা। হোটেলের উর্দি পরা বেলবয় বরফ দেয়া পানি নিয়ে এসেছে। ডি. কস্টা জানত না ঠাণ্ডা পানির অর্ডার কে দিয়েছিল। কথা না বলে রুমের মাঝখানে ফিরে এসে সকলের সাথে আলোচনায় যোগ দিল সে।

বেলবয় বরফ দেয়া পানির পাত্রটা রাখল টেবিলের উপর। তোয়ালে দিয়ে আসবাবপত্রের উপর জমা ধুলো সাফ করে কয়েক মুহূর্ত পর বেরিয়ে গেল সে।

বেলবয়টা বয়সে ছোকরাই বলা চলে, বড় জোর বিশ বাইশ বছর বয়েস হবে। বেঁটেই বলা চলে তাকে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, তার হাতের কব্জিতে বেল্ট দিয়ে আটকানো হাতঘড়িটা অস্বাভাবিক বড়।

ডা. মনসুর আলি ওরফে কুয়াশা ঢাকায় পৌঁছুল সকাল সাড়ে ন'টায়। খুলনা থেকে যশোরে মোটরসাইকেলে, যশোর থেকে ঢাকায় এরোপ্লেনে।

যশোর থেকে আগত প্লেন থেকে নামল একজন অথর্ব জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ। বৃদ্ধ আবার অন্ধ। দুটো চোখেই ছানি পড়েছে তার। নিখুঁত, সন্দেহের উর্ধ্বে ছদ্মবেশ কুয়াশার। তার সাথে রয়েছে উনিশ বছরের স্বাস্থ্যবান একটি যুবক। বৃদ্ধের সন্তান সে। বলাই বাহুল্য, যুবকের ছদ্মবেশে এ হলো রাজকুমারী ওমেনা।

বৃদ্ধের হাত ধরে প্লেন থেকে নেমে এল যুবক। ধীরে ধীরে হাঁটছে ওরা। হাঁটতে হাঁটতে এয়ারপোর্টের বাইরে এসে দাঁড়াল। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি গাড়ি। গাড়িটা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের। যুবক বৃদ্ধের হাত ধরে সেই গাড়ির দিকে এগোল।

রাস্তার ওপারে একটি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। মেয়েটাকে অস্বাভাবিক চঞ্চল দেখাচ্ছে। কোন ব্যাপারে সে যেন ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়েছে, যেন মনস্থির করতে পারছে না। একবার মনে হলো, রাস্তা পেরিয়ে ছুটে আসবে সে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের গাড়ির দিকে। কিন্তু মনস্থির করার আগেই বৃদ্ধ এবং যুবক গাড়ির ভিতর উঠে বসল। তাদের পিছন পিছন আসছিল একজন লোক। সে-ও উঠল গাড়িতে। সাথে সাথে স্টার্ট নিয়ে ছুটতে শুরু করল লাল টয়োটা গাড়িটা।

গাড়ির শোফার ছাড়া সামনের সীটে আর কেউ নেই। সামনের এবং পিছনের সীটের মাঝখানে একটি কাঁচের পর্দা, খুঁটিয়ে না দেখলে সেটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না।

পিছনের সীটে বৃদ্ধের ছদ্মবেশে কুয়াশা, মাঝখানে সরকারী গোয়েন্দা দফতরের একজন গুপ্তচর, অপর জানালার পাশে যুবকের ছদ্মবেশে রাজকুমারী ওমেনা বসেছে।

তীরবেগে ছুটে চলেছে টয়োটা।

অকস্মাৎ গাড়ির পিছনের অংশে আগুনের ফুলকির মত নীল এবং লাল আলোক বিন্দু দেখা গেল। অসংখ্য আলোক বিন্দু ভাসছে চারদিকে। সরকারী গোয়েন্দা ককিয়ে উঠল, চেপে ধরল দুই হাত দিয়ে নিজের গলা।

পলকের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল কুয়াশার শরীরে। দরজার নবে হাত দিয়ে ঘোরাল সেটা। কিন্তু ঘুরল না দরজা। লক আপ করা।

এমন সময় গাড়ির ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে ইনভিজিবল গ্লাসের ভিতর দিয়ে তাকাল পিছন দিকে। বাঁকা হাসি হাসল সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল নিজের হাতঘড়ির দিকে। হাতঘড়িটা তার স্বাভাবিক আকারের চেয়ে বেশ বড়।

গোয়েন্দা ভদ্রলোক পকেট থেকে পিস্তল বের করার চেষ্টা করতে করতে চিৎকার করে উঠল, 'নকল! নকল ড্রাইভার!'

গুলি করল সে। কিন্তু মাঝখানের কাঁচের পার্টিশনে চিড় ধরল শুধু, বুলেট-প্রুফ কাঁচের আর কোন ক্ষতি হলো না। গোয়েন্দা ভদ্রলোক হঠাৎ দেহটা উঁচু করে তোলার চেষ্টা করতে গেল, কিন্তু সীটের নিচে, পাদানিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে।

দ্রুত কাজ করছিল কুয়াশা। পকেট থেকে ইতিমধ্যেই বেরিয়ে এসেছে তার হাতে একটি অদ্ভুত দর্শন রিভলভার। দরজার তালায় রিভলভারের নল ঠেকিয়ে গুলি করল সে।

বিস্ফোরক বুলেট তালায় আঘাত খেয়ে সশব্দে ফেটে গেল। ভেঙে গেল তালা।

ঠিক সেই সময় দাঁতে দাঁত চেপে গর্জে উঠল ড্রাইভার সামনের সীট থেকে। সেই বাঁকা হাসি উবে গেছে তার মুখ থেকে। একটা দৈত্যাকার সাত টন ওজনের ট্রাক সামনের দিক থেকে তীর বেগে ছুটে আসছে। ড্রাইভারের ঠোঁটে ক্রূর হাসি ফুটে উঠল। গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল সে। সোজা ঝড়ের বেগে ছুটে চলেছে গাড়ি ট্রাকটাকে লক্ষ্য করে।

গুলি করে এই সময় দ্বিতীয় দরজার তালাও ভেঙে ফেলল কুয়াশা। রাজকুমারী ওমেনা সেই দরজা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল ছুটন্ত গাড়ি থেকে।

গাড়ির ড্রাইভার লাফ মারল ট্রাকের সাথে গাড়ির ধাক্কা লাগার ঠিক এক সেকেণ্ড আগে।

চোখের পলকে ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। টয়োটা গাড়িটা ট্রাকের সাথে ধাক্কা খেয়ে দুমড়ে মুচড়ে চ্যাপ্টা হয়ে কিম্ভূতকিমাকার আকার ধারণ করল। ট্রাকটা টয়োটাকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে গেল ডানদিকের একটি পাঁচিলের দিকে, সেখানে চেপে ধরল সে টয়োটাকে পাঁচিলের সাথে।

টয়োটা ভেঙেচুরে একাকার। ওটার ভিতরে কেউ থাকলে তার পক্ষে বেঁচে যাওয়া অসম্ভব। হাড়, মাংস, রক্ত—সব একত্রিত হয়ে মণ্ড হয়ে যাবার কথা।

কিন্তু কুয়াশা ছিল না টয়োটায়। ড্রাইভার যখন গাড়ির বাইরে লাফিয়ে পড়ে ঠিক সেই সময়ই কুয়াশাও গোয়েন্দার অচেতন দেহটা কাঁধে তুলে নিয়ে লাফ দেয় রাস্তায়।

সংঘর্ষের শব্দ তখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। রাস্তার উপর দিয়ে সবেগে ছুটে গেল একটা ট্যাক্সি। ট্যাক্সির ব্যাক সীটে বসে আছে একটি মেয়ে। মেয়েটি যুবতী। এই মেয়েটিই খানিক আগে দাঁড়িয়েছিল এয়ারপোর্টের সামনের রাস্তায়।

চার

ছুটন্ত গাড়ি থেকে রাস্তায় লাফিয়ে ভারসাম্য রক্ষার জন্য কয়েকটা ডিগবাজি খেয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। গোয়েন্দাকে তখনও সে কাঁধের উপর ধরে রেখেছে এক হাত দিয়ে।

দুর্ঘটনাটা ঘটার সাথে সাথে লোকে লোকারণ্য রাস্তার চারদিক থেকে শোরগোল শুরু হয়ে গেল। সবাই ছুটে আসছে এদিকে। কুয়াশা দ্রুত তাকাল

এদিক ওদিক। একটা ট্যাক্সি থামল সজোরে ব্রেক কষে তিন-চার গজ দূরে। ড্রাইভার জানালা দিয়ে মুখ বের করে আর সকলের মত দেখার চেষ্টা করছে দুর্ঘটনার ফলে ক'জন লোক মরেছে বা আহত হয়েছে। হঠাৎ সে চমকে উঠে পিছনের দিকে তাকাল। ট্যাক্সির দরজা খুলে কে যেন ভিতরে উঠছে।

কুয়াশা ট্যাক্সিতে উঠে বসেছে। ড্রাইভার তাকাতেই বলল, 'ক্যান্টনমেন্ট। জলদি!'

কুয়াশার কণ্ঠস্বরে এমনই একটা জরুরী তাগাদার ভাব ছিল যে ড্রাইভার কোন বাক্যব্যয় না করেই ছেড়ে দিল ট্যাক্সি।

কুয়াশা গোয়েন্দা প্রবরকে পাশের সীটে বসিয়ে দিয়েছে। এইমাত্র বাকশক্তি ফিরে পেয়েছে সে, 'কেউ আপনাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল!'

জবাব দিল না কুয়াশা।

'আপনার সহকারী যুবকটা গেল কোথায়?' গোয়েন্দাকে উদ্বিগ্ন দেখাল।

মৃদু হাসল কুয়াশা। বলল, 'ওর জন্য চিন্তা করবেন না। নিজেকে রক্ষা করার যোগ্যতা ওর আমাদের চেয়ে কম নয়।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কিভাবে ঘটল বলুন তো? গ্যাসের কোন রকম গন্ধ পাইনি আমরা। কি এমন হলো যার ফলে অমন জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছিলাম?'

কুয়াশা বলল, 'জিনিসটা যাই হোক, সাথে সাথে প্রভাবিত করে না কাউকে। সেজন্যেই বেঁচে গেছি আমরা এ যাত্রা।'

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারির সাথে কথা বলার সময়ও ঘটনাটা সম্পর্কে কোন ব্যাখ্যা দিল না কুয়াশা।

সেক্রেটারি বললেন, 'আমি আশা করেছিলাম ঢাকায় আপনার উপস্থিতি সম্পর্কে কেউ জানতে পারবে না। ঢাকায় আপনি পদার্পণ করার সাথে সাথে চেষ্টা করা হলো আপনাকে হত্যা করার—তার মানে, শত্রুরা আপনার গতিবিধি সর্বক্ষণ চোখে চোখে রাখছে। এই ঘটনার ফলে প্রমাণ হয়ে গেল শত্রুপক্ষ শুধু বুদ্ধিমানই নয়, মহাশক্তিশালী। তাদের সংগঠন খুবই মজবুত।'

কুয়াশা বলল, 'ঠিক। বিরাট একটা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে হবে আমাদেরকে।'

সেক্রেটারির মুখ গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠল, 'নানারকম গুজব ছড়িয়েছে। দেখা যাচ্ছে গুজবগুলো একেবারে মিথ্যে নয়।'

কুয়াশা কথা না বলে তার যাদুকরি চোখের দৃষ্টি ফেলল সেক্রেটারির দিকে।

সেক্রেটারি বলতে শুরু করলেন, 'অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য সব গুজব। এইসব গুজবের সাথে আমাদের সেনাদের নির্মম হত্যাকাণ্ডের সম্পর্ক কতটুকু তা আমি জানি না। কিন্তু একের পর এক এমন সব ঘটনা ঘটছে যে দেখেশুনে মনে হচ্ছে সম্পর্ক নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে।'

'বলে যান।'

'আমরা শুনতে পাচ্ছি, এমন একটা যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যার বিরুদ্ধে কোন

ব্যবস্থাই নাকি টিকতে পারবে না। কে এর আবিষ্কারক, কাদের দখলে এটা আছে তা জানা যাচ্ছে না। এই ভয়ঙ্কর অস্ত্রের ক্ষমতা নাকি কল্পনারও অতীত। আমাদের গোটা সেনাবাহিনী এবং নাগরিক প্রশাসনকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারে কয়েক মিনিটের মধ্যে।'

কুয়াশাকে শান্ত দেখাচ্ছে।

বলল, 'আর্মি প্রুভিং গ্রাউণ্ডে যে হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে গেছে তা দেখে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে ওই ধরনের কোন অস্ত্র সত্যিই আবিষ্কার হয়েছে।'

সেক্রেটারি ঢোক গিলে বললেন, 'হ্যাঁ। কিন্তু অস্ত্রটা কি বা কি রকম তা আমরা জানি না। আমাদের সেনারা কিভাবে মারা গেছে তারও সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা নেই। তারা সবাই নিহত হয়েছে, এইটুকুই শুধু জানি। আমাদের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ কাজ করছে ঠিক, কিন্তু আমরা আসলে আপনার ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করছি। রহস্যময় এবং মহাশক্তিশালী অপরাধীদের সাথে বহুবার বিশ্বের বহু স্থানে আপনি বিবাদ করেছেন এবং বিজয়ীও হয়েছেন। তাই এই বিপদে আমরা আপনার সাহায্য কামনা করছি। আপনাকে আমাদের তরফ থেকে সব রকম সহযোগিতা দেয়া হবে। সবরকম স্বাধীনতা পাবেন আপনি। আপনার নিজস্ব পদ্ধতিতে আপনি কাজ করবেন। আমরা শুধু জানতে চাই—অস্ত্রটা কি, কি তার বৈশিষ্ট্য, কেন সেই অস্ত্র আমাদের যোয়ানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হলো এবং এই অস্ত্র কার দখলে আছে।'

সংক্ষেপে কুয়াশা জানাল, 'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

সেক্রেটারি বললেন, 'বিপদের গুরুত্ব আপনাকে বুঝিয়ে বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন গোটা জাতি কল্পনাতীত একটা সংকটের মধ্যে পড়তে যাচ্ছে। দেশ এবং জাতিকে রক্ষা করতে হবে আপনার। আমার মনে হয়, অতীতে আপনি যে সব শত্রুর মুখোমুখি হয়েছেন বর্তমান শত্রুপক্ষ তাদের সকলের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী, অনেক বেশি ধূর্ত এবং নির্মম।'

কুয়াশা মৃদু একটু হাসল শুধু।

'গুপ্তচররা চারদিকে সক্রিয়। বিদেশী গুপ্তচরদের কথা বলছি আমি। তারা কার হয়ে, কোন উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মাটিতে কাজ করছে তা আমরা জানি না। এর আগে মহামূল্যবান গোপন কাগজপত্র চুরি গেছে। আমরা বর্তমানে যে শত্রুর সাথে মোকাবিলা করতে যাচ্ছি সে কাজ এদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে কিনা জানি না…।'

সেক্রেটারি মাঝপথে থামলেন। দরজা খুলে গেল সশব্দে। চেম্বারে প্রবেশ করল সরকারী গোয়েন্দা। এই লোকই এয়ারপোর্ট থেকে এখানে আসার সময় কুয়াশার সাথে ছিল। উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। প্রায় চিৎকার করে ঘোষণা করল সে, 'টয়োটার নকল ড্রাইভারকে পাওয়া গেছে। দুর্ঘটনা ঘটার জায়গা থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে একটা পার্কের ভিতর তার মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে পুলিস। পিস্তলের বুলেট হার্ট ভেদ করে গেছে। বুলেটটাও পাওয়া গেছে। বুলেটের মাপ দেখে বোঝা

যাচ্ছে একটা .৪৫ অটোমেটিক ব্যবহার করা হয়েছে। মৃতদেহের কাছে একটি রুমাল পাওয়া গেছে, তাতে সুতো দিয়ে ইংরেজি S অক্ষরটি লেখা আছে। কারও নামের আদ্যাক্ষর, সম্ভবত।'

কুয়াশার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল সে, 'নিহত ড্রাইভারের কব্জিতে বড় আকারের ঘড়িটা কি পাওয়া গেছে?'

হাঁ হয়ে চেয়ে রইল গোয়েন্দা কুয়াশার দিকে। তারপর বলল, 'ঘড়ি? কই, না তো!'

সেক্রেটারি বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, '.৪৫ পিস্তল ব্যবহার করে খুন করা হয়েছে আবার। তবে কি দুটো ঘটনার সাথে কোন যোগাযোগ আছে?'

কুয়াশা মুখ তুলে তাকাল। সেই প্রশ্নবোধক, যাদুকরী দৃষ্টি তার চোখে।

সেক্রেটারি দ্রুত বলতে শুরু করলেন, 'নকল ড্রাইভারকে .৪৫ ক্যালিবারের বুলেট দিয়ে হত্যা করা হয়েছে শুনে আর এক হত্যাকাণ্ডের কথা মনে পড়ে গেল। একজন আইনবিদ মোখলেসুর রহমান, গতকাল খুন হয়েছেন তাঁর অফিসে। তাঁকেও খুন করা হয়েছে .৪৫ কোল্ট অটোমেটিক দিয়ে। প্রুভিং গ্রাউণ্ডের মর্মান্তিক ঘটনার খবর কাগজে ছাপা হয়, পর্যবেক্ষকরা নীল, লাল আগুনের ফুলকির মত আলোক বিন্দু দেখতে পান এ খবরও পরিবেশিত হয়—এবং এই খবর পড়ে আইনবিদ মোখলেসুর রহমানের সহকারী ফোন করে। সহকারী উকিল জানায় যে মোখলেসুর রহমানও নাকি অন্য এক ধরনের অদ্ভুত আলো দেখতে পেয়েছিলেন। তার ধারণা প্রুভিং গ্রাউণ্ডের ঘটনার সাথে তার বসের হত্যা রহস্যের যোগাযোগ থাকতে পারে।

কুয়াশা কোন কথা বলল না।

কিন্তু গোয়েন্দা প্রবর উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, 'আমাদের গাড়িতেও দেখা গেছে নীল, লাল আগুনের ফুলকির মত আলোক বিন্দু···।'

কুয়াশা উঠে দাঁড়াল।

দশ মিনিট পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বাইরে বেরিয়ে এল সে। ছদ্মবেশ ত্যাগ করেছে সে। শত্রুপক্ষ তার পরিচয় জেনে ফেলেছে, ছদ্মবেশ নেবার আর কোন মানে হয় না।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটা গাড়ি নিয়ে হোটেলের উদ্দেশে রওনা হলো কুয়াশা।

অনেক পিছনে একটা লাল গাড়ি। খুব সাবধানে অনুসরণ করছে কুয়াশার গাড়িকে।

লাল গাড়িতে আরোহী মাত্র দু'জন। একজন প্রায় ছয়ফুট লম্বা। তার পোশাক-আশাক খুবই দামী। অপরজনকে বেঁটেই বলা চলে। তার পরনেও দামী কাপড়-চোপড়।

কথা বলছিল সে-ই, 'বড় চিন্তার কথা, দেওজী। লোকে বলে কুয়াশা নাকি মানুষ না, যাদুকর। সেই যাদুকর লেগেছে আমাদের বিরুদ্ধে।'

দেওজীর চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল, 'সান্তারাম, তুমি একটা ভীতুর ডিম।

আমাদের আসল পরিচয় জানা এত সহজ নয়। কুয়াশার কথা যদি বলো, আমি মনে করি, যাদুকর না ছাই! শয়তানটাকে ঘায়েল করা কোন সমস্যাই নয়, সময় স্বাপেক্ষ ব্যাপার মাত্র। সত্যি বটে শয়তানটাকে খতম করে দেবার জন্যে যাকে নিয়োগ করেছিলাম সে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তাতে কি! যে ব্যর্থ হয়েছে তাকে তো চরম শাস্তি দিয়েছিই, শয়তানটাকেও রেহাই দেব না। সব কাজই হবে, ধীরে ধীরে। হোটেলে কি কাণ্ড ঘটেছে ভাবো একবার। শয়তানটার সবগুলো চেলাকে সাবাড় করে দেয়া হয়েছে···।'

ঠিক সেই সময় কুয়াশার গাড়ি প্রথম শ্রেণীর এক হোটেলের সামনে থামল।

পিছনের লাল গাড়িটা থামল না। হোটেলের সামনে দিয়ে সবেগে চলে গেল সেটা দেওজী এবং সান্তারামকে নিয়ে।

রিসেপশনে মুহূর্তের জন্যও থামল না কুয়াশা। কালো আলখেল্লা পরিহিত সুদীর্ঘ দেহের অধিকারী কুয়াশাকে দেখে রিসেপশনের কর্মচারীরা দ্রুত চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

লবিতে ঢুকল কুয়াশা। বেশ ভিড় লবিতে। সবাই সুদর্শন আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে রইল মন্ত্র-মুগ্ধের মত। থেমে গেল সব কোলাহল। দৃঢ়, দীর্ঘ পদক্ষেপে এলিভেটরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কুয়াশা। লবির এক কোণায় বসে রয়েছে বেঁটে একজন লোক, খবরের কাগজ পড়ার ভান করছে সে।

কুয়াশা লোকটাকে দেখে থাকলেও তার মধ্যে কোন রকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল না।

কুয়াশা এলিভেটরে চড়ার পরপরই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বেঁটে লোকটা খবরের কাগজ গুটিয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। লম্বা লম্বা পা ফেলে, প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেল সে লবি থেকে। লোকটার পালিয়ে যাবার কারণ, কুয়াশার পিছন পিছন দু'জন বলিষ্ঠদেহী লোককে লবিতে ঢুকতে দেখেছে সে। এরা সরকারী গোয়েন্দা। কুয়াশার উপর দৃষ্টি রাখার জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারি কোন রকম ঝুঁকি নিতে চান না। কুয়াশার নিরাপত্তার জন্য সম্ভাব্য সবরকম ব্যবস্থা করতে চান তিনি। এ ব্যাপারে কুয়াশাকে কিছু জানানো হয়নি। তবে কুয়াশা সম্ভবত সবই জানতে পেরেছে।

এদিকে এলিভেটর থেকে বেরিয়ে পাঁচ তলার নির্জন করিডর ধরে এগিয়ে চলেছে কুয়াশা। তিন কামরা বিশিষ্ট একটা স্যুইট টেলিফোনে গতরাতেই রিজার্ভ করেছিল সে এই হোটেলে। সকলের উপস্থিত হবার কথা এই স্যুইটেই। স্যুইটের নাম্বারটাও জানা আছে কুয়াশার।

একশো একষট্টি নাম্বার স্যুইট। স্যুইটের কাছাকাছি এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কুয়াশা। জোরে শ্বাস গ্রহণ করল সে। কপালে ফুটে উঠল চিন্তার রেখা। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে একশো একষট্টি নাম্বার স্যুইটের দরজার সামনে চলে গেল সে। নব ঘুরিয়ে বুঝল, তালা বন্ধ ভিতর থেকে।

মুহূর্তের জন্যও থামল না কুয়াশা। দরজায় তালা দেয়া বুঝতে পারার সাথে সাথে কাঁধ ঠেকাল দরজার গায়ে, তারপর সর্বশক্তি দিয়ে চাপ দিতে লাগল···।

মড়মড় করে ভেঙে গেল কবাট।

রুমের ভিতর নিঃসাড়, মৃতবৎ কয়েকটা দেহ কার্পেটের উপর বিশৃংখলভাবে পড়ে রয়েছে দেখা গেল।

মৃদু একটা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে তখনও রুমের বাতাসে। এই দুর্গন্ধ পেয়েই করিডরে থমকে দাঁড়িয়েছিল কুয়াশা।

রুমের ভিতর ঢুকে একমুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। ক্যামেরার মত রুমের সব কিছু দেখে নিচ্ছে তার চোখ দুটো।

ডি. কস্টা এবং কামালকে দেখা যাচ্ছে বাথরুমের দরজার কাছে চিৎ হয়ে পড়ে থাকতে। ডি. কস্টার পরনে শুধু অন্তর্বাস। স্নান সেরে বাথরুম থেকে বের হওয়া মাত্র আক্রান্ত হয়েছে সে, বোঝা যায়।

রুমের মাঝখানে পড়ে আছে রাজকুমারী ওমেনা। মি. সিম্পসনকে দেখা যাচ্ছে একটি জানালার সামনে। শহীদকে দেখা যাচ্ছে দরজার কাছে। রাসেল অপর একটি জানালার কাছে। সবাই ধরাশায়ী। প্রাণের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না কারও মধ্যে।

আলখেল্লার পকেট থেকে একটা ক্যাপসুল বের করে মুখে পুরল কুয়াশা। ক্যাপসুলটা তার নিজেরই আবিষ্কার। যে খাবে এই ক্যাপসুল তার আর অক্সিজেন দরকার হবে না। শ্বাস গ্রহণ না করেও থাকা সম্ভব কমপক্ষে আধঘন্টা। দুর্গন্ধ পেয়েই কুয়াশা বুঝেছে, রুমের বাতাস বিষাক্ত হয়ে গেছে—সম্ভবত মারাত্মক কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে ঘরের ভিতর।

টেবিলের উপরকার কাঁচের জাগটা সবচেয়ে আগে পরীক্ষা করল কুয়াশা। পানিতে বিষ মিশিয়ে দেয়া বিচিত্র কিছু নয়। তবে পানিতে বিষ থাকলেও—ছয়জন একসাথে বিষাক্ত পানি খেয়েছে এমন হতে পারে না।

পরমুহূর্তে অদ্ভুত একটা কাণ্ড করল কুয়াশা। লাফ মেরে সে একটা রাইটিং টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জানালার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে টেবিলটা। জানালা গলে সূর্য কিরণ পড়ছে টেবিলের মাঝখানে। টেবিলের উপর বেশ কয়েকটা ব্লটিং পেপার দেখা যাচ্ছে। দ্রুত সবগুলো ব্লটিং পেপার একত্রিত করে হাতে তুলে নিল সে। তারপর প্রায় ছুটে গিয়ে ঢুকল বাথরুমের ভিতর। একটু পরই বাথরুমের ভিতর থেকে কল থেকে পানি পড়ার শব্দ ভেসে এল।

প্রায় সাথে সাথে রুমের ভিতর ফিরে এল কুয়াশা। শহীদের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল সবচেয়ে আগে। শ্বাস-প্রশ্বাস নেই। তুলে নিল শহীদের একটি হাত। পালস্ দেখল। আছে। যদিও খুবই ক্ষীণ, সামান্য আভাস পাওয়া যাচ্ছে বিটের। আর আধ মিনিটের মধ্যে যদি কিছু করা না যায়, মৃত্যু ঘটবে ওর।

জীবনে এই প্রথম বিচলিত হতে দেখা গেল কুয়াশাকে। স্থির, বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে শহীদের মুখের দিকে। কিন্তু সে মাত্র মুহূর্তের জন্য। একমুহূর্ত পরই তৎপর হয়ে উঠল সে।

কুয়াশাকে বলা হয় গ্রেটেস্ট সাইন্টিস্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ড। বছরে একবার করে

কয়েক মাসের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যায় সে, একথা সবাই জানে। কিন্তু কেউ জানে না সেই কয়েকমাস কোথায় যায় কুয়াশা। আসলে সেই কয়েকমাস ল্যাবরেটরির ভিতর নিজেকে ব্যস্ত রাখে সে, গবেষণা করে একা একা।

চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছে কুয়াশা। সেই অগাধ জ্ঞান এই মুহূর্তে চরম পরীক্ষার সম্মুখীন। তার সহকারী, বন্ধু এবং প্রিয়পাত্ররা মরে যাচ্ছে—এদের বাঁচিয়ে তোলার দায়িত্ব এখন তার কাঁধে।

এরা সবাই গ্যাসে আক্রান্ত হয়েছে। এ ব্যাপারে কুয়াশা নিশ্চিত হয়েছে ব্লটিং পেপারগুলো থেকে মৃদু হালকা ধোঁয়া উঠতে দেখে। ধোঁয়া উঠছিল ঠিক, কিন্তু তা এমনই পাতলা যে অন্য কেউ হলে তার চোখেই পড়ত না ব্যাপারটা। বিষাক্ত পাউডার ব্লটিং পেপারগুলোয় ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিল কেউ। সূর্য কিরণের তাপে সেই পাউডার গ্যাসে রূপান্তরিত হচ্ছিল।

ব্লটিং পেপারগুলোকে পানিতে ভিজিয়ে দিয়ে গ্যাসের উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে কুয়াশা।

দরকার হলো এখন অক্সিজেন ট্যাংক। কিন্তু তা হাতের কাছে পাওয়া অসম্ভব। পকেট থেকে ক্যাপসুলগুলো বের করল কুয়াশা। প্রত্যেকের মুখের ভিতর একটা করে ক্যাপসুল ঢুকিয়ে দিল সে। হার্টের কাজ পুরোপুরি বন্ধ হয়নি কারও। ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি শরীর।

একটু আশার আলো আছে ওইখানেই। আলখেল্লার পকেট থেকে একটা বাক্স বের করল কুয়াশা। ছোট বাক্সটা খুলে ফেলতেই দেখা গেল সিরিঞ্জ আর অ্যাম্পুল।

লাঙস্-এর পেশী সম্পূর্ণ অবশ হয়ে আছে। ফলে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ বন্ধ রয়েছে সকলের।

প্রত্যেকের শরীরে ইঞ্জেকশন দিল কুয়াশা।

কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। অবস্থা সেই একই রকম। কেউ নড়ছে না।

এমন সময় শোনা গেল নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ। ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস পড়ছে। ক্রমশ জোর হচ্ছে, দীর্ঘ হচ্ছে সেই শব্দ। দেখা গেল, সকলেরই বুক উঠছে নামছে…।

সকলের চেয়ে দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হলেও সকলের আগে চোখ মেলল ডি. কস্টা।

'মাই গড। বস্, হাপনি!' উঠে বসল ডি. কস্টা। কুয়াশা সানন্দে হাসল।

'বাটরূমে ছিলাম, সাডেনলি ঢুপ-ঢাপ সাউণ্ড শুনিটে পাইলাম! ছুটিয়া আসিয়া ডেকিলাম অল অ্যাণ্ড এভরি ওয়ান টলিটে টলিটে পড়িয়া যাইটেছে! টাহার পর—মাই গড—হামিও পড়িয়া গেলাম!'

শহীদ উঠে বসল এরপর। মি. সিম্পসন, রাজকুমারী ওমেনা ও কামাল প্রায় একই সাথে চোখ মেলল। রাসেলও উঠে বসল ধীরে ধীরে।

মুচকি হেসে শহীদ বলল, 'মরেই গিয়েছিলাম, কি বলো, কুয়াশা? তুমি সময় মত এসে পড়েছিলে, তাই এযাত্রা বাঁচলাম। আমার বিশ্বাস হোটেলের সেই বেলবয়টাকে নিশ্চয়ই এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'হোটেলের বেলবয়? তোমার কথা ঠিক…' মি. সিম্পসন বললেন।

শহীদ বলল, 'আমরা জ্ঞান হারাবার কয়েক মিনিট আগে ডি. কস্টা দরজা খুলে দিয়েছিল একজন বেলবয়কে, মনে নেই?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ…'

শহীদ বলল, 'আমার ধারণা আমরা বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়েছিলাম। এবং সেই গ্যাস আমদানি করেছিল বেলবয়টা।'

কামাল গর্জে উঠল, 'এখুনি আমি খোঁজ নিচ্ছি। ব্যাটাকে যদি পাই…।'

কৈ মাছের মত লাফাতে শুরু করল ডি. কস্টা, 'প্লিজ, মি. কামাল। ব্যাটাকে হাপনি আমার উপর ছাড়িয়া ডিন! হামি উহাকে হাঁড়ি কাবাব বানাইয়া খাইব…'

শহীদ কুয়াশার দিকে তাকাল।

কুয়াশা বলল, 'রাসেল এবং মি. ডি. কস্টাকে খুলনায় যেতে হবে। জরুরী। একটা প্লেন চার্টার করে চলে যান আপনারা, মি. ডি. কস্টা। আমি একটা তালিকা দিচ্ছি, ল্যাবরেটরি থেকে জিনিসগুলো নিয়ে আসতে হবে।'

'আমার কি কাজ, কুয়াশা?' জানতে চাইল রাজকুমারী।

'তুমি যাবে কামালের সাথে। পুলিসের কাছ থেকে সম্ভাব্য সাহায্য নিয়ে তোমরা নিজেরা খোঁজ নেবে আইনবিদ মোখলেসুর রহমানের অতীত জীবন, অভ্যাস-অনভ্যাস এবং বন্ধু-বান্ধব সম্পর্কে। এবং আপনি, মি. সিম্পসন, ফিরে যান নিজের চেম্বারে। সর্বশেষ ঘটনার খবর আমি চাই আপনার কাছ থেকে।'

শহীদের দিকে তাকাল কুয়াশা এরপর। বলল, 'আমরা একসাথে বেরুব। একটা ক্যামেরা কিনতে হবে আমাদেরকে। তারপর আমরা যাব মোখলেসুর রহমানের অফিসে। সে নাকি নিহত হবার আগে অদ্ভুত ধরনের আলোক-রশ্মি দেখেছিল—চলো, তদন্ত করে আসি। কিন্তু, তার আগে, এসো, আমরা বর্তমান বিপদ সম্পর্কে একটা ধারণা পাবার চেষ্টা করি।'

আলোচনা শুরু হলো ওদের।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এল সবার আগে কুয়াশা। সরকারী গোয়েন্দাদ্বয় খানিকটা পিছন থেকে তাকে অনুসরণ করতে শুরু করল। কুয়াশা তাদেরকে দেখেও দেখল না।

রাস্তার বিপরীত দিকের ফুটপাথে অপেক্ষা করছিল সেই বেঁটে লোকটা। সে হোটেলের লবিতে বসে খবরের কাগজ পড়ার ভান করছিল খানিকক্ষণ আগে। লোকটাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। এমন সময় হোটেল থেকে বেরিয়ে এল শহীদ, কামাল, রাসেল, ডি. কস্টা, মি. সিম্পসন ও রাজকুমারী। হাঁ হয়ে গেল বেঁটে লোকটার মুখ। দুঃস্বপ্ন দেখছে কিনা সন্দেহ হলো তার। চোখ রগড়ে নিল কয়েকবার। ভাল করে তাকাল তারপর। পরমুহূর্তে ঢোক গিলে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, 'অসম্ভব! এ হতেই পারে না! মরা মানুষ বেঁচে উঠল কিভাবে!'

পরমুহূর্তে সে তার বড় আকারের হাতঘড়ির দম দেবার চাবিটা ঘোরাতে শুরু করল দ্রুত।

রাসেল ও ডি.কস্টা একটা ট্যাক্সিতে উঠল। ট্যাক্সি ছুটে চলল এয়ারপোর্টের দিকে। মি. সিম্পসন, রাজকুমারী ও কামাল উঠল মি. সিম্পসনের গাড়িতে। থানা হেডকোয়ার্টারের দিকে ছুটল গাড়ি।

বেঁটে লোকটা তার হাতঘড়ির চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে একটা খালি ট্যাক্সিতে চড়ল। রাসেল ও ডি. কস্টা যে ট্যাক্সিতে চড়ে এয়ারপোর্টের দিকে রওনা হয়েছে সেই ট্যাক্সিকে অনুসরণ করতে শুরু করল তার ট্যাক্সি।

রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করছিল কুয়াশা। শহীদ তার সাথে গিয়ে উপস্থিত হলো। দু'জনে ঢুকল একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে। পনেরো মিনিট পর বেরিয়ে এল ওরা। দেখা গেল শহীদের হাতে বড়সড় একটা প্যাকেট। প্যাকেটের ভিতর সদ্য কেনা একটা ক্যামেরা।

ট্যাক্সি নিয়ে পৌঁছুল ওরা নিহত মোখলেসুর রহমানের অফিস বিল্ডিংয়ের সামনে।

এলিভেটরে চড়ে সাততলায় পৌঁছল দু'জন। করিডরে কেউ নেই।

দরজাটা বন্ধ বলেই মনে হলো। কিন্তু কুয়াশার হাতের মৃদু ধাক্কাতেই সেটা খুলে গেল। দরজা খোলাই ছিল।

দু'জন দু'জনের দিকে তাকাল ওরা। রুমের ভিতর আগে ঢুকল কুয়াশা। পিছন পিছন শহীদ। শহীদ ভিতরে পা রেখেই লক্ষ্য করল একটি দেয়াল আলমারির দরজার কবাট দুটো সামান্য একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে।

রুমের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কাগজপত্র। বোঝা যায়, কেউ সার্চ করেছে অফিসরুম। কোন কিছুর খোঁজে জিনিসপত্র নেড়েচেড়ে বিশৃংখলার চরম করে রেখেছে। একটা টেবিলের কাগজপত্র সব কার্পেটের উপর ফেলে দেয়া হয়েছে, দুটো চেয়ার পড়ে আছে উল্টে।

দেয়াল আলমারিটা কুয়াশা লক্ষ্য করেছে কিনা বোঝা গেল না।

উঁচু গলায় কথা বলে উঠল কুয়াশা, 'বুঝলে শহীদ এখানে এসে কোন লাভই হলো না আমাদের।'

কুয়াশার হাত ইতিমধ্যেই চলে গেছে আলখেল্লার পকেটে।

ওদের কাছ থেকে কমপক্ষে বারো ফুট দূরে দেয়াল আলমারিটা। কেউ যদি ওটার ভিতর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে থাকে, ওরা ব্যবধানটুকু অতিক্রম করার আগেই সে গুলি করে থামিয়ে দিতে পারবে ওদেরকে।

কুয়াশা শহীদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। চোখ মটকাল সে শহীদের দিকে তাকিয়ে, দেয়াল আলমারির দিকে পিছন ফিরে, পকেট থেকে ছোট্ট একটা মার্বেলের মত জিনিস বের করে নিজের মাথার উপর দিয়ে ছুঁড়ে মারল পিছন দিকে।

সাদা মার্বেলটা গিয়ে পড়ল ঠিক আলমারির সামনে। পরমুহূর্তে নিকষ কালো ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল আলমারিটা। সেই সাথেই কুয়াশা লাফ দিয়ে চলে গেল আলমারির পাশে। একটা হাত আলমারির ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে হিড়হিড় করে টেনে বের করে আনল একজনকে।

চিৎকার করে উঠল মেয়েটা।

শহীদ তাড়াতাড়ি খুলে দিল রুমের সব ক'টা জানালা যাতে ধোঁয়ারাশি বেরিয়ে যেতে পারে।

মেয়েটার একটা হাত চেপে ধরে আছে কুয়াশা। ব্যথায় এবং ভয়ে এখনও চিৎকার করছে যুবতী।

পাঁচ

চিৎকার করছিল মেয়েটা।

'থামো!' ধমকে উঠল কুয়াশা। আশ্চর্য, এক কথায় চুপ করল মেয়েটা।

'কে তুমি? অফিসটার হাল এমন করছ কেন?' মেয়েটা ঢোক গিলল পরপর কয়েকবার।

'চুপ করে থাকলে কোন লাভ হবে না। কথা বলো।

'আমার নাম সাইদা শরমিন। আমি একজন সাংবাদিক। আমি···আমি শুধু দেখছিলাম··· দেখছিলাম ···।'

'কি দেখছিলে?' শান্ত ভাবে জানতে চাইল কুয়াশা।

'ফিচার লেখার মালমশলা কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখছিলাম···'

কুয়াশা হঠাৎ জানতে চাইল, 'তোমার রুমালটা কোথায় দেখি?'

টেবিলের উপর থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়ে খুলে ফেলল কুয়াশা। নানারকম কসমেটিক্স এবং কিছু টাকা রয়েছে ভিতরে! কোন রুমাল নেই।

কুয়াশা বলল, 'মোখলেসুর রহমান খুন হয়েছে—তার অফিসে কেন এসেছ তুমি? তোমার নামের প্রথম অক্ষর লেখা রুমালটা পাওয়া গেছে আর একজন নিহত লোকের সাথে। পুলিস সেই রুমালের মালিককে খুঁজছে।'

মেয়েটা ভয়ে কাঁপছে। কুয়াশার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না সে। বলে উঠল, 'আমি লোকটাকে পড়ে যেতে দেখি, তারপর দৌড়ে যাই তাকে সাহায্য করার জন্যে, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি সে মারা গেছে, তারপর আমি দৌড়ে চলে যাই।'

শহীদ বলে উঠল, 'সত্যি কথা বলবে বলে মনে হয় না। কুয়াশা, পুলিসকে ডেকে তাদের হাতেই তুলে দাও বরং।'

পুলিস ডাকার কোন ইচ্ছা শহীদের নেই। স্রেফ মেয়েটাকে ভয় দেখাবার জন্যেই কথাটা বলা।

'পুলিসের কাছেও আমি মুখ খুলব না। মি. কুয়াশা, আপনি হয়তো বুঝবেন—কথা বলার মত অবস্থায় নেই আমি।'

কুয়াশা বলল, 'হুঁ। আচ্ছা, মোখলেসুর রহমানকে চিনতে তুমি?'

'চিনতাম। কিন্তু তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানি না।'

এমন সময় পাশের রুম থেকে টেলিফোনের শব্দ ভেসে এল।

শহীদের দিকে তাকাল কুয়াশা।

মেয়েটা বলে উঠল, 'মি. সিম্পসনের ফোন, মি. কুয়াশা।'

'তুমি জানলে কিভাবে? এর আগেও ফোন করেছিলেন মি. সিম্পসন?'

মেয়েটা বলল, 'আমাকে ছেড়ে দিন। আপনাদের সাথে কথা বলছি জানলে আমাকে মেরে ফেলবে ওরা।'

'কারা?'

মেয়েটার মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, 'না, আর একটা কথাও বলতে রাজি নই আমি।'

কুয়াশা বলল, 'এয়ারপোর্টে কেন গিয়েছিলে? অ্যাক্সিডেন্টের সময়ও তোমাকে আমি দেখেছি, ট্যাক্সি করে ওই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলে।'

ফোনের বেল বেজেই চলেছে। কুয়াশা শহীদের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে একটা ইঙ্গিত করে চলে গেল পাশের রুমে।

শহীদ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কারা তোমাকে মেরে ফেলবে, শরমিন?'

মেয়েটা চুপ করে রইল। শহীদ পকেটে হাত দিল। এমন সময় মেয়েটা দরজার দিকে ছুটল সবেগে।

মুচকি হাসল শহীদ। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল ও। মেয়েটিকে ধরার কোন চেষ্টাই করল না।

পাশের রুম থেকে কোন শব্দ আসছে না। ধীর পায়ে দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে শহীদ দেখল কুয়াশা রুমের ভিতর নেই। রুমের অপর দরজাটা খোলা রয়েছে, বেরিয়ে গেছে সে।

ফোন করেছিলেন মি. সিম্পসন।

কুয়াশা রিসিভার তুলতেই তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, প্রায় চিৎকার করে বললেন তিনি, 'হ্যালো! কুয়াশা?'

'বলছি।'

'সিম্পসন। ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে বলছি। ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে গেছে এখানে। এখুনি তুমি এয়ারপোর্টে চলে এসো। একটা প্লেন ক্র্যাশ করেছে। রাসেল, ডি. কস্টা কেউ বেঁচে নেই!'

মুহূর্তের মধ্যে পাথর হয়ে গেল যেন কুয়াশা। দ্রুত কাজ করছে তার ব্রেন। রাসেল এবং ডি. কস্টা মারা গেছে! অ্যাক্সিডেন্ট ঘটল কিভাবে? নাকি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে ওরা? শহীদকে কথাটা জানানো উচিত হবে না এখনই। নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে।

ট্যাক্সি থেকে এয়ারপোর্টের সামনে নামতেই মি. সিম্পসন ছুটতে ছুটতে কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর সাথে আর এক ভদ্রলোক রয়েছেন।

'আমি জয়নাল আবেদীন, এয়ারপোর্ট ম্যানেজার...।'

কুয়াশা যেন ভদ্রলোকের কথা শুনতে পায়নি, লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে সে। কুয়াশার পাশে থাকার জন্য মি. সিম্পসন ও এয়ারপোর্ট ম্যানেজারকে দৌড় শুরু করতে হলো।

'কিভাবে ঘটল ঘটনাটা?'

উত্তর দিল না এয়ারপোর্ট ম্যানেজার। অদূরেই দাঁড়িয়ে ছিল একটি জীপ। সকলে গিয়ে উঠল সেটায়। মি. সিম্পসন স্টার্ট দিয়ে তীর বেগে ছুটিয়ে দিলেন সেটাকে।

টারমাকের শেষ মাথায় গিয়ে থামল জীপ। নামার আগেই কুয়াশা ছোটখাটো একটা ভিড় দেখতে পেল। পুলিস কর্ডন করে রেখেছে জায়গাটা। অ্যাম্বুলেন্স দেখা যাচ্ছে একটা। ফায়ার ব্রিগেডের গাড়িও রয়েছে দুটো। ধ্বংসপ্রাপ্ত এরোপ্লেনটাকে দেখা যাচ্ছে অদূরে। আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছে।

কয়েক পা এগোতেই দেখা গেল ডি. কস্টা ও রাসেলকে। ডি. কস্টার রোগা-পাতলা দেহটা দুমড়ে মুচড়ে একেবারে এতটুকু হয়ে গেছে। রাসেলের দেহটা লম্বা হয়ে পড়ে আছে হাত-পা ছড়িয়ে, তার মাথায় বড় একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে। আরও একটা লাশ দেখা যাচ্ছে। দেহটা পুড়ে গেছে সম্পূর্ণ।

'চার্টারড প্লেনের ব্যবস্থা করতে আমরা ঘন্টাখানেক সময় চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনার সহকারীরা বললেন, অত দেরি করা সম্ভব নয়। তাই তাড়াহুড়ো করে একটা ব্যবস্থা করে দিই। কিন্তু প্লেনের ইঞ্জিনে কোন গোলমাল ছিল না। কাল রাতে মেকানিকরা চেক করে কোন খুঁত পায়নি। আমাদের পাইলটের সাথে মি. রাসেলও ছিলেন সম্ভবত কন্ট্রোল কেবিনে।'

কুয়াশা শুনছে এয়ারপোর্ট ম্যানেজারের কথা।

'প্লেনটা স্টার্ট নিয়ে টারমাক ধরে ছোটার পরপরই আমরা লক্ষ্য করি কোথাও কোন গোলমাল হয়েছে। প্লেনটা দিশে হারিয়ে ফেলেছিল। ব্যাপারটা কেন ঘটছে বুঝতে পারছিলাম না। যাক, কয়েক মুহূর্ত পরই বেশ সুন্দর ভাবেই ছুটতে শুরু করে। তারপর রানওয়ে থেকে শূন্যে উঠে যায়। পঞ্চাশ ফিটও ওপরে ওঠেনি, এমন সময় হঠাৎ দেখলাম প্লেনটা ঘুড়ির মত গোত্তা খেয়ে নিচের দিকে নামছে, নাকটা মাটির দিকে ঝুলে পড়েছে তখনই। ইঞ্জিনের শব্দটা শুনতে পাচ্ছিলাম—বারবার থেমে যাচ্ছিল, বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল ইঞ্জিন, তারপর একেবারেই থেমে গেল। কিছুই বুঝতে পারলাম না···।'

'অস্বাভাবিক কিছুই কি চোখে পড়েনি আপনাদের?'

মাথা নেড়ে 'না' বললেন এয়ারপোর্ট ম্যানেজার, তারপরই বলে উঠলেন, 'না, আমি নিজে ঠিক কিছু দেখিনি। তবে আমাদের একজন মেকানিক একটা কথা বলছিল বটে। বিশেষ গুরুত্ব দিইনি তার কথায়। সে বলছিল, সে নাকি প্লেনের ইঞ্জিনের নিচে আগুনের ফুলকির মত বিন্দু বিন্দু নীল লাল আলো দেখতে পেয়েছে। হয়তো কিছুই না, ভুল দেখেছে···।'

কোন মন্তব্য করল না কুয়াশা। রাসেল এবং ডি. কস্টার নিঃসাড় দেহ দুটোর কাছে হাঁটু মুড়ে বসল সে।

মি. সিম্পসন মৃদু গলায় বলে উঠলেন। 'আশা নেই, কুয়াশা। আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। পালস্ নেই। নিঃশ্বাস পড়ছে না···।'

মি. সিম্পসন ফোন করে কোন দুর্ঘটনার সংবাদ দিয়েছেন, সেই সংবাদ পেয়ে

কুয়াশা চলে গেছে এটা অনুমান করে নিতে বেগ পেতে হলো না শহীদকে। প্যাকেট থেকে বের করল ও ক্যামেরাটা। কুয়াশার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করে দিল সময় নষ্ট না করে।

বিশ মিনিটের মধ্যেই জটিল কাজটা শেষ করল শহীদ। সিগারেট ধরিয়ে চিন্তা করার চেষ্টা করল, মোখলেসুর রহমান অদ্ভুত আলো কোথায় দেখতে পেয়েছিলেন। জানালার দিকে দৃষ্টি পড়ল ওর। সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিচে রাস্তা। রাস্তার ওপারে উঁচু উঁচু বিল্ডিং। বিল্ডিংয়ের মাথার উপরে আকাশ। কিন্তু আলো কোথায়?

আলোক সঙ্কেত সেই সময় নিক্ষিপ্ত হলেও শহীদের তা দেখতে পাবার কথা নয়। রঙিন চশমা ছাড়া সে আলো কেউ দেখতে পায় না।

রাস্তার বিপরীত দিকের বিল্ডিংয়ের পাঁচ তলার একটি রুম থেকে দেওজী ও সান্তারাম জানালা পথে সেই মুহূর্তে দেখছিল শহীদকে।

নিজেদের মধ্যে সরস আলোচনা চলছিল।

'আহা, বেচারী। দুঃখ হচ্ছে প্রখ্যাত ডিটেকটিভের জন্যে। আর পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই কি ঘটতে চলেছে জানে না বেচারা।'

সান্তারাম বলে উঠল, 'শয়তান কুয়াশার চেলাগুলোকে একে একে সাবাড় করা সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু স্বয়ং শয়তানটাকে যতক্ষণ টুকরো টুকরো করে ডালকুত্তাকে দিয়ে খাওয়াতে না পারছি ততক্ষণ স্বস্তি পাচ্ছি না, যাই বলো…!'

'ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো। তুমি কি মনে করো আমাকে? আমার প্ল্যানটা বলিনি তোমাকে? আগে শয়তানটার ডান হাত বাঁ হাতগুলোকে ভেঙে দিয়ে দুর্বল করে নিই, তারপর…।'

সান্তারাম বলল, 'প্ল্যানটা ভাল। যাক, এদিকের ঝামেলা মিটে যাবে ধীরে ধীরে। আমি ভাবছি মি. খাণ্ডেলবাল আইয়ার কথা। কোথায় ডুব মারল সে? চুক্তিটা ফাইনাল করার সময় এসে গেছে,—তুমি কি মনে করো?'

'আরও একটু ধৈর্য ধরো। হাতের অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ না করলে চুক্তির অনেক শর্ত আমাদের প্রতিকূলে যাবে…।'

দেওজী কাংকারিয়া টেবিলের দেরাজ খুলে তার লোমশ হাতটা ঢুকিয়ে দিল ভিতরে।

এদিকে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কোনরকম আলোকবিন্দু বা আলোক সঙ্কেতের দেখা না পেয়ে হোটেলে ফেরার সিদ্ধান্ত নিল শহীদ।

দরজা খুলে করিডরে পা রাখতেই ওর মাথা বরাবর নেমে এল ভারি একটা লোহার রড।

বিদ্যুৎবেগে বসে পড়ল শহীদ। একই সাথে মাথার উপর হাত তুলে লোহার রডটা ধরে ফেলেছে ও। আক্রমণকারীর পা ধরে টান মারল সজোরে, পড়ে গেল লোকটা। লোকটার হাত ধরে সিধে হয়ে দাঁড়াল শহীদ। পা দিয়ে সজোরে লাথি মেরে দেহটাকে উপুড় করে দিয়ে মোচড় দিল হাতে। তারপর লাথি মারল বগলের কাছে। মট্ করে শব্দ উঠল, ভেঙে গেল হাতটা।

আক্রমণকারীরা সংখ্যায় পাঁচজন।

বাকি চারজন এতক্ষণ দর্শক ছিল। এবার তারা দু'দিক থেকে এগিয়ে এল।

শত্রুরা এগিয়ে আসার আগে শহীদই এগিয়ে গেল তাদের দু'জনের দিকে।

আড়াইমণ ওজনের একটা ঘুসি মারল শহীদ সামনের লোকটার তলপেটে, ছিটকে গিয়ে পড়ল সে করিডরের দেয়ালের গায়ে। বাঁ পাশ থেকে লাফিয়ে আরও দু'জন ইতিমধ্যে চলে এসেছে শহীদের কাছে। একজন দুই বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরল ওকে, অপরজন মুখে, পেটে, বুকে এলোপাতাড়ি ঘুসি চালাতে লাগল। সেই ফাঁকে ডান দিকের অপর লোকটা মেঝে থেকে তুলে নিল লোহার ভারি রডটা।

হাত এবং পা চালাল শহীদ। কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে একজন লোক আর্তচিৎকার করে উঠে ছেড়ে দিল শহীদকে। অন্ধ আক্রোশে যে লোকটা ঘুসি মারছিল তার তলপেটে লাথি মারতেই সে ছিটকে গিয়ে পড়ল পাঁচ হাত দূরে। বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াল শহীদ তৃতীয় শত্রুর মুখোমুখি।

কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানো পর্যন্তই, সবেগে ওর মাথার উপর যে লোহার রডটা নেমে আসছিল সেটাকে ঠেকাতে পারল না ও।

মাথায় আঘাত লাগার সাথে সাথে টলে উঠল দেহটা। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল ও।

শত্রুরা দ্রুত কেটে পড়ল একজন একজন করে। আহত লোকগুলোই চলে গেল সবার আগে। একজন লোক পকেট থেকে মদের বোতল বের করে শহীদের চোখেমুখে ছিটিয়ে দিল খানিকটা। তারপর দু'জন মিলে ধরাধরি করে নিয়ে চলল শহীদকে।

রাস্তার লোকেরা দেখল ওদেরকে। শত্রুপক্ষের একজন যেচে পড়েই শহীদকে দেখিয়ে বিল্ডিংয়ের কাছাকাছি একটা দোকানের কর্মচারীকে বলল, 'মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেছে, আমাদেরই বন্ধু মানুষ···।'

ছয়

জ্ঞান ফিরে পেয়ে শহীদ অনুভব করল ওর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। হাসি পেল ওর। শত্রুরা কি মনে করে ওর ক্ষতের চিকিৎসা করেছে বোঝা মুশকিল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে উঠল ও।

এ কেমন কামরা? চারদিকে ইস্পাতের দেয়াল, মেঝে এবং ছাদও ইস্পাতের। ছোট্ট একটা ভেন্টিলেটার দেখা যাচ্ছে, মাথা গলবে না শত চেষ্টাতেও। কামরার ভিতরটা আলোকিত। সিলিংয়ের আড়ালে অদৃশ্য বালব্ আছে।

কামরাটার কোন দরজা দেখা যাচ্ছে না। জিনিসপত্র বলতে একটি স্টীলের শক্ত চেয়ার ছাড়া আর কিছুই নেই। সেই চেয়ারেই বসে আছে শহীদ। চেয়ারের সাথে নাইলন কর্ড দিয়ে মজবুত করে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে।

মাথায় কোন ব্যথা নেই। তবে ডান হাতটা একটু ব্যথা ব্যথা করছে।

ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে ওকে, বুঝতে পারল ও। পেইন-রিলিভার জাতীয় ইঞ্জেকশন, যার ফলে মাথার ব্যথাটা নেই।

ঘ্যার ঘ্যার ঘ্যার ঘ্যার···

শব্দ শুনে সামনে দেয়ালের দিকে তাকাল শহীদ। ইস্পাতের দেয়াল মাঝখান থেকে দু'ফাঁক হয়ে যাচ্ছে।

থামল শব্দটা। ফাঁক হয়ে যাওয়া দেয়ালের ওপার থেকে কামরার ভিতর ঢুকল দু'জন লোক।

দেওজী কাংকারিয়া এবং সান্তারাম উল্কা।

'কি হে টিকটিকি, কেমন বোধ করছ? শখের গোয়েন্দাগিরি করার সাধ মিটেছে তো?'

দাঁতে দাঁত চাপল শহীদ। কথা বলল না।

সান্তারাম উল্কা বলে উঠল, 'কথা বলে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। কুত্তাটাকে কষ্ট দিয়ে মারব বলে এতক্ষণ অপেক্ষা করেছি। জ্ঞান ফিরে এসেছে, এবার শুরু করা যাক কাজটা···'

হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে একটু সরে গিয়ে দাঁড়াল সান্তারাম উল্কা। একান্ত মনোযোগের সাথে কি যেন অনুভব করার চেষ্টা করছে সে।

দেওজী কাংকারিয়াও নিঃশব্দে চেয়ে আছে সিলিংয়ের দিকে, সে-ও যেন কিছু শোনার বা দেখার বা অনুভব করার চেষ্টা করছে। অথচ কোথাও কোন শব্দ নেই, কোথাও কোন আলোক সঙ্কেতও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মনে হচ্ছে, দু'জনেই যেন কোন মেসেজ রিসিভ করছে—মাধ্যমটা অজ্ঞাত।

দেওজী কাংকারিয়া অস্ফুটে বলে উঠল, 'রাসেল···এবং কুয়াশার সহকারী ডি. কস্টা···বেঁচে গেছে!···অ্যাম্বুলেন্স··· সার্জেন···অক্সিজেন···লাঙস্ আবার কাজ করছে··· ডি. কস্টা···রাসেল দু'জনেই গুরুতর রকম আহত হয়েছে ···কিন্তু কুয়াশা যথাসময়ে···পৌঁছেছে···তার···চিকিৎসায় তারা মৃত্যুর···হাত থেকে···রেহাই··· পেয়ে···গেছে এ···যাত্রা···!'

সান্তারাম উল্কা চিৎকার করে উঠল, 'কোন কাজেই সফল হতে পারছি না আমরা। ওরা দু'জন বাঁচবে একথা ভাবাই যায় না—অথচ বেঁচে গেছে!'

দেওজী কাংকারিয়া দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'শয়তান কুয়াশা দেখছি সত্যিই জাদু জানে!'

'জাদু জানুক আর মন্ত্র জানুক, আমাদের সাথে চালাকি করে রেহাই পাবে না সে। ওরা দু'জন বেঁচে গেছে ঠিক, কিন্তু আমাদের মুঠোয় অন্তত একজন তো রয়েছে। দেওজী, দেরি করে লাভ কি, খতম করে দিই টিকটিকিটাকে।'

দেওজী বলল, 'ব্যস্ত হয়ো না, সান্তারাম। একটু বুদ্ধি খরচ করে কথা বলো, বুঝলে? এখনই শখের গোয়েন্দাকে হত্যা করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। জিম্মি হিসেবে ওকে আমাদের দরকার হতে পারে।'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল দেওজী আর সান্তারাম। ইস্পাতের দেওয়াল দু'দিক থেকে সরে এসে জোড়া লেগে গেল আবার।

চেয়ারের সাথে হাত এবং পা বাঁধা শহীদের। বাঁধনগুলো খোলার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করল সে আবার । এর আগেই হাতের বাঁধন মুক্ত করার জন্য হাত দুটো মোচড়াচ্ছিল ও। সান্তারাম এবং দেওজী এসে পড়ায় কাজটায় বাধা পড়েছিল। ইতিমধ্যে বাঁধন ঢিলে করে ফেলেছিল ও।

মিনিট পাঁচেক পর হাতের বাঁধন খুলে গেল। হাতের সাহায্যে পায়ের বাঁধন খুলতে সময় লাগল মাত্র দুই মিনিট।

কক্ষটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল শহীদ। এখান থেকে পালানো সম্ভব নয়, কথাটা অচিরেই বুঝল ও। এদিকে তাকে এখন না হলেও পরে হত্যা করা হবে। উপায় একটা বের করতেই হবে। জুতোর হিলের ফাঁপা কুঠুরী থেকে ছোট্ট একটা পেন্সিল বের করল ও। ভেন্টিলেটরের নিচে নিয়ে গেল স্টীলের চেয়ারটাকে। চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে পেন্সিলটা ভেন্টিলেটরের ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে বের করে দিল অর্ধেকটা। তারপর পেন্সিলের গায়ের বোতামটায় আঙুলের চাপ দিল। বেশ কিছুক্ষণ একইভাবে বোতামটা টিপল ও।

ডি. কস্টা এবং রাসেলের সাথে হাসপাতালে প্রায় ঘণ্টাখানেক রইল কুয়াশা। সে নিজে রাসেল এবং ডি. কস্টার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে। হাউজ ফিজিশিয়ান ধরেই নিয়েছিলেন ওরা বাঁচবে না। নিঃশ্বাস পড়ছে না, পাল্‌স্ প্রায় নেই—মরেই তো গেছে। কিন্তু কুয়াশা বুঝিয়ে দিয়ে বলল, 'লাঙস্ প্যারালাইজড হয়ে গেছে, তা আবার সচল হয়ে উঠবে। ওরা নিঃশ্বাস ফেলছে না বা শ্বাস নিচ্ছে না দেখেও ঘাবড়াবার কিছু নেই। অক্সিজেনের অভাব হয়নি এতটুকু। কারণ, ওরা অক্সিজেন ক্যাপসুল খেয়েছিল বিপদটা টের পেয়েই।

রাসেলের ডান হাতটা জখম হয়েছে। অপারেশন করার দরকার হলো না অবশ্য। তবে মাথায় অপারেশন করতেই হলো। তার মাথার আঘাতটা বেশ গভীর। অপারেশন করল স্বয়ং কুয়াশা। সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা ডি. কস্টার ব্যাপারটা। প্রথমে দেখে কুয়াশার মনে হয়েছিল তার হাড়-পাঁজরা একটাও অটুট নেই। কিন্তু পরীক্ষা করার পর দেখা গেল একটা রিব ভেঙেছে মাত্র তার, কোথাও আর কোন মারাত্মক আঘাত সে পায়নি।

দুজনেই দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে শুরু করল। নিজের তৈরি কিছু ওষুধ খেতে দিল ওদেরকে কুয়াশা। ইঞ্জেকশনও পুশ করল একাধিক। ব্যথা বেদনার কোন অনুভূতিই রইল না ওদের মধ্যে।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে দুজনেই উঠে বসল বেডের উপর। তাজা, উৎফুল্ল দেখাচ্ছে দুজনকে।

রাসেল বলল, 'আশ্চর্য ধরনের আলোর বিন্দু, অনেকটা সরষেফুলের মত দেখতে, তবে নীল এবং লাল রঙের, দেখতে পেয়েছিলাম আমরা। সাথে সাথে অক্সিজেন ক্যাপসুল খেয়ে ফেলি। কিন্তু তবু, দম বন্ধ হয়ে এল আমাদের। তারপর প্লেনের ইঞ্জিন থেমে গেল···এরপরের ঘটনা মনে নেই।

ডি. কস্টা হাতের মুঠি পাকিয়ে ঘুসি মারার ভঙ্গি করে বলে উঠল, 'মি. কুয়াশা,

হামাডেরকে দ্যাট বেলবয় বুড্ডু বানাইয়াছে। প্লেনের কাছাকাছি একটি লোককে হামি ডেকিয়াছিলাম। টখন ডাউট করি নাই। বাট এখন মনে হইটেছে সে লোকটা আর কেহই নহে, হোটেলে যে বেলবয়টা হামাডেরকে মার্ডার করিটে চাহিয়াছিল এ ব্যাটা সেই···।'

কুয়াশা ফিরে এল হোটেলে। কামাল আর রাজকুমারীর হোটেলে ফিরে রিপোর্ট করার কথা।

স্যুইটে ঢুকে দরজা বন্ধ করার প্রায় সাথে সাথেই টেলিফোনের বেল ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফোনের দিকে তাকিয়ে রইল কুয়াশা। তারপর পা বাড়িয়ে এগিয়ে গেল। রিসিভারটা তুলে কানে লাগাল সে। কিন্তু এ কেমন ব্যাপার! অপর প্রান্ত থেকে কেউ কথা বলছে না। কারণটা কি? লাইন যে কেটে দেয়া হয়েছে তাও নয়।

রিসিভারটা কান থেকে সরাল না কুয়াশা। কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। তারপর খটাং করে শব্দ হলো একটা লাইন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সেই সাথে। এতক্ষণে কেউ রিসিভার নামিয়ে রাখল অপর প্রান্তে।

ব্যাপারটা কি? পাশের কামরায় চলে এল সে।

একমুহূর্ত চিন্তা করে একটা বোতাম টিপে পাশের কামরা থেকে হোটেলের টেলিফোন অপারেটরের সাথে কথা বলল কুয়াশা।

শান্তভাবে অপেক্ষা করছিল কুয়াশা, এমনসময় দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল কামাল ও রাজকুমারী। নিঃশব্দে চেয়ে রইল ওরা কুয়াশার দিকে। রাসেল ও ডি. কস্টার কথা রাস্তাতেই শুনেছে ওরা। অশুভ সংবাদ ছড়াতে বেশি সময় লাগে না. শহরের সব লোক ইতিমধ্যেই প্লেনক্র্যাশের খবর জেনে ফেলেছে।

দুজনকেই ভারি উৎকণ্ঠিত দেখাচ্ছে।

কুয়াশা হাসল।

রাজকুমারীর মুখ থেকে সব দুশ্চিন্তার ছাপ মুছে গেল।

কামাল জিজ্ঞেস করল, 'কি খবর, কুয়াশা?'

'ভাল।'

রাজকুমারী জানতে চাইল, 'বাঁচবে নিশ্চয়ই ওরা, কুয়াশা?'

'না বাঁচার তো কোন কারণ ঘটেনি। যাক, তোমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানতে পেরেছ?'

রাজকুমারী বলল, 'বিশেষ কিছু না।'

কামাল ব্যাখ্যা করে বলল, 'মোখলেসুর রহমান খুব নাম করা আইনবিদ ছিলেন। বেশ ভাল টাকা রোজগার করছিলেন। অবিবাহিত। বন্ধু-বান্ধব সবাই বুদ্ধিজীবী। কোন শত্রু ছিল না, ঝগড়া বিবাদ করেননি কখনও কারও সাথে···।'

রাজকুমারী বলল, 'একটা মাত্র অদ্ভুত ব্যাপার জানা গেছে। তার সহকারী উকিল আমাদেরকে বলল···।'

রাজকুমারী থেমে গেল। টেলিফোন বাজছে।

কামাল হাত বাড়াল রিসিভার ধরার জন্য। আশ্চর্য একটা কাণ্ড করে বসল কুয়াশা। প্রায় ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল সে কামালকে। বলে উঠল, 'ছুঁয়ো না!'

কথাটা বলেই পাশের কামরায় গিয়ে ঢুকল কুয়াশা। পাশের কামরাতেও টেলিফোন আছে।

ফোন করেছে হোটেলের টেলিফোন অপারেটর। তার কাছ থেকে একটা তথ্য নিয়ে ফিরে এল কুয়াশা ড্রয়িংরুমে।

বলল, 'হোটেল থেকে বেরিয়ে ডান দিকে যাবে তোমরা। পঞ্চাশ গজের মত যাবার পর একটা ড্রাগ স্টোর দেখতে পাবে। সেখান থেকে একজন লোক তিন মিনিট আগে ফোন করছিল। লোকটাকে ধরে জেরা করবে। কুইক!'

কামাল চাপা গলায় বলে উঠল, 'এতক্ষণে অ্যাকশন শুরু হলো তাহলে!'

ছুটল ওরা।

তিন মিনিট পর আবার টেলিফোনের বেল বেজে উঠল।

কুয়াশা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে একটা চামড়ার ব্যাগ থেকে নাইলনের সুতো বের করল। ড্রয়িংরুমের টেলিফোনের রিসিভারটা ক্রেডল থেকে না তুলেই সেটাকে সুতো দিয়ে বাঁধল। তারপর সুতো ছাড়তে ছাড়তে পাশের বেডরুমে গিয়ে ঢুকল সে।

বেডরুম ও ড্রয়িংরুমের মধ্যবর্তী দরজাটা ভিড়িয়ে দিল—সামান্য একটা ফাঁক রইল মাত্র, যাতে ড্রয়িংরুমটা দেখা যায়।

টেলিফোনের বেল বেজেই চলেছে।

সুতোর একটা প্রান্ত কুয়াশার হাতে। সেটা ধরে টান মারল সে। ড্রয়িংরুমের টেলিফোনের রিসিভার ক্রাডল থেকে পড়ে গেল টেবিলের উপর। সেই সাথে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে থরথর করে কেঁপে উঠল সুউচ্চ হোটেল ভবন। ড্রয়িংরুমের আসবাবপত্র ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সব। বিস্ফোরণের সময় ড্রয়িংরুমের ভিতর কেউ যদি থাকত, নির্ঘাৎ মরতে হত তাকে।

ইতিমধ্যে কামাল নেপালী ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে এবং রাজকুমারী বাঙালী যুবকের ছদ্মবেশে হোটেল থেকে বেরিয়ে দ্রুত হেঁটে ড্রাগ স্টোরটা খুঁজে বের করে ফেলেছে। দোকানের ভিতর ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবছিল ওরা, এমন সময় একজন গাট্টাগোট্টা চেহারার লোককে বেরিয়ে আসতে দেখল ওরা। লোকটার হাতে অস্বাভাবিক বড় আকারের একটা হাতঘড়ি রয়েছে।'

'এই লোকই!' কামাল বলল।

'কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ওকে ধরে জেরা করে কি লাভ। তারচেয়ে চলো, ফলো করি। ওদের আস্তানাটা হয়তো চেনার সুযোগ পেয়ে যাব।'

'কিন্তু কুয়াশা যে বলল···।'

রাজকুমারী হাসল, 'আমার পদ্ধতি সম্পর্কে জানে কুয়াশা। নিজের বুদ্ধি মত কাজ করার স্বাধীনতা সে আমাকে দিয়েছে।'

সাত

সিগারেটের গন্ধেই কুয়াশা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের অনুপস্থিতে স্যুইটের ভিতর কেউ ঢুকেছিল। সস্তাদরের সিগারেট, গন্ধটা তখনও ভাসছিল ড্রয়িংরুমের বাতাসে। তারপর এল ফোন। ফোন এল কিন্তু অপরপ্রান্ত থেকে কেউ কথা বলল না।

অসাধারণ বুদ্ধির অধিকারী কুয়াশা, ব্যাপারটা অনুমান করে নিতে বেগ পেতে হলো না তাকে।

শত্রুপক্ষের লোকটা ভীষণ ধূর্ত, সন্দেহ নেই। বোমাটা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল সে টেবিলের নিচে। সেই টেবিলের উপরই ছিল টেলিফোনটা। সরু তার টেলিফোন বক্সের বেল এবং বোমার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছিল। প্রথম টেলিফোন কল এল, কুয়াশা রিসিভার তুলল, সেই সাথে ইলেকট্রিকাল সার্কিট সেট হয়ে গেল বোমায়। দ্বিতীয় ফোন কলের পর রিসিভার তোলা মাত্র সার্কিটটা ভেঙে যাবার কথা, সেই সাথে ঘটবার কথা বিস্ফোরণ।

শত্রুপক্ষের কেউ না কেউ অপেক্ষা করছিল কামাল ও রাজকুমারী কখন ড্রয়িংরুমে ঢোকে তা দেখার জন্য। তিনজনকে বোমার সাহায্যে হত্যা করারই পরিকল্পনা ছিল শত্রুপক্ষের। কিন্তু কুয়াশা যে কামাল এবং রাজকুমারীকে বাইরে পাঠিয়ে দেবে তা তারা ভাবতে পারেনি। তারা এ-ও ভাবতে পারেনি যে কুয়াশা তাদের গোপন ষড়যন্ত্র উদঘাটন করে এভাবে আত্মরক্ষা করবে।

হোটেল কর্মচারীরা এবং ম্যানেজার ছুটে এল। ছুটে এল ভীত-সন্ত্রস্ত বোর্ডাররা। কুয়াশা ঝাড়া তিন মিনিট ধরে ব্যাখ্যা করে বোঝাল যে বোমাটা ফাটাবার ব্যবস্থা করেছিল একজন শত্রু, তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাকে এবং তার বন্ধুদের হত্যা করা।

হোটেল ম্যানেজার ব্যাখ্যাটা শুনলেন। কুয়াশার নির্দেশে অপর একটি স্যুইটের ব্যবস্থাও করলেন। কিন্তু বিস্ফোরণটা শত্রুপক্ষের কাণ্ড একথা তিনি যেন মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি শুনেছিলেন বিজ্ঞানী কুয়াশা নানাধরনের মারাত্মক রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে থাকে।

রহস্যটা উদঘাটনের জন্য উঠে পড়ে লাগল পুলিস। কুয়াশা তাদের উপরেই ছেড়ে দিল দায়িত্বটা। হোটেল ম্যানেজার অবশ্য নিজের ধারণার কথা উচ্চারণ করল না। কারণ কুয়াশা তাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোটা অঙ্কের একটা চেক দিয়ে দিয়েছে তখুনি।

শহীদ ফিরছে না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়ল কুয়াশা। শত্রুপক্ষ শহীদের ফেরার জন্য অপেক্ষা না করেই বোমা ফাটিয়েছে। তার মানে, শহীদের জন্য তারা ভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ইতিমধ্যে—অনুমান করল কুয়াশা।

দ্রুত ফোন করল কুয়াশা কয়েক জায়গায়। ঢাকা পুলিস বাহিনী সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিল। মি. সিম্পসন স্বয়ং শহীদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

আধঘন্টার মধ্যে রিপোর্ট এল। মোখলেসুর রহমানের অফিস বিল্ডিংয়ের কাছের এক দোকানের কর্মচারী জানিয়েছে, কিছু সময় আগে দু'জন লোক একজন মাতালকে ধরাধরি করে নিয়ে গেছে।

মাতালটা যে শহীদ, বুঝতে পারল কুয়াশা।

বড় একটা দেয়াল-আলমারি খুলে ছোট ছোট ট্যাবলেট, ক্যাপসুল এবং বেশ কয়েকটা শিশি বের করল কুয়াশা। আলখেল্লার বিভিন্ন পকেটে ভরল সেগুলো পকেট থেকে কিছু ট্যাবলেট, যন্ত্রপাতি, শিশি বের করে রেখে দিল আলমারির তাকে। জরুরী পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য এই সব যন্ত্রপাতি এবং ওষুধপত্র সম্ভাব্য বিপদের ধরন-ধারণ অনুমান করে বিশেষ বিশেষ ওষুধ-পত্র এবং যন্ত্রপাতি সাথে রাখে সে।

আলমারি বন্ধ করে পিছন ফিরতে গিয়েই ভুরু কুঁচকে কান পাতল কুয়াশা কোথাও কোন শব্দ নেই। কিন্তু কুয়াশার কান অসাধারণ। সাধারণ একজন লোক যে শব্দ শুনতে পায় না কুয়াশা সে শব্দ অনায়াসে শুনতে পায়। বেডরুমের সাথেই হলরুম। প্রায় নিঃশব্দে হলরুমের দরজা খুলেছে কেউ।

কিন্তু কুয়াশাকে দেখে মনে হলো না সে ব্যাপারটা জানতে পেরেছে আলখেল্লার পকেট থেকে একটা হাত বেরিয়ে এল তার। পা বাড়াল অপর একটি দরজার দিকে, যেন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে সে। তার হাতে ছোট্ট একটা কাঁচের বল দেখা যাচ্ছে।

হলরুমে যাবার দরজাটা খোলাই রয়েছে। বেডরুম থেকে করিডরে বেরুবার দরজার কাছে গিয়ে বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুঁড়ে মারল কুয়াশা কাঁচের বলটা হলরুমের দিকে।

হলরুমের মাঝখানে গিয়ে পড়ল ওটা। দুপ্ করে শব্দ উঠল ফাটার। সাদা ধোঁয়ায় ভরে গেল হলরুম। একজন লোকের আঁৎকে ওঠার শব্দ পাওয়া গেল পরমুহূর্তে শব্দ হলো—ধুপ্! কেউ যেন পড়ে গেল হলরুমের মেঝেতে।

দম বন্ধ করে হলরুমে প্রবেশ করল কুয়াশা। সাদা ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে মেঝেতে একজন প্রায় প্রৌঢ় লোক লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। জ্ঞান হারিয়েছে সে বিষাক্ত গ্যাসে। লোকটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এল কুয়াশা। শুইয়ে দিল একটা বিছানায়। তারপর হলরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে এসে বসল একটি চেয়ারে।

টেবিলের উপর থেকে চুরুটের প্যাকেট টেনে নিয়ে সুদীর্ঘ, সুগন্ধী একটা চুরুট ধরাল কুয়াশা। একমুখ নীলচে ধোঁয়া ছেড়ে চেয়ে রইল সে অচেতন লোকটার দিকে। বেশ লম্বা দেহের অধিকারী। পোশাক আশাক দেখে শিক্ষিত এবং ভদ্র মনে হয়। কয়েক মিনিট পরই চোখ পিট পিট করে তাকাল লোকটা। কথা বলে উঠল সহজ, সরল ভঙ্গিতে, 'আপনি সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন—সেজন্যে আপনাকে দোষ দেয়া যায় না, মি. কুয়াশা। কিন্তু আমি নিতান্ত নিরীহ একজন মানুষ।'

কুয়াশা কথা বলল না।

লোকটা সুন্দর কথা বলতে জানে। ভঙ্গিটা মার্জিত। আবার বলল, 'আমি বরং সব কথা খুলেই বলি।'

কুয়াশা মৃদু হাসল। বলল, 'বলুন।'

'আমার নাম শফিকুল কবীর। প্রফেসর। কেমিস্ট্রি পড়াই।'

শফিকুল কবীর বিছানার উপর উঠে বসল। কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বের করে আনল কালো রঙের বড়সড় একটা পাইপ। পাইপের সামনের অংশটা, যেখানে টোবাকো ভরা হয়, সেটা একটা কফি কাপের মত বড়সড়।

আবার কথা বলতে শুরু করল সে, 'কাগজে আমাদের সেনাদের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর পড়েছি আমি। তারপর শুনলাম, আপনি এই রহস্যময় কেস সমাধান করার দায়িত্ব নিয়েছেন। এ ব্যাপারে আপনাকে একটা তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারব আমি। সেজন্যেই এসেছি।'

'বলে যান,' শান্ত গলায় বলল কুয়াশা।

আচমকা নিচু হয়ে গেল শফিকুল কবীরের কণ্ঠস্বর। প্রায় চাপা কণ্ঠে কথা বলতে শুরু করল সে, 'এই হত্যাকাণ্ড এবং যাবতীয় রহস্যের পিছনে একজন লোক দায়ী। তাকে আমি চিনি। তার নাম সাইদ চৌধুরী। ভয়ঙ্কর লোক···।'

'তার মেয়ে বা বোন আছে কেউ সাইদা শরমিন নামে?'

'মেয়ে। দেখা হয়েছে আপনার সাথে তার? ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছেন তার নাম? জানেন, ওই মেয়েটাও বাপের মত একনম্বরের শয়তান···।'

কুয়াশা বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'সাইদ চৌধুরী সম্পর্কে বলুন।'

শফিকুল কবীর পকেট থেকে বের করল তামাকের কৌটো। কৌটো খুলে তামাক ভরতে শুরু করল সে পাইপে। হাত দুটো কাঁপছে মৃদু মৃদু।

'সাইদ চৌধুরী একটা ম্যানিয়াক। কিন্তু সায়েন্টিফিক ম্যানিয়াক। কেমিস্ট্রিতে জিনিয়াস সে। বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আলোচনার জন্যে প্রায়ই সে আমার কাছে আসত। কিছুদিন আগে, কথায় কথায় সে আমাকে জানায় যে সর্বকালের বিস্ময়কর একটা যুদ্ধাস্ত্র আবিষ্কার করেছে। সে আরও বলে তার ধারণা বাংলাদেশ সরকার তাকে এই অস্ত্রের জন্য ন্যায্য দাম দিতে সম্মত হবেন না। কারণ অস্ত্রটার মূল্য হবে কয়েক হাজার কোটি টাকা। ন্যায্য দাম যে দেবে তার কাছেই অস্ত্রটা বিক্রি করতে প্রস্তুত আছে সে—আমাকে জানায়।'

শফিকুল কবীর থামল। দাঁত দিয়ে পাইপটা চেপে ধরল। চোখ দুটো কি এক প্রত্যাশায় চকচক করে উঠল তার।

'আমি তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছি, কাজটা ভাল হবে না। বাংলাদেশ সরকারের হাতে তুলে দেয়া উচিত তার আবিষ্কৃত অস্ত্রটা। কিন্তু ভয়ানক চটে যায় সে আমার কথা শুনে, গালাগাল করে অকথ্য ভাষায়। তারপর···তারপর সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। প্রুভিং গ্রাউণ্ডের মর্মান্তিক ঘটনাটা ঘটার পর আমি তার খোঁজ নেবার চেষ্টা করি। খবর পাই, চট্টগ্রামের দিকে নাকি আছে সে। ভাবলাম, কথাগুলো আপনাকে জানানো দরকার।'

থামল শফিকুল কবীর।

কুয়াশা উঠল চেয়ার ছেড়ে। পরমুহূর্তে, প্রায় সাথে সাথে, বসে পড়ল আবার।

বিন্দু বিন্দু লাল, নীল আলো বেডরুমের সর্বত্র ভেসে বেড়াতে শুরু করেছে। কুয়াশার শরীরেও লাগছে, কিন্তু পুড়ছে না কিছু।

কুয়াশার শরীরটা মোচড় খেতে শুরু করল।

শরীরটা শক্ত পাথরের মত হয়ে গেছে শফিকুল কবীরের। দম বন্ধ করে আছে সে। দাঁত দিয়ে সজোরে কামড়ে ধরেছে সে তার পাইপটা।

কুয়াশার হাত দুটো নিজের গলার কাছে উঠে গেল। যেন নিজের গলাটা চেপে ধরতে চাইছে সে।

'তুমি···তুমি···।'

কথা শেষ করতে পারল না কুয়াশা। স্থির হয়ে গেল তার দেহ। তারপর চেয়ার থেকে সশব্দে মেঝেতে পড়ে গেল নিঃসাড় দেহটা।

ভীষণ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল শফিকুল কবীরকে। দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে উঠল সে। তাড়াহুড়ো করে নামল বিছানা থেকে। ছুটে চলে এল কুয়াশার নিঃসাড় দেহের কাছে। এক হাত দিয়ে পাল্‌স্ দেখল। অপর হাতটা নাকের কাছে নিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস আছে কিনা বুঝবার চেষ্টা করল।

মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল শফিকুল কবীরের মুখ। কুয়াশার আলখেল্লা খুলে ফেলল, টান মেরে ছিঁড়ে ফেলল ভিতরের শার্ট এবং গেঞ্জি। তারপর ব্যস্ত হাতে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়ে কয়েক মিনিট পরই বেরিয়ে পড়ল রুম ছেড়ে বাইরে।

কুয়াশার নিঃসাড় দেহটা পড়ে রইল মেঝেতে তেমনিভাবে।

দেওজী কাংকারিয়া খবরের কাগজ পড়ছিল। বড় বড় হেডিং-এর প্রধান খবরটা এই রকম:

'কুয়াশার সহকারীরা রহস্যময় মৃত্যুর মুখোমুখি।
অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা
এয়ারপোর্ট মেকানিকের চোখে ধরা পড়েছে
রহস্যময় আলোক বিন্দু

দ্বিতীয় প্রধান খবরের হেডিংও বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে:

গোটা দেশ আতঙ্কিত
দূর থেকে লাঙস্ প্যারালাইজিং মেশিন ব্যবহার
করা হয়েছে—
যোয়ানদের হত্যাকাণ্ড রহস্য সম্পর্কে
বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

প্রথম খবরটায় বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্লেন ক্র্যাশের ঘটনাটা। কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা শত্রুদের বিরুদ্ধে কঠোরতম হুঁশিয়ারী উচ্চারণ

করেছেন। একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন—এসব বাংলাদেশের শত্রুদের ষড়যন্ত্র, নাশকতামূলক পরিকল্পনার অঙ্গ।

খবরটা পড়তে পড়তে মুচকি হাসল দেওজী কাংকারিয়া।

দ্বিতীয় খবরের উপসংহারে বলা হয়েছে—কুয়াশা আর্মি ইন্টেলিজেন্স এবং সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের সাথে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। আশা করা যায় অচিরেই সে এই রহস্যের সমাধান করে ফেলতে পারবে।

'কচু করবে।'

মুখ ভেংচে বলে উঠল দেওজী, 'দাঁড়াও না বাছাধনেরা, দেখাচ্ছি মজা। যখন শুনবে যে স্বয়ং তোমাদের কুয়াশাই খতম হয়ে গেছে···।'

হঠাৎ সান্তারাম উল্কার দিকে তাকিয়েই থেমে গেল দেওজী। কি যেন অনুভব করার চেষ্টা করছে সান্তারাম।

দেখা গেল, দেওজীও একই সাথে কি যেন অনুভব করার চেষ্টা করছে।

'শয়তান কুয়াশা···আবার···মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়েছে···।'

মনে হচ্ছে, কোথাও থেকে মেসেজ পাচ্ছে দেওজী এবং সান্তারাম। কিন্তু কোথা থেকে পাচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে না।

দেওজী বলে উঠল, 'বোমা···ঠিকই ফেটেছিল··· কিন্তু···কিভাবে···কে···জানে কুয়াশা··· বেঁচে···যায়··· তার···কোন···ক্ষতিই হয়নি···তার···দু'জন···সহকারী অনুসরণ···করছে···উপায়··· কি···জানান···।'

'কী সাংঘাতিক!'

দেওজী তাকাল খ্যাপা দৃষ্টিতে সান্তারামের দিকে, 'আশ্চর্য ঘটনা। এতগুলো লোককে লাগালাম, কেউ তারা পারল না কুয়াশাকে খতম করতে! ওদেরকে আমি জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।'

সান্তারাম বলল, 'এদিকে আমাদের চুক্তিটা এখনও ফাইনাল হলো না।'

দেওজী চুরুট ধরিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুলে কথা বলতে শুরু করল দেওজী। চোখ দুটো অবিশ্বাসে বড় বড় হয়ে উঠল তার।

রিসিভার নামিয়ে রাখল সে খানিক পর। সান্তারামের দিকে ফিরে দাঁড়াল বিদ্যুৎবেগে। বলল, 'নতুন বিপদ দেখছি! একজন অজ্ঞাত লোক ফোন করেছিল। সে দাবি করছে সে নাকি হোটেলে ছিল। আমাদের বোমায় কুয়াশা মারা যায়নি, কিন্তু অন্যভাবে নাকি মারা গেছে সে।'

'হোয়াট! দ্যাটস ইম্পসিবল! কুয়াশাকে আমরা ছাড়া আর কে মারতে পারে!'

নার্ভাস দেখাচ্ছে দেওজী কাংকারিয়াকে, 'আমার ধারণা অন্যরকম। কেউ বা কোন দল আমাদের সম্পর্কে অনেক বেশি জেনে ফেলেছে। তারা সম্ভবত আমাদের কাছ থেকে অস্ত্রটা ব্ল্যাকমেইল করে হাতাতে চায়। মোট কথা, বিপদের গন্ধ পাচ্ছি আমি। যা করার দ্রুত করতে হবে আমাদের। পরবর্তী অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করা আছে তো, সান্তারাম?'

'সব ঠিক আছে। ওটার পরই আমরা হাত-পা ঝেড়ে-মুছে কেটে পড়তে পারব। কিন্তু এদিকে যে আমাদের লোককে কুয়াশার দু'জন সহকারী অনুসরণ করে আসছে, তার কি হবে? বরং আমিই যাই, ঝামেলা চিরকালের জন্য চুকিয়ে দিয়ে আসি—।'

সান্তারাম টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ড্রয়ার খুলে ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিল সে ভিতরে।

এবার ড্রয়ারের ভিতর অনেকক্ষণ রইল হাতটা।

রাজকুমারী বা কামাল জানতে পারল না ওদের জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছে। অ্যাশ কালারের একটি ফোক্সওয়াগেনকে ট্যাক্সি নিয়ে অনুসরণ করছে ওরা। ড্রাগ স্টোর থেকে বেরিয়ে শত্রুপক্ষের লোকটা সোজা গিয়ে চড়ে ফোক্সওয়াগেনে। তার হাবভাব বা গাড়ি চালাবার ভঙ্গি দেখে মনে হয় ওদেরকে সে সন্দেহ করেনি।

দ্রুত শহরের বাইরে চলে গেল ফোক্সওয়াগেন। রাস্তার দু'পাশে জঙ্গল। মাঝখান দিয়ে রাস্তা। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ট্যাক্সি ফোক্সওয়াগেনের পিছু পিছু ছুটছে। ডান দিকে বাঁক নিল একসময় ফোক্সওয়াগেন। আঁকাবাঁকা পথ। গাড়ির গতি এতটুকু কমল না। সোজা দুইশো গজের মত গিয়ে আবার বাঁক নিল। বাঁকের মাথায় ছোট্ট একটা সাইনবোর্ড, 'প্রাইভেট রোড।'

ট্যাক্সি থেকে নামল রাজকুমারী এবং কামাল ওই বাঁকের কাছেই। ফোক্সওয়াগেনটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে রাজকুমারী ড্রাইভারকে বলল, 'তুমি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করো এখানে। বখশিশ পাবে।'

'ঠিক আছে, মেম সাহেব।'

প্রাইভেট রোডটা বেশ প্রশস্ত এবং ইঁট বিছানো। সোজা খানিকদূর চলে গেছে, শেষ মাথায় দেখা যাচ্ছে একটা গেট। গেটটা বন্ধ। বাড়িটা কোন ধনী এবং সৌখিন লোকের বাগান বাড়ি বলে মনে হয়। বাড়িটার চারদিকে ঝোপ-ঝাড়, উঁচু উঁচু গাছপালা।

গেটের দিকে সোজা না এগিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে বাড়িটাকে ঘিরে পিছন দিকে পৌঁছুল ওরা। কোথাও কেউ নেই।

পাঁচিল টপকাল ওরা। বাড়ির পিছন দিকটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার মত। গাছপালা আর ঝোপ-ঝাড় চারদিকে। উঁচু বারান্দায় উঠে ওরা দেখল একটি দরজা খোলা রয়েছে।

পাহারায় কেউ নেই দেখে বেশ একটু অবাকই হলো ওরা।

কামাল নিচু গলায় বলে উঠল, 'বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই মনে করে সাবধানতা অবলম্বন করার কথা ভাবেইনি ব্যাটারা।'

ছোট্ট একটা কামরার ভিতর প্রবেশ করল রাজকুমারী। পিছন পিছন কামাল। কেউ নেই কামরায়। আশপাশের কামরাতেও সম্ভবত কেউ নেই। কোনদিক থেকে কোন শব্দ আসছে না।

'ওরা কথা বলছে।'

'তার মানে!' কামাল অবাক হলো।

রাজকুমারী বলল, 'তুমি শুনতে পাচ্ছ না, তোমার শুনতে পাবার কথাও নয় কিন্তু আমি পাচ্ছি। বাড়ির সামনের দিকের কোথাও লোক আছে। কি বলছে বুঝতে পারছি না, তবে বলছে শুনতে পাচ্ছি। হয়তো টেলিফোনে কথা বলছে কেউ।'

একটার পর একটা খালি কামরা পেরিয়ে বাড়ির সামনের দিকে এগোতে লাগল ওরা।

সর্বশেষ কামরার ভিতর ঢুকে ওরা দেখল একজন লোককে। টেলিফোন ক্রেডলে রেখে দিচ্ছে তখন সে।

রাজকুমারী কামরার ভিতর ঢুকে পড়ল নিঃশব্দ পায়ে। ওর সাথে কামালও।

কথা বলল আগে কামালই, 'মাথার ওপর হাত তুলে ঘুরে দাঁড়াও, বাছাধন!'

ঠিক সেই সময় কামরার চারটে দরজা দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল একদল ভয়ঙ্কর চেহারার লোক।

উৎকট উল্লাসে তারা গলা ছেড়ে হাসছে।

গর্জে উঠল কামাল বাঘের মত। পরমুহূর্তে উল্কার গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে শত্রুদলের উপর।

রাজকুমারীকে অস্বাভাবিক শান্ত দেখাচ্ছে। দ্রুত কাজ করেছে তার মাথা। সংখ্যায় দশ বারোজন হবে শত্রুরা। এদের সবাইকে একই সময়ে কাবু করার মত অস্ত্র তার কাছে আছে। পৃথিবীর নয়, অন্য এক গ্রহের মানুষ সে। সে গ্রহের জ্ঞান-বিজ্ঞান পৃথিবীর তুলনায় অনেক দিক থেকে অনেক বেশি উন্নত। দেখতে হুবহু পৃথিবীর মানুষের মত হলেও আনতারার মানুষের শরীরে অনেক রহস্যময় রাসায়নিক পদার্থ আছে যার ফলে সেখানকার মানুষ অনেক বেশি বুদ্ধিমান, অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী। রাজকুমারী ওমেনার শরীর থেকে সাবসোনিক র‍্যাডিয়েশন বের হয়। জিনিসটা একধরনের অদৃশ্য বিদ্যুতের মত। এই বিদ্যুতের প্রভাব রাজকুমারীর দেহের চারদিকে দু'আড়াই হাত পর্যন্ত কার্যকরী। এর সীমানার মধ্যে এলেই প্রচণ্ড শক খায় লোকে এবং সাথে সাথে প্যারালাইজড হয়ে যায় সে। অন্তত আধঘণ্টার জন্য হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অচল।

কিন্তু সাবসোনিক র‍্যাডিয়েশন ইচ্ছা করলেই ব্যবহার করা যায় না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একবার মাত্র এই অস্ত্র ব্যবহার করা সম্ভব। সাবসোনিক র‍্যাডিয়েশন শরীরের চারদিকে ছড়াবার আগে দরকার হয় গভীর মনোনিবেশ, আত্মসম্মোহন।

কিন্তু সে সময় কোথায়!

রাজকুমারী কাঠবিড়ালির মত লাফ দিয়ে একটা টেবিলের উপর উঠে দাঁড়াল। কামরার দৃশ্যটা, কে কোথায় আছে, ভাল করে দেখে নিল পলকের মধ্যে। তারপর লাফ দিল তিনজন যণ্ডামার্কা শত্রুকে লক্ষ্য করে।

লাফ দেবার সাথে সাথে রাজকুমারীর মাথার হ্যাটটা খুলে পড়ে গেল। কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল দেখা গেল তার। শত্রুরা সবাই বিস্মিত। মুহূর্তের জন্য তারা বিমূঢ়

হয়ে পড়ল। রাজকুমারী সদ্ব্যবহার করল সেই সুযোগের।

রাজকুমারীর হাত ও পায়ের ধাক্কা খেয়ে তিনজনই পড়ে গেল মেঝেতে। একজনের মাথা সজোরে ঠুকে গেল দেয়ালের সাথে। অপর দু'জন সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল। দেখা গেল তাদের দু'জনের হাতেই রিভলভার রয়েছে।

দাঁত বের করে হিংস্র হাসিতে ফেটে পড়ল লোক দু'জন। দু'জন দু'দিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে এক পা এক পা করে রাজকুমারীর দিকে।

এদিকে কামাল প্রথম আক্রমণ করায় দু'জন শত্রুকে কাবু করে ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু পিছন থেকে তাকে জড়িয়ে ধরেছে আরও কয়েকজন। কামালের লাথি এবং ঘুসি খেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে দু'জন। সামনের আরও দু'জনকে আক্রমণ করতে যাবার আগেই সে আক্রান্ত হয়েছে পিছন থেকে।

মেঝেতে শুইয়ে ফেলল সবাই মিলে তাকে। একজন চেপে বসল তার বুকে। লোকটার হাতে একটা ধারাল ছোরা।

'ধড়টা আলাদা করে দিই গলায় ছোরা চালিয়ে, কি বলিস?'

কামালের বুকে বসে দৈত্যাকার চেহারার লোকটা কাটা ঠোঁটজোড়া কান পর্যন্ত লম্বা করে হাসছে।

নিজেকে মুক্ত করার জন্য হাত-পা ছুঁড়ছে কামাল। কিন্তু হাত দুটো আর পা দুটো তার চেপে ধরে রেখেছে কয়েকজন লোক। আর একজন কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে কামালের পেটের উপর উঠে দাঁড়াল। পেটের উপর দাঁড়িয়ে লাফাতে লাগল সে।

'শালার পেট ফাটিয়ে দেব!'

রাজকুমারীর দিকে দু'দিক থেকে দু'জন রিভলভার হাতে হাসতে হাসতে এগিয়ে আসছিল। কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুৎবেগে লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল সে। সেই সাথে তার ডান হাতটা নড়ে উঠল। কামালের পেটের উপর যে লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাফাচ্ছিল তার নাকে গিয়ে লাগল ওমেনার ডান হাতের ঘুসি।

ভেঙে গেল নাকটা। নাক চেপে ধরে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে শুরু করল সে। টলতে টলতে নামল মেঝেতে। হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে তাজা রক্ত বেরিয়ে আসছে।

রাজকুমারীর এতসব লক্ষ করার সময় নেই। ঘুসি মেরে নাক ভেঙে দিয়েই পা চালাল ও। কামালের বুকে বসা লোকটা পাঁজরে সবুট লাথি খেয়ে ফুটবলের মত শূন্য দিয়ে উড়ে গিয়ে ধাক্কা খেল দেয়ালের সাথে। সেখান থেকে পড়ল মেঝেতে।

লাফ দিয়ে সরে গেল শত্রুরা। রাজকুমারীকে ঘিরে ফেলেছে তারা চারদিক থেকে। প্রায় একই সময়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল কামাল।

শত্রুদের মধ্যে কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'হুঁশিয়ার!'

রাজকুমারী এবং কামাল মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা না করে যার যার সামনের শত্রুকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আত্মরক্ষার পন্থা খুঁজছে শত্রুরা। কয়েকজন ভয়াল প্রকৃতির গুণ্ডা ভয় পেয়ে গেছে রাজকুমারীর বেপরোয়া লড়াই দেখে। সবাই চেষ্টা করছে তার আওতা

থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে। গুলি করতে পারছে না তারা দুটো কারণে। এক, গুলি করলে নিজেদের লোক মারা পড়তে পারে। দুই, রাজকুমারী এবং কামালকে হত্যা করার নির্দেশ এখনও পায়নি তারা।

হিংস্র, খুনী পশুগুলো চিৎকার করছে অবিরাম।

'ঝাঁপিয়ে পড় শালারা সবাই একসাথে!'

'ছি! একটা মেয়েমানুষ এমন নাকানিচোবানি খাওয়াবে শেষ পর্যন্ত!'

রাজকুমারীর শরীরটা বিদ্যুতের মত ছুটোছুটি করছে কামরার চারদিকে। সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই ঘুসি মেরে, লাথি মেরে আক্রমণ করছে। কিন্তু শত্রুরা কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছে প্রতিটি আক্রমণ। কামরার ভিতর প্রাণপণে দৌড়োদৌড়ি করছে সবাই।

তারপর সবাই একসাথে হঠাৎ রুখে দাঁড়াল।

এই বিপদটার জন্য তৈরি ছিল না ওরা। শত্রুদের ছুটোছুটি দিখে মনে হচ্ছিল ভয়েই অমন করছে তারা। রাজকুমারী বা কামাল কেউই বুঝতে পারেনি, ওদেরকে কাবু করার এটা একটা কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়।

কামরার সবগুলো শত্রু গর্জে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের উপর। চারদিক থেকে ঘুসি এবং লাথি পড়ছে। একজন দুই লোমশ হাত দিয়ে চেপে ধরেছে রাজকুমারীর গলা। আর একজন তার লম্বা চুল ধরে ঝুলে পড়েছে পিছন দিকে।

কামালের অবস্থা আরও শোচনীয়। তাকে ধরাশায়ী করে ফেলেছে শত্রুরা ইতিমধ্যে। এলোপাতাড়ি ঘুসি খাচ্ছে সে নাকে মুখে।

জ্ঞান হারাল কামাল আগে।

রাজকুমারীর শক্তি তখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। শত্রুরা সবাই মিলেও তাকে কাবু করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিল।

এমনি সময়ে লোহার রড দিয়ে ওমেনার মাথার মাঝখানে বাড়ি মারা হলো।

রাজকুমারী ওমেনা পরাজয় স্বীকার করল অবশেষে।

অচেতন হয়ে পড়ল সে।

আট

লাল নীল আলোক বিন্দু দেখেই বিপদ টের পেয়ে গিয়েছিল কুয়াশা। দম বন্ধ করে থাকলে বিপদ স্পর্শ করতে পারবে না বুঝতে পেরেছিল সে। নিজস্ব পদ্ধতিতে নিয়মিত ব্যায়াম করে বলে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশিক্ষণ নিঃশ্বাস না ফেলে থাকতে পারে সে।

শফিকুল কবীর চলে যাবার কিছু পরই উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বুক ভরে তাজা বাতাস গ্রহণ করল। তারপর হাত দিল আলখেল্লার গোপন পকেটে। পকেট পরীক্ষা করে দেখে সে বুঝতে পারল শফিকুল কবীর কি কি জিনিস নিয়ে গেছে।

তখুনি হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি নিল সে। শফিকুল কবীর যখন

তার বুকের উপর ঝুঁকে পড়েছিল তখন কুয়াশা। একটা ইস্পাতের মার্বেলের মত দেখতে ব্যাটারিযুক্ত রেডিও ডিরেকশন ফাইণ্ডার তার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল চুপিসারে। জিনিসটা অবিরাম শব্দহীন সঙ্কেত ট্র্যান্সমিট করতে পারে। সেই সঙ্কেত ধরা পড়ে কুয়াশার হাতঘড়ির মত দেখতে রিসিভিং সেটে।

বাংলাদেশ বিমানের মতিঝিল অফিসের সামনে পৌঁছুল ট্যাক্সি। সাথে সাথে নয়, কিছুক্ষণ পর ট্যাক্সি থেকে নামল কুয়াশা। ছদ্মবেশ নিয়েছে সে এতক্ষণ ধরে। এখন আর তাকে চেনার কোন উপায়ই নেই। ময়লা পোশাক পরা ভবঘুরে যুবকের মত দেখাচ্ছে তাকে। মাথার চুল বিশৃংখল, গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কাঁধের সাহিত্যিক ব্যাগটা ছেঁড়া।

কুয়াশা শফিকুল কবীরকে দেখতে পেল টিকেট কাউন্টারের সামনে। পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। কুয়াশাকে চিনতে পারল না শফিকুল কবীর। কুয়াশা দেখল, শফিকুল কবীর চট্টগ্রামে যাবার জন্য একটা টিকেট কিনল। একঘণ্টা পর ছাড়বে প্লেন। ভাগ্য ভাল, কুয়াশাও একটা ওই একই ফ্লাইটের টিকেট পেয়ে গেল। আবহাওয়ার অবস্থা খারাপ, তাই কয়েকজন প্যাসেঞ্জার বুকিং ক্যানসেল করেছে।

কুয়াশাকে অনুসরণ করে দু'জন সরকারী গোয়েন্দা অফিসে ঢুকেছিল। কুয়াশা তাদের দিকে এগিয়ে গেল।

কাছে গিয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। কথা বলল নিচু স্বরে। পকেট থেকে বের করে দিল সদ্য কেনা টিকেটটা। সেই টিকেট নিয়ে ছুটল একজন গোয়েন্দা এয়ারপোর্টের দিকে।

এক ঘণ্টা পরই চট্টগ্রামের উদ্দেশে আকাশে ডানা মেলে রওনা হলো প্লেন। অন্যান্য যাত্রিদের সাথে শফিকুল কবীর ও একজন সরকারী গোয়েন্দাও রয়েছে সেই প্লেনে।

হোটেলে কুয়াশার উপর আক্রমণ হয়েছে এ খবর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে পৌঁছুবার সাথে সাথে অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য সেক্রেটারি আরও চারজন সরকারী গোয়েন্দাকে পাঠিয়ে দিলেন কুয়াশার নিরাপত্তার দিকে শ্যেন দৃষ্টি রাখার জন্য। চারজন গোয়েন্দা কুয়াশাকে আবিষ্কার করল মোখলেসুর রহমানের অফিস বিল্ডিংয়ের সামনে। কুয়াশা বিল্ডিংয়ের ভিতর প্রবেশ করছে তখন।

সাততলায় উঠে মোখলেসুর রহমানের অফিসে ঢুকল সে নিঃশব্দে। অফিস রুমটা পরীক্ষা করে দেখতে চায় সে।

টেবিলের উপর তখনও পড়ে রয়েছে বড় আকারের একটা রাইটিং প্যাড। প্যাডের উপরের কাগজটা না ছুঁয়ে ঝুঁকে পড়ে কিছুক্ষণ ধরে দেখল কুয়াশা। পকেট থেকে বের করল একটা কৌটা। কৌটার পাউডার কাগজটার উপর ছড়িয়ে দিল। তারপর ছেড়ে দিল সিলিং ফ্যানটা।

বাতাসে উড়ে গেল পাউডার। কিন্তু কাগজটার গা যেখানে যেখানে ছড়ে বা গর্ত হয়ে গেছে সেখানে লেগেই রইল পাউডার।

মোখলেসুর রহমান নিহত হবার কয়েক মুহূর্ত পূর্বে এই টেবিলে বসে কাজ

করেছেন। বড় বড় অক্ষর লিখেছেন তিনি লম্বা লম্বা লাইনে সাজিয়ে। বাতাসে উড়ে যাবার পর অবশিষ্ট পাউডার দেখে কয়েকটা লাইন পড়তে সক্ষম হলো কুয়াশা।

লাইনগুলো এই রকম:

QPWDZ BRHYZ BBOPD WICGH
WGBUF QXPUM WBEIE CHAUK
EBRQS LTGJP RINDU LYLMF
QETYM FINDP BDTCZ VPTQD
BMSSS

এর নিচে দুটি শব্দ: "Death today."

আরও কিছু অক্ষর এবং শব্দ পাওয়া গেল। কুয়াশা বুঝতে পারল Death এবং today শব্দ দুটোকে মোখলেসুর রহমান সাইফার কোড-এর কী ওয়ার্ড হিসেবে ধরে নিয়ে মেসেজটার অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন। টাইপ দেখে সন্দেহ রইল না। এটা জটিল Beuford সাইফার কোড। তবে কী-ওয়ার্ড জানা থাকলে সহজই বটে অর্থ বের করা। না জানা থাকলে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগবে।

মোখলেসুর রহমান 'Death' শব্দটিকে কী ওয়ার্ড ধরে নিয়েছিল। তাই, সে প্রথমে লেখে Death, তারপর শুরু করে ইংরেজি বর্ণমালার বাকি অক্ষরগুলো লিখে সাজাতে। এভাবে ছাব্বিশটি অক্ষরের চতুষ্কোণ একটি ছক তৈরি করে সে।

ছকটি এই রকম:

DEATHBCFGIJKLMNOPQRSUVWXYZ
EATHBCFGIJKLMNOPQRSUVWXYZD
ATHBCFGIJKLMNOPQRSUVWXYZDE
THBCFGIJKLMNOPQRSUVWXYZDEA
HBCFGIJKLMNOPQRSUVWXYZDEAT
BCFGIJKLMNOPQRSUVWXYZDEATH
CFGIJKLMNOPQRSUVWXYZDEATHB
FGIJKLMNOPQRSUVWXYZDEATHBC
GIJKLMNOPQRSUVWXYZDEATHBCF
IJKLMNOPQRSUVWXYZDEATHBCFG
JKLMNOPQRSUVWXYZDEATHBCFGI
KLMNOPQRSUVWXYZDEATHBCFGIJ
LMNOPQRSUVWXYZDEATHBCFGIJK
MNOPQRSUVWXYZDEATHBCFGIJKL
NOPQRSUVWXYZDEATHBCFGIJKLM
OPQRSUVWXYZDEATHBCFGIJKLMN
PQRSUVWXYZDEATHBCFGIJKLMNO
QRSUVWXYZDEATHBCFGIJKLMNOP
RSUVWXYZDEATHBCFGIJKLMNOPQ

SUVWXYZDEATHBCFGIJKLMNOPQR
UVWXYZDEATHBCFGIJKLMNOPQRS
VWXYZDEATHBCFGIJKLMNOPQRSU
WXYZDEATHBCFGIJKLMNOPQRSUV
XYZDEATHBCFGIJKLMNOPQRSUVW
YZDEATHBCFGIJKLMNOPQRSUVWX
ZDEATHBCFGIJKLMNOPQRSUVWXY

দ্বিতীয় শব্দ "to day" মেসেজের কী ওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তী পদক্ষেপটা সহজ। মেসেজের উপর এইভাবে সাজানো হয়েছে:

TODAY	TODAY	TODAY	TODAY
QPWCZ	BRHYZ	BBOPD	WICGH
TODAY	TODAY	TODAY	TODAY
WPBUF	QXPUM	WBBIE	CHAUK
TODAY	TODAY	TODAY	TODAY
EBRQS	LTGIP	RINDU	LYLMF
TODAY	TODAY	TODAY	TODAY
ONTYM	FINDP	BDTCZ	VPTQD
TODAY			
BMSSS			

কোড বর্ণমালার সবচেয়ে উপরের সারির T অক্ষরটি খুঁজে নিয়ে কুয়াশা নিচের দিকে নামতে লাগল যতক্ষণ না সে 'Q' অক্ষরটিকে পেল, তারপর সেই লাইনের সর্বশেষ অক্ষরটি দেখল।

এরপর সবচেয়ে উপরের সারির 'O' অক্ষরটি খুঁজে নিয়ে কুয়াশা নেমে এল নিচের দিকে সোজা যতক্ষণ না 'P' অক্ষরটিকে পেল, তারপর সেই লাইনের সর্বশেষ অক্ষরটি দেখল।

দ্রুত কাজ করে চলল কুয়াশা। মেসেজটা উদ্ধার করতে খুব বেশি সময় লাগল না তার।

মেসেজটার বিশৃংখল চেহারা দাঁড়াল এই রকম:

'Newde athwe apona succe ssbri ngpro spect toarm yprov inggr oundw illki lltwo hundr edthe reto day,'

সাজাবার পর অর্থ দাঁড়াল:

'New death weapon a success bring prospect to army proving ground will kill two hundred there to day.'

অশুদ্ধ ইংরেজি বাক্যটির বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায় মূল অর্থ:

নতুন মৃত্যুবাণ সফল হয়েছে। আর্মি প্রুভিং গ্রাউণ্ডে সম্ভাব্য ক্রেতাকে নিয়ে এসো। সেখানে দুইশত মানুষ মরবে আজ।

এবং সত্যি সত্যি তাই ঘটেছে। শত্রুদের ব্যাপকভিত্তিক পরীক্ষা সফল হয়েছে।

একশো তেরানব্বই জন জোয়ান নিহত হয়েছে প্রুভিং গ্রাউণ্ডে।

প্রাইভেট অফিস ছেড়ে পাশের রুমে চলে এল কুয়াশা। শহীদ এই রুমে ফিট করে রেখে গেছে ক্যামেরাটা। কিন্তু কোথায় তা কুয়াশা জানে না।

খুঁজে বের করতে দেরি হলো না কুয়াশার। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, প্রাইভেট অফিস রুমটাকে ডার্করুমে রূপান্তরিত করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। ওয়াশ বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ করতে লাগল কুয়াশা।

আলোর সামনে ফিরে এসে দাঁড়াল সে খানিক পরই। তার হাতে দেখা যাচ্ছে ডেভেলভড্ মোশন-পিকচার ফিল্ম রোল। শহীদের লুকানো ক্যামেরা থেকে এই রোলটা পেয়েছে কুয়াশা।

ফিল্মটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে শুরু করেছে কুয়াশা, এমন সময় নিচ থেকে ভেসে এল পিস্তলের শব্দ।

কুয়াশাকে অনুসরণ করে কয়েকজন লোক বিল্ডিংয়ের নিচ তলা অবধি এসেছিল। বিল্ডিংয়ের ভিতর প্রবেশ করেনি তারা। কিন্তু কুয়াশা বিল্ডিং থেকে বের হতে দেরি করছে দেখে তারা অধৈর্য হয়ে উঠল।

বিল্ডিংয়ের ভিতর প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিল তারা। বিল্ডিংয়ের পিছন দিক দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছিল তারা। গোয়েন্দারা তাদেরকে দেখে চ্যালেঞ্জ করে, সাথে সাথে গুলিবর্ষণ শুরু করে শত্রুপক্ষ।

একজন গোয়েন্দা আহত হয়ে পড়ে যেতে বাকি তিনজন শেল্টার নিয়ে শুরু করল গুলিবর্ষণ।

সিঁড়ির ধাপে লুকোবার জায়গা নেই। শত্রুপক্ষ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য। খণ্ডযুদ্ধটা গোয়েন্দাদের অনুকূলেই যাচ্ছিল; এমন সময় রাস্তা থেকে বিল্ডিংয়ের ভিতর প্রবেশ করল তিনজন ষণ্ডামার্কা লোক। প্রত্যেকের হাতে রয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তেই ঢুকল তারা।

তাদের একজনের হাতে একটা স্টেনগান। অবিরাম গর্জাচ্ছে সেটা। ঝাঁক ঝাঁক তপ্ত সীসার বুলেট বৃষ্টির মত ছুটে আসছে মুষলধারে।

গোয়েন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। মৃত্যু যে অবধারিত বুঝতে বাকি রইল না তাদের। ডানদিকে সরে যেতে শুরু করল তারা, ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়তে লাগল।

স্টেনগানধারী শত্রু গোয়েন্দাদেরকে ঠেকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে নিচেই রয়ে গেল। বাকিরা সবাই সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে শুরু করল। কুয়াশাকে গুলি করে মেরে ফেলার জন্যই এসেছে তারা।

সিঁড়ির মাথায় হঠাৎ দেখা গেল কুয়াশাকে।

শত্রুপক্ষ যেন প্রস্তুতই ছিল। কুয়াশাকে দেখার সাথে সাথে গর্জে উঠল তাদের হাতের পিস্তল।

চার পাঁচটা বুলেট ছুটে গিয়ে লাগল কুয়াশার বুকে। পরিষ্কার শব্দ হলো বুলেট

বিদ্ধ হবার।

কিন্তু কুয়াশা সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল সিঁড়ির মাথায়। চার-পাঁচটা বুলেট বুকে গ্রহণ করেও তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শত্রুদলের অনুচরেরা বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াল। এমন সময় বেরিয়ে এল পকেট থেকে কুয়াশার ডান হাত। অদ্ভুত দর্শন একটা রিভলভার দেখা গেল তার হাতে। সেটা তুলেই গুলি করল সে।

চারজন শত্রু লুটিয়ে পড়ল সিঁড়ির উপর। একসাথে ছয়টা করে সিঁড়ির ধাপ টপকে নিচে নেমে গেল কুয়াশা। সিঁড়ির উপর ধরাশায়ী নিঃসাড় শত্রুদের দিকে ভুলেও তাকাল না সে। নিচে নেমে দেখল স্টেনগানধারী লোকটা হাঃ হাঃ করে হাসছে। তার সামনে মাথার উপর দুই হাত তুলে অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সহকারী গোয়েন্দারা।

গুলি করল কুয়াশা। লুটিয়ে পড়ল স্টেনগানধারী।

লোকটার দেহ হাতির মতই বিশাল। প্যান্ট এবং কোট পরা লোকটার কব্জিতে বিরাট একটা রিস্টওয়াচ দেখা যাচ্ছে।

গোয়েন্দারা নতুন জীবন ফিরে পেয়ে আবেগে, কৃতজ্ঞতায় বোবা হয়ে গেছে যেন। কুয়াশা তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'শত্রুরা কেউই মরেনি। ওদেরকে অজ্ঞান করা হয়েছে।'

পকেট থেকে সিরিঞ্জ বের করে একজন গোয়েন্দার হাতে সেটা ধরিয়ে দিয়ে আবার সে বলল, 'প্রত্যেককে ইঞ্জেকশন দিন। জ্ঞান ফিরে আসবে। তার আগে ওদেরকে সার্চ করুন এবং বেঁধে ফেলুন দড়ি দিয়ে।'

শত্রুদলের তিনজনকে চিনতে পারা গেল। পুলিসের খাতায় এরা কুখ্যাত গুণ্ডা হিসেবে চিহ্নিত। তাদের একজনের জ্ঞান ফিরল সবার আগে।

কুয়াশাকে দেখে ভয়ে হাউ মাউ করে কেঁদে ফেলল সে। বলতে লাগল, 'হুজুর পীর-পয়গম্বর! আপনাকে খুন করতে হবে তা আমাকে জানায়নি কেউ···।'

'কে তোমাকে নিয়োগ করেছে? নাম বলো তার।' সরকারী গোয়েন্দা প্রশ্ন করল কঠিন স্বরে।

'ওই যে, ওর নাম তৈয়ব···।'

স্টেনগান নিয়ে যে লোকটা গুলি চালিয়েছিল তার দিকে আঙুল তুলল লোকটা।

সরকারী গোয়েন্দা বলল, 'ওকে আমরা চিনি না, মি.কুয়াশা···!'

ঘাড় ফিরিয়ে সরকারী গোয়েন্দা বোকা বনে গেল। কোথায় কুয়াশা? সকলের অজ্ঞাতে অদৃশ্য হয়ে গেছে সে।

'আশ্চর্য! বাতাসের সাথে মিশে গায়েব হয়ে গেলেন নাকি!'

'আরে! তৈয়ব লোকটার হাতের রিস্টওয়াচটা নেই—গেল কোথায় সেটা? আর কোট,—সেটাও যে দেখছি নেই···।'

যে গোয়েন্দা কুয়াশাকে প্রথম থেকে অনুসরণ করছিল সে বলে উঠল, 'কি আবার হবে! মি. কুয়াশাই সম্ভবত প্রয়োজন মনে করে নিয়ে গেছেন···!'

শহীদ ক্যামেরাটা মোখলেসুর রহমানের অফিস রুমের এমন এক জায়গায় স্থাপন

করেছিল যেখান থেকে বিপরীত দিকের বিল্ডিংয়ের সবকিছু দেখা সম্ভব। মোখলেসুর রহমান এমন কিছু দেখেছিল যা রহস্যময়, যা তার মৃত্যুর জন্য দায়ী—এ কথা প্রথম থেকেই বোঝা গিয়েছিল। সে কথা মনে রেখেই ক্যামেরাটা স্থাপন করেছিল ও। সেনসিটিভ ফিল্মে স্বভাবতই অতি ক্ষুদ্র জিনিসও ধরা পড়বার কথা, যা মানুষ চোখ দিয়ে দেখতে পায় না।

ধরা পড়েওছিল। ফিল্মে কুয়াশা একটা মেসেজ পেয়েছে।

মেসেজটা শত্রুপক্ষের নয়। শহীদের।

ইস্পাতের কারাকক্ষে বন্দী হবার পর ভেন্টিলেটরের উপর হাত তুলে পেন্সিলের বোতাম টিপে অত্যুজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ আলোক রশ্মি নিক্ষেপ করে শহীদ।

সেই আলোক রশ্মির ছবি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। কুয়াশা শহীদের মেসেজ পায়, বুঝতে পারে শহীদকে কোথায় বন্দী করে রাখা হয়েছে।

শহীদকে মুক্ত করতে হবে। পুলিসের সাহায্য চাইলেই পাওয়া যায়। কিন্তু কুয়াশা নিজের পদ্ধতিতে কাজ করতে ভালবাসে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় সে। গোয়েন্দাদের অজ্ঞাতে বিল্ডিংয়ের পিছন দিকে চলে যায়।

গা ঢাকা দিয়ে বিল্ডিংয়ের সামনের দিকে চলে আসে, তারপর প্রবেশ করে রাস্তার বিপরীত দিকের বিল্ডিংয়ে। শহীদ এই বিল্ডিংয়েই বন্দী হয়ে আছে।

নয়

মস্ত পাকা উঠানটা খাঁ খাঁ করছে। কিন্তু উঠানের দিকে না গিয়ে বাগানের গাছপালার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে নিঃশব্দ পায়ে হাঁটতে লাগল কুয়াশা। বিল্ডিংটার ছাদে একজন লোক বিনকিউলার হাতে নিয়ে বসে আছে, লক্ষ্য করেছে সে। মোখলেসুর রহমানের অফিস বিল্ডিংয়ে খানিক আগে যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে গেছে, তার ফলাফল দেখার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে লোকটা, ফলে কুয়াশাকে সে লক্ষই করেনি।

বিল্ডিংয়ের পিছন দিকে চলে এল কুয়াশা। আটতলা থেকে নেমে এসেছে বিল্ডিংয়ের গা বেয়ে কালো মোটা পানির পাইপ। গাছে চড়ার ভঙ্গিতে সেই মোটা পানির পাইপ বেয়ে অবলীলায় উঠে যেতে লাগল কুয়াশা।

ছয়তলায় উঠে কুয়াশা একবার তাকাল নিচের দিকে। সন্দেহ হয়েছে তার।

সন্দেহ সত্যি প্রমাণিত হলো। বাগানের ভিতর দেখা গেল একজন লোককে। লোকটা একটা পিস্তল হাতে চঞ্চল ভাবে এদিক ওদিক হাঁটাহাঁটি করছে, যেন খুঁজছে কাউকে।

কুয়াশার অনুপ্রবেশ প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

লোকটাকে কিছুক্ষণ লক্ষ করল কুয়াশা। হন্যে হয়ে খুঁজছে সে। কিন্তু ভুলেও তাকাচ্ছে না উপর দিকে।

আবার উঠতে শুরু করল কুয়াশা। নিচের দিকে আর তাকালই না। আটতলার ছাদে উঠে পড়ল সে।

ছাদের সামনের দিকে বসে আছে একজন লোক। কুয়াশার দিকে পিছন ফিরে বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করছে সে।

কুয়াশা দৃঢ় অথচ নিঃশব্দ পায়ে তার ঠিক পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটার পাশেই রয়েছে একটি টেলিস্কোপ ফিট করা অটোমেটিক রাইফেল এবং একটি পিস্তল।

মুচকি হেসে কুয়াশা একটা হাত বাড়িয়ে দিল লোকটার ঘাড়ের দিকে। লোহার মত হাত দিয়ে লোকটার ঘাড় চেপে ধরল সে।

লোকটা তীব্র যন্ত্রণায় গোঙাতে শুরু করল।

শক্ত, পাথরের মত হয়ে গেল লোকটার শরীর। নড়াচড়ার শক্তি বলতে এক বিন্দুও নেই তার। সম্পূর্ণ জড় পদার্থের মত দশা হয়েছে তার।

শান্তভাবে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করল কুয়াশা। বোকার মত প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে লাগল লোকটা।

প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো জেনে নিয়ে কুয়াশা ঘাড়ের নার্ভ সেন্টারে আঙুলের চাপ বৃদ্ধি করল একটু। জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল লোকটা।

সিঁড়ি বেয়ে সাততলায় নেমে এল কুয়াশা।

ফাঁকা করিডর। দু'পাশে দরজা। নিঃশব্দ পায়ে একটার পর একটা দরজার পাশ দিয়ে সামনের বাঁকের দিকে এগোচ্ছে সে।

সর্বশেষ দরজাটা পেরোল কুয়াশা। সাথে সাথে নিঃশব্দে খুলে গেল দরজার কবাট দুটো। বেরিয়ে এল একটা পিস্তল ধরা লোমশ কালো হাত। কুয়াশার বিশাল পিঠটা মাত্র এক হাত দূরে পিস্তলের নলের কাছ থেকে।

গর্জে উঠল পিস্তলটা।

কিন্তু কুয়াশা বসে পড়েছে তারও আগে। বিদ্যুৎবেগে ঘুরিয়ে নিয়েছে নিজের দেহটাকে, হাত উঁচু করে বাঘের মত থাবা মেরে ধরে ফেলেছে লোমশ পিস্তল ধরা হাতটা।

ভয়ে চিৎকার করছে লোকটা। কুয়াশা উঠে দাঁড়াল। টেনে বের করে আনল লোকটাকে করিডরে। কাঁপতে কাঁপতে মাথার উপর অপর হাতটা তুলে ধরল লোকটা।

ছেড়ে দিল কুয়াশা তাকে। লোকটার দু'চোখে বিস্ময় ফুঠে উঠল। ডান হাত তুলে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল কুয়াশা লোকটার কানের নিচে। এক ঘুসিতেই জ্ঞান হারাল সে, ছিটকে পড়ে গেল দূরে।

বাঁক নিল কুয়াশা। শান্ত দেখাচ্ছে তাকে। মহীরূহের মত প্রকাণ্ড শরীরটা দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

শত্রুপক্ষ তার উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে। কিন্তু সে জন্যে চিন্তিত বলে মনে হলো না তাকে।

শহীদের জন্যই চিন্তিত সে। ওকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এসেছে সে।

করিডরের শেষ মাথায় একটি দরজা। দরজাটা খোলা।

ফাঁদ নাকি?

সামনে দাঁড়িয়ে কুয়াশা দেখল ভিতরের কামরাটা সম্পূর্ণ ইস্পাত দিয়ে তৈরি। ভিতরে প্রবেশ করল সে। কেউ নেই। আসবাবপত্র বলতে একটি স্টীলের চেয়ার ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। কামরার আর কোন দরজা নেই। তবে বিপরীত দিকের দেয়ালটা দু'ফাঁক দেখা যাচ্ছে। গোপন পথ।

ফাঁক করে রাখা হয়েছে কেন দেয়ালটা? নিচের দিকে সিঁড়ি নেমে গেছে।

হঠাৎ শহীদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল কুয়াশা। কঠিন কণ্ঠে কাকে যেন কি বলছে ও। দেয়ালের ফাঁকের কাছে, সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়াল সে। শহীদের কণ্ঠস্বর শোনা যায় কি যায় না। ভেসে আসছে নিচের দিক থেকেই।

'শয়তান দেওজী! তোমার দিন ফুরিয়েছে! ভেবেছ আমাকে বন্দী করে দুনিয়া জয় করে ফেলেছ!'

দেওজী কাংকারিয়ার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'বন্দী হয়েও এত তেজ টিকটিকি মহাশয়ের—ভারি তাজ্জবের কথা! কুয়াশার ভরসায় লাফিয়েন না, টিকটিকি মহাশয়! সে-ও বন্দী হলো বলে···।'

বিড়ালের মত নিঃশব্দে লাফ দিল কুয়াশা। দুই লাফে আঠারোটা সিঁড়ির ধাপ টপকে একটা করিডরে নামল।

থমকে দাঁড়াল সে। করিডর, দু'পাশের দেয়াল, দেয়ালের গায়ের দরজাগুলো—সব চকচকে ইস্পাতের তৈরি।

খটাশ করে কান ফাটানো শব্দ হলো। চমকে ঘাড় ফিরাল কুয়াশা। সিঁড়ির সামনে একটা ইস্পাতের দেয়াল নেমে এসেছে সিলিংয়ের কাছ থেকে। সিঁড়িটা গায়েব হয়ে গেছে যেন পলকের মধ্যে।

খটাশ! আবার সেই একই শব্দ।

পিছন দিকের করিডরে আর একটা দেয়াল দেখা যাচ্ছে। আবার সেই শব্দ হলো।

এবার সামনে দেখা গেল নতুন একটা দেয়াল।

ইস্পাতের দেয়ালের ভিতর বন্দী করে ফেলা হয়েছে কুয়াশাকে।

'হাঃ হাঃ হাঃ হা···!' কর্কশ কণ্ঠের অট্টহাসি ভেসে আসছে অস্পষ্টভাবে কোথাও থেকে।

জীবনে এই প্রথম মুহূর্তের জন্যে হলেও বিমূঢ় হয়ে পড়ল কুয়াশা। করিডর ধরে এখানে এসে বন্দী হবার আগেই সে লক্ষ্য করেছে লুকিয়ে রাখা থার্মাইট বোমাগুলো। মৃত্যুকে সে ভয় করে না। তার ভয় শহীদের জন্য।

শহীদ মারা যাবে একথা কুয়াশা ভাবতেই পারে না। কিন্তু এতসব কথা ভাববার সময় তখন নেই কুয়াশার।

ইস্পাতের দেয়ালের একেবারে উপরের দিকে, সিলিংয়ের কাছে, ভেন্টিলেটার দেখা যাচ্ছে। পকেট থেকে ছোট্ট একটা পেন্সিল বের করে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল সে। তারপর হাঁটু মুড়ে বসবার উপক্রম করল। কিন্তু বসল না কুয়াশা। হাঁটু ভাঁজ করে দেহটাকে একটু নিচু করে লাফ দিল উপরের দিকে। এক হাত দিয়ে ধরল ভেন্টিলেটারের ইস্পাতের রড। ঝুলে রইল সেই অবস্থায়। ঝুলতে ঝুলতে দাঁত

থেকে পেন্সিলটা নিল অপর হাতে। পেন্সিলটা মুখের সামনে ধরে কথা বলতে শুরু করল কুয়াশা।

মোখলেসুর রহমানের অফিস বিল্ডিংয়ে খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে, নিহত হয়েছে একজন গোয়েন্দা এবং বন্দী হয়েছে শত্রুপক্ষের কয়েকজন অনুচর—এ খবর পেয়ে ঝড়ের বেগে জীপ চালিয়ে অকুস্থলে ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন মি. সিম্পসন।

বিল্ডিংয়ের গেটের সামনে পুলিস অফিসারদের গাড়ির ভিড়। মি. সিম্পসন জীপ থেকে নেমেই প্রথম জানতে চাইলেন, 'কুয়াশা কোথায়?'

কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারল না।

এমনসময় বিপরীত দিকে বিল্ডিংয়ের কোথাও থেকে ভেসে এল কুয়াশার কণ্ঠস্বর।

কুয়াশা পেন্সিলের মত দেখতে মিনি মাইক্রোফোনে কথা বলছে, 'আমি কুয়াশা বলছি। দু'জন বেপরোয়া ক্রিমিনাল এই বিল্ডিং ছেড়ে পালাবার চেষ্টা করছে। প্রতিটি প্রবেশ পথের দিকে নজর রাখা হোক দূর থেকে। আমি আবার বলছি···দূর থেকে। তারা যেন পালাতে না পারে। এবং কোন অবস্থাতেই কেউ এই বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করবেন না, বা কাউকে প্রবেশ করতে দেবেন না। আমি আবার বলছি, কোন অবস্থাতেই এই বিল্ডিংয়ের ভিতর কেউ প্রবেশ করবেন না বা কাউকে প্রবেশ করতে দেবেন না।'

এদিকে দেওজী কাংকারিয়া এবং সান্তারাম উল্কা মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্যুটকেসে ভরে গোপন সুড়ঙ্গপথ ধরে ছুটে চলেছে দ্রুত।

খানিক দূর যাবার পর ছোট্ট একটা এলিভেটরে চড়ল তারা। এলিভেটর তাদেরকে নামিয়ে দিল নিচের তলায়। তারপর আবার সুড়ঙ্গ পথ।

প্রায় আড়াইশো গজ দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ। অন্য এলাকার একটি বাড়িতে গিয়ে শেষ হয়েছে পথটা। পথের শেষ মাথায় একটি দরজা। দরজার পাশের দেয়ালে একটি সুইচ বোর্ড।

সুইচ বোর্ডে লাল একটি বোতাম।

দেওজী কাংকারিয়া হাঃ হাঃ হাঃ হা করে বিকট উল্লাসে হাসতে হাসতে সেই লাল বোতামটায় চাপ দিল আঙুলের।

'ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কুয়াশা।'

সত্যিই বুঝি তাই! গোটা বিল্ডিংটা কেঁপে উঠল থর থর করে। যেন ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। সেই সাথে ভেঙেচুরে তছনছ করে দেয়ার মত বিকট বিস্ফোরণের শব্দ হলো। মুহূর্তের মধ্যে দেখা গেল বিশাল অগ্নিশিখা।

বিল্ডিংয়ের ছয়তলায় আগুন ধরে গেছে। অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে সেই আগুন গ্রাস করছে গোটা বাড়িটাকে।